দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্য: নাগরিক একাকিত্বের স্বরূপ-সন্ধান

(নির্বাচিত রচনা অনুসরণে)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে

পিএইচ. ডি. উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মৌলিকা সাজোয়াল

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শম্পা চৌধুরী

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা: ৭০০০৩২

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

‘দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্য: নাগরিক একাকিত্বের স্বরূপ-সন্ধান (নির্বাচিত রচনা অনুসরণে)’

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Sampa Chaudhuri, Retired Professor, Department of Bengali, Jadavpur University. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor: Candidate:

Dated: Dated:

প্রস্তাবনা

দিব্যেন্দু পালিতের *বিনিদ্র* উপন্যাসের মাধ্যমে প্রথম ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু পালিতের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়। *বিনিদ্র* পড়ার পর কদিন ভারি মন খারাপ হয়েছিল, মনে হয়েছিল জীবনে যা কিছু খারাপ, যা কিছু মলিন, সেই সবকিছুর সাহিত্যিক উদ্‌যাপন কি এতটাই জরুরি? পরে মন-খারাপ যখন ক্রমশ পাতলা হয়ে এসেছে, তখন বুঝেছি জীবনকে ছোঁব, অথচ তার কালিমা ছোঁব না—এই থিওরিতে দিব্যেন্দু বিশ্বাসী ছিলেন না। তারপর আবার দিব্যেন্দুর সাহিত্যাঙ্গনে ফিরে গেছি, ক্রমে *সম্পর্ক, আমরা, ঘরবাড়ি* এরকম আরও অনেক উপন্যাস এবং গল্পের মধ্যে প্রবেশ করেছি। দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য-জগৎ আমার কাছে অনেকটা যেন শীতকালের মতো। শীতের স্বভাবানুযায়ী তাঁর সাহিত্যে একটা কাঠিন্য আছে, শুষ্কতা আছে, নিস্পৃহতা আছে। শীত এলেই আমার প্রতিটা রোমকূপ সচেতন হয়ে ওঠে, মনে হয় এই সেই মোক্ষম সময় যখন স্মৃতির দরবার আরও প্রসারিত হয়। লেপ-কম্বলের মতো স্মৃতির চাদরে নিজেকে মুড়ে ঘরের এক কোণায় পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়, নিজেকে আরও একা মনে হয়। তবে একাকিত্বেরও তো প্রবল মায়া আছে। প্রথম প্রথম জড়তা থাকে, সংকোচ থাকে, অস্বস্তি, বেদনার তীব্রতা শীতের শুষ্ক-বুকে ঘাই মারে। তারপর মানিয়ে নেওয়ার এবং মেনে নেওয়ার সহজাত ক্ষমতা ক্রমশ অধিকার করে নেয় মনের সবটুকু। একবার একাকিত্বে ডুব দিলে সহজে পার পাওয়া যায় না। কেমন যেন ঝিম ধরা নেশা হয়। দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্য যেন সেই একাকিত্বের ঘোরে ডুবিয়ে রাখে। কলকাতা শহরের নগর-জীবন তাঁর সাহিত্যের মূল প্রেক্ষাপট আর এ-শহরের নগরবাসীর মনের হদিশ করা তাঁর সাহিত্য-ধর্ম। ২০১৮ সালের একেবারে শেষের দিকে

আমি পি এইচ. ডি.-র কাজ শুরু করি। সবেমাত্র নিশ্চিত হয়েছি দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্য নিয়ে কাজ করব, তারপরই ২০১৯ এর ৩রা জানুয়ারি, তিনি চলে গেলেন। আমার পরম দুর্ভাগ্য, যাঁকে নিয়ে আমার কাজ, তাঁর সঙ্গে সরাসরি সাহিত্য নিয়ে আলাপ করবার কোনও সুযোগ রইল না। তবু তাঁর সাহিত্যের সূত্রে তাঁকে যেটুকু অনুভব করেছি, সেটুকু বলবার চেষ্টা করব। দিব্যেন্দু যে সময় জন্মগ্রহণ করছেন, ১৯৩৯ সালের ৫ই মার্চ, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে তার ভয়াবহতার ডালপালা মেলা শুরু করেছে। তিনি জন্মেছেন বাংলার বাইরে, বিহারের ভাগলপুরে। তারপরও দিব্যেন্দুর সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে বেছে নেওয়ার পেছনে কিছু কারণ আছে। ভাগলপুর বিহারে অবস্থিত হলেও সেখানে বাঙালির সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাছাড়া ছোটোবেলাতেই তিনি ভর্তি হয়েছিলেন ‘দুর্গাচরণ’ নামের এমন একটি স্কুলে, যেখানে মুখ্যত বাঙালি ছেলেরাই পড়াশুনো করত। তাই লোকমুখে এই স্কুলের নাম ছিল ‘বাংলা স্কুল’। দিব্যেন্দু পালিতের অন্যতম প্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। দিব্যেন্দুর মা নীহারবালা পালিতের নিয়মিত বই পড়ার নেশা ছিল। সেইজন্য তাঁকে ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর লাইব্রেরি থেকে নিয়মিত বই আনতে ছুটতে হত। মায়ের বইয়ের নেশা মেটাতে গিয়ে একদিন তিনি নিজেই বইয়ের নেশায় ডুবে যান। তার ওপর স্কুলের লাইব্রেরি তো ছিলই। সেখানে প্রতি শনিবার *বিবেকানন্দ চরিত* থেকে শুরু করে ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের *জলে জাগে ঢেউ*, এমনকি মুখরোচক মন্তব্যসম্বলিত *কামসূত্র* পর্যন্ত হাতে পাওয়া যেত। সুতরাং বেশ অল্প বয়সেই অভিজ্ঞ সহপাঠীদের কল্যাণে এবং তথাকথিত বড়োদের বই হাতে পেয়ে তিনি নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে ফেলেছিলেন। নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় টগবগ করে ওঠা মন অতশত না ভেবে মাত্র ষোল-সতের বছর বয়সেই প্রকাশোন্মুখ হয়ে ওঠে। স্কুলে পড়াকালীন বিভিন্ন প্রতিযোগিতা

উপলক্ষ্যে দিব্যেন্দু গদ্য লেখা শুরু করেন, দু-একটি পুরস্কারও লাভ করেন। স্কুলের ছাত্রদের জন্য আয়োজিত সর্বভারতীয় একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে প্রথম বার খবরের কাগজের পাতায় নিজের নাম দেখতে পান তিনি। এই ঘটনায় কিশোর-দিব্যেন্দুর মন নিঃসন্দেহে আহ্লাদে আটখানা হয়ে দ্বিগুণ বেগে সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠে। তবে শুধু পুরস্কার পাওয়ার আনন্দ নয়, তাঁর স্কুলের স্নেহশীল মাস্টারমশাইয়েরা এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্যোগেই বাংলা এবং ইংরেজি দুটি ভাষাই সমান তালে চর্চা করে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল দিব্যেন্দুর। স্কুল পাশ করে স্থানীয় মারোয়াড়ি কলেজ থেকে বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে স্নাতক হওয়ার পর ১৯৬১ সালে কলকাতায় এসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন দিব্যেন্দু। এর মাঝে তিনি মোটামুটি বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ এঁদের সাহিত্য পড়ে রীতিমতো বাংলা-সাহিত্যানুরাগী হয়ে উঠেছেন। বই ছাড়াও *দেশ* পত্রিকা এবং *আনন্দবাজার পত্রিকা* -র ‘রবিবাসরীয়’র নিয়মিত পাঠক হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া ভাগলপুরের মতো এলাকায় *প্রবাসী, ভারতবর্ষ, চতুরঙ্গ* ইত্যাদি বাংলা পত্রিকার খোঁজ পেলেই পড়ে ফেলতেন তিনি। স্কুলের মাস্টারমশাইদের উদ্যমে বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি ডিকেন্স, স্কট, জেন অস্টেন, মপাসাঁ প্রমুখ বিদেশি সাহিত্যিকদের রচনা পড়ার অভ্যাসও তৈরি হয়েছিল তাঁর। দেশ-বিদেশের সাহিত্য আত্মস্থ করে ১৯৫৫ সালে কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে পড়াকালীন দিব্যেন্দু প্রথম গল্প ‘ছন্দ-পতন’ লিখে ফেলেন। গল্পটি ৩০শে জানুয়ারিতে *আনন্দবাজার* -এর ‘রবিবাসরীয়’তে প্রকাশিতও হয়। কিন্তু কাঁচা বয়সে সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে এই গল্পটিতে দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যিক সত্তার তুলনায় সাহিত্যানুরাগী পাঠক-সত্তার প্রকাশই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

নেয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেন, হঠাৎ লেখা শুরু করতে গিয়ে তিনি সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ বা বিমল মিত্রের সাহিত্যের ছাঁচে ঢালা কয়েকটি গল্প লেখেন। নিয়মিত লিখতে লিখতে এবং অবশ্যই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ মন ক্রমে তাঁর একটি নিজস্ব সাহিত্যিক সত্তা গড়ে তোলে। দিব্যেন্দু পালিত নিজে 'কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান' রচনাটিতে নিজের লেখালিখি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানান, তিনি যা যা লিখেছেন, তা দুটি সুস্পষ্ট পর্বে ভাগ করা যায়—'১৯৬৪-৬৫'র আগে এবং ঐ সময়ের পরে'। তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন, দ্বিতীয় পর্বের রচনাগুলোই তাঁর মূল সাহিত্যিক সত্তাকে বহন করছে। ১৯৬০ নাগাদ তাঁর প্রথম গল্পের বই *শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি* প্রকাশিত হয়। ভাগলপুরে কলেজে পড়াকালীন দিব্যেন্দু দিবা-রাত্রি এক করে, রীতিমতো পরীক্ষার পড়া কামাই করে যুবক-যুবতীর প্রেম-অপ্রেম, ব্যর্থতা, জ্বালা-যন্ত্রণা, বৈধ-অবৈধ আবেগ-অনুভূতি মিলিয়ে যারপরনাই আবেগ এবং পরিশ্রম ঢেলে *সিন্ধু বারোয়াঁ* নামে একটি উপন্যাস লেখেন। ১৯৫৯ সালে আভেনির প্রকাশনা সংস্থা থেকে এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। পরবর্তীকালে এই উপন্যাসটি লেখার কারণে তিনি বেশ কিছু জায়গায় অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া ১৯৫৫-৫৬ নাগাদ তাঁর একটি কবিতার বইও প্রকাশিত হয়, যার নাম *তোমার ভালোবাসা*। দিব্যেন্দু তাঁর যে সাহিত্যিক সত্তাকে নিজস্ব হিসেবে ঘোষণা করছেন, তার বিকাশ ঘটে বস্তুত তিনি কলকাতায় আসার পর। ১৯৫৮-র মে মাসের গোড়ার দিকে তিনি কলকাতায় আসেন। কলকাতায় আসার পর ১৯৬১ সালে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। কলেজে পড়াকালীন দিব্যেন্দু যে বুদ্ধদেব বসুর *কবিতা* পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন, সেই বুদ্ধদেব বসুর সরাসরি সান্নিধ্য এবং অপরিসীম স্নেহ লাভ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর। 'শিক্ষকভাগ্য' তাঁর বরাবরই

ভালো এবং সেই ভাগ্যের জোরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে তিনি শিক্ষক হিসেবে পান সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, ফাদার ফাঁলো, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডেভিড ম্যাকাচ্চন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতো প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বদের। দেশ-বিদেশের সাহিত্যপাঠের দ্বার ক্রমে দিব্যেন্দু পালিতের কাছে আরও প্রসারিত হয়। তিনি বাংলা ভাষা ছাড়াও ইংরেজিতে দুর্দান্ত কিছু প্রবন্ধ এবং নিবন্ধ লেখেন, যা নানান পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কলকাতায় আসার পর বিশ্ব-সাহিত্যের দরবার হয়তো তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল, বহু জ্ঞানী এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিল, কিন্তু সেইসব সুখ-স্মৃতির পাশাপাশি জীবন-ধারণের জন্য যে লড়াই এবং আঘাত তাঁকে বুক পেতে নিতে হয়েছিল সেসব ঘাত-প্রতিঘাতমুখর স্মৃতিও দিব্যেন্দুকে 'সাহিত্যিক' হিসেবে গড়ে-পিটে নেওয়ার বিষয়ে সমান ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত কলকাতা শহরের বুকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার চোট সামলে, সেসব যন্ত্রণাকে আত্মস্থ করে হয়ে ওঠেন 'সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত'। 'কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান'-এ তিনি জানিয়েছেন—

> ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত ছ' সাতটা বছর শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই আমাকে বহু পরিশ্রম, গ্লানি ও অপমান সহ্য করতে হয়। তার প্রভাব পড়ে লেখাতেও। আর কিছু না হোক নিতান্ত শখ দিয়ে যার শুরু, এই সময় তা হয়েছিল গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়। 'সেদিন চৈত্রমাস', 'ভেবেছিলাম' ও 'মধ্যরাত'—এই তিনটি উপন্যাস এবং 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি', 'দুঃসময়' প্রভৃতি ছাড়াও আরও অনেকগুলি গল্প এই সময়ে লেখা। এর কোনো-কোনোটিতে কিছু অমনোযোগ ও দ্রুত লিখনের ছাপ থাকলেও লেখক হিসেবে আমি যে পরিবর্তিত হচ্ছি—বদলে যাচ্ছে সূচনার ভাষা, চিন্তায় সংযুক্ত হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তি ও চরিত্র ক্রমশ আক্রান্ত হচ্ছে তাদের পরিবেশ ও তাদের ভিতর থেকে উঠে আসা শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে—তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যেতে পারে।
>
> বস্তুত, সে বড়ো নিঃসঙ্গ সময় : ক্ষুধা, ভয়, একাকিত্ব, অসহায়তা, মানুষের প্রবঞ্চনা ও অকারণ বিরুদ্ধাচরণ—এই কয়েক বছরে আমাকে উপর্যুপরি এতো আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়

যে এমনিতে স্বাস্থ্যবান আমার শরীরে দেখা দেয় স্নায়ুর চাপ...তবে এই ধরনের অভিজ্ঞতার ছাপ পরবর্তীকালে লেখা আমার কোনো কোনো চরিত্রের মধ্যে হয়তো দুর্লভ নয়—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকেও যারা চলে যায় আত্মসংবরণের দিকে, দূরত্বময় উদাসীনতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে নিজেরই দিকে।

অর্থাৎ, নগরের বুকে একাকী ভ্রাম্যমাণ, দুঃখভারাক্রান্ত, স্মৃতিকাতর, সহনশীল অথচ কৌতুকপ্রিয় যে উদাসীন মানুষগুলোর গভীর একাকিত্বের বোধ এবং নিস্পৃহ আচরণের পরিচয় দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যে পাওয়া যায়, তাদের সঙ্গে তাঁর এই সময়ের মধ্যেই পরিচয় ঘটে। নানান আঘাত এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতেহয়তো তিনি নিজেও এই মানুষগুলির একজন হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর সেই রক্তাক্ত বুকের নিস্পৃহ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যের পাতায়। অভিজ্ঞতার রূঢ় আঘাতে ভেঙে পড়া মানুষদের নিয়ে বারবার মুখর হয়েছে তাঁর কলম, কখনও কথাসাহিত্যে, কখনও কবিতায়—

একটি মানুষ ধীরে
ভেঙে ভেঙে যায়
একটি মানুষ কেঁপে ওঠে—
একটি মানুষ তার ঘুমের ভিতর
বিপন্ন রক্ত নিয়ে ছোটে।

একটি মানুষ তার হাঁটুর খিলানে
দ্যাখে ক্রমে ন্যুব্জ হয় বালি;

অপমানিতের ঘায়ে

সূর্য ঢ'লে পড়েন পশ্চিমে—

অন্ধকারে জমে হাততালি...

(ভেঙে ভেঙে যায়/ দিব্যেন্দু পালিত)

শুধু 'স্মৃতি', 'দুঃখ' আর 'অপমানের' অন্ধকার নয়, দিব্যেন্দু পালিতের সমকালীন সময়টাও ছিল অন্ধকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তাঁর জন্ম এবং স্বাধীনতা লাভের পর মোহভঙ্গের কালে তাঁর বেড়ে ওঠা। সুতরাং দাঙ্গা, মন্বন্তর, উদ্‌বাস্তু-সমস্যা, বেকারত্ব, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পালাবদল, দলীয় রাজনীতি, ভারত-চিন যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্তি, নকশাল-আন্দোলন এবং যুব-সমাজের বিনাশ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনার মাঝে দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যের বিকাশ। খুব জোরালো স্বরে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিস্তারিত প্রসঙ্গ তাঁর সাহিত্যে আসেনি। তবে তাঁর রচনায় যে গভীর প্রেক্ষণবিন্দুর পরিচয় পাওয়া যায়, চরিত্রদের যে গাঢ় অনুভূতির বিকাশ এবং অব্যর্থ উন্মোচনী শক্তির প্রকাশ ঘটে, তাতে নিশ্চিত করে বলা যায়, সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা না এলেও সময়ের ভয়াবহতা অন্তরালে থেকে খুব নিচু স্বরে দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যের ছাঁচ নির্মাণ করে। নানাবিধ রাজনৈতিক সংঘাতের ভারে ন্যুব্জ 'প্রৌঢ় প্রহরের অন্তর্গত নির্জনতা' প্রাধান্য লাভ করে তাঁর সাহিত্যে। দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য-ভাবনার যথার্থ প্রকাশ পাওয়া যায় ১৯৮৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর 'বর্তমান' দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে। এখানে তিনি জানান—

> একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ও সম্পর্ক ছাড়া বহির্জগতে প্রত্যেককেই কোনও না কোনওভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি। এদের প্রভাব, অর্থাৎ নিজের সমকালকে এড়িয়ে চলা কি সম্ভব? বোধ হয় না। তাই আমার লেখায় এমন বিষয় ও প্রসঙ্গ

এসেই পড়ে। কখনও পরোক্ষে, কখনও প্রত্যক্ষভাবে, অন্তত কোনো-কোনো লেখায়। এ সবের দ্বারা সৃষ্ট সামগ্রিক পরিবেশের ভিতরে সংকট থাকতে পারে, কিন্তু লেখক বা শিল্পী যেহেতু রাজনীতিক বা সমাজতাত্ত্বিক নন, সেই জন্য সংকটের সমাধান বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ধারণা যে-সমাজ, সময় এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশে দাঁড়িয়ে আমি লিখছি, লেখার মধ্য দিয়ে সে-সম্পর্কে এক ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি করাই আমার কাজ। এই পরিবেশে বেঁচে থাকা চরিত্রদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করাও আমার কাজ। এ সব প্রতিক্রিয়া ও টানাপোড়েনের মধ্য থেকে কেউ মাথা তুলে দাঁড়ায়, কেউ বা মুখ থুবড়ে পড়ে, কেউ বিবেকের দ্বারা আক্রান্ত হতে হতে মনুষ্যত্ববোধে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, কেউ প্রতিবাদ করে। নারী বা পুরুষ, এরা প্রত্যেকেই মানুষ—এই সময়ের মানুষ। আমার লেখার মধ্যে আমি মূলত মানুষকেই বুঝবার চেষ্টা করি। যে-মানুষ ব্যক্তিগত, যে-মানুষ সামাজিক, যে-মানুষ রাজনৈতিক—কখনও নিঃসঙ্গ, কখনও সঙ্ঘবদ্ধতার মধ্যেও বিচ্ছিন্ন। মানুষের কাহিনী কখনওই জয়-পরাজয় কিংবা আশা-হতাশার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করা যায় না। এক অদম্য মানবিক প্রতিক্রিয়া নানা পরিবেশের চাপ ও সংকটের মধ্যেও মানুষকে, তার জীবনযাপনের কাহিনীকে সচল করে রাখে।

অর্থাৎ 'মানুষ', বিশেষত নগরবাসী 'নিঃসঙ্গ', 'বিচ্ছিন্ন' মানুষ দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্রীয় বিষয়। মানবিক বিশ্বের বিস্তৃত এবং অতল গহ্বরে প্রতিনিয়ত চলাচল করা দুর্বোধ্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবাবেগের প্রাচুর্যকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না, হাতের মুঠোয় ধরা যায় না। কিন্তু সেই সব নিরাকার, অদেখা, অজানা আবেগানুভূতিই অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে। নিরাবয়ব মনের চোরা কুঠুরির এই সব বাসিন্দাদের ধরে ফেলা সহজ কথা নয়। অথচ দিব্যেন্দু পালিত অনায়াসে কিছু শব্দ এবং বাক্যের শাণিত প্রয়োগ করে নাগরিক মনের যাবতীয় আবেগকে একত্রিত করে কথার আকারে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থাপিত করেছেন। নাগরিক মনের চিরন্তন সংকটকে তো বটেই, তবে আরও নির্দিষ্ট করে বললে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর সমসময়ের নগর-মনের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ

এবং বিশ্বাসকে যে নৈপুণ্যের সঙ্গে কথাসাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা তাঁকে কেবল একজন অসামান্য সাহিত্যিকের তকমা দেয় না, একজন নিবিড় জীবন-পরিদর্শকের স্থানও দেয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী এবং পুরুষের মধ্যে যে অসাম্যের দিকটিকে আমরা সাধারণ সামাজিক সত্য হিসেবে জেনে এসেছি, সেই দিকটি ফটোগ্রাফিক বাস্তবতার সঙ্গে তিনি তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন কিন্তু তাঁর সাহিত্যে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান গুরুত্ব পেয়েছে। গুরুত্বের দিক থেকে সাহিত্যাঙ্গনে নারী-পুরুষের এই অসাম্যের দিকটিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন। বরঞ্চ নারীমনের বহুমাত্রিক গভীরতার দিকটিই তাঁকে সাহিত্যিক হিসেবে বেশি আকর্ষণ করেছে। তবে এক্ষেত্রে বলা জরুরি, পুরুষের নারীর প্রতি যে আকর্ষণ সমাজে সচরাচর দেখা যায়, বা সাহিত্যে নারীর প্রতি পুরুষের মুগ্ধতার যে নামান্তর পাওয়া যায়, সেই ধরনের আকর্ষণের থেকে দিব্যেন্দু পালিতের নারীমনের প্রতি আকর্ষণের বিস্তর ফারাক আছে। তিনি নারী-হৃদয়কে কখনও পুরুষ হিসেবে পড়েননি। নারী-হৃদয়কে জানবার, বুঝবার অদ্ভুত গূঢ় কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, যে কৌশলে তথাকথিত পুরুষোচিত কোনও কাঠিন্য, রূঢ়তা-সম্পৃক্ত গুণাবলী বা যৌনতাকেন্দ্রিক আকাশ-কুসুম কল্পনা ঠাঁই পায়নি। দিব্যেন্দু পালিত নারীর হৃদয়কে জেনেছেন, অনুভব করেছেন নারীমনের সঙ্গে একশো শতাংশ সমব্যথী হয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন একজন নাগরিক পুরুষ এবং একজন নাগরিক মহিলার একাকিত্বের কারণ, একাকিত্বের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ জন্মের পর থেকেই নারীকে তার পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করা শুরু করে দেয়, যত দিন যায় তত একাকিত্বের গভীরতা আরও বাড়তে থাকে। অন্যদিকে পুরুষের একাকিত্ব শুরু হয় সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে, কারণ পুরুষেরা সাধারণত (ব্যতিক্রম রয়েছে) কৈশোর অতিক্রম করে তারপর সমাজ-সচেতন হওয়া শুরু করে।

দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যের ভাষা রীতিমতো আধুনিক, ভাষাভঙ্গি সুসংহত, নির্মেদ। স্বভাবত সংযমী দিব্যেন্দু পালিতের রচনাও সংযমপরায়ণ। বাড়তি শব্দের ব্যবহার, বাড়তি আবেগ-উচ্ছ্বাসের কোনও জায়গা নেই তাঁর সাহিত্যে। দিব্যেন্দু পালিতের কোনও রচনাই আকারে দীর্ঘ বলা চলে না, তবে তাঁর রচনার সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে—প্রায় ৪০ টি উপন্যাস, ২০০ টি গল্প, ৯ টি কবিতা-সংকলন, ৪ টি প্রবন্ধ ও রম্য-রচনা সংকলন। এছাড়া তিনি নির্মাল্য আচার্যের সঙ্গে 'শতবর্ষে চলচ্চিত্র' গ্রন্থটির দুটি খণ্ড যুগ্ম-সম্পাদনা করেন এবং ২ টি নাটকও রচনা করেন।

দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য নিয়ে এর আগেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে, যেসব কাজের দ্বারা আমি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছি এবং এই গবেষণার কাজটি করবার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সহায়তা লাভ করেছি। এর মধ্যে রয়েছে বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক এবং অধ্যাপিকা শ্রাবণী পাল মহাশয়ার লেখা প্রবন্ধ 'সম্পর্কের টানাপোড়েন : দিব্যেন্দুর অনুভব' (উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত *পঞ্চাশের দশকের কথাকার*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৭০০০০৯, বইমেলা ১৯৯৮)। বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক এবং অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তীর লেখা প্রবন্ধ 'দিব্যেন্দু পালিতের ছোটোগল্প : নগর-মনস্কতা' (দীপঙ্কর মল্লিক সম্পাদিত *তবু একলব্য* ছোটোগল্পকার বিশেষ সংখ্যা, দিয়া পাবলিকেশন, বইমেলা সংখ্যা জানুয়ারি ২০১৩), বিশিষ্ট গবেষক এবং অধ্যাপক প্রহ্লাদ রায়ের প্রবন্ধ 'দিব্যেন্দু পালিতের ছোটোগল্প : চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালিনী' (রোকেয়া কবীর সম্পাদিত *নারী ও প্রগতি* ষাণ্মাসিক জার্নাল, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৩১-৩২, বাংলাদেশ, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২০)। প্রদীপ্ত রায়ের সম্পাদনায় দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা *প্রিয়দর্শিনী* (জানুয়ারি—মার্চ ২০০৩) পত্রিকায় বহু বিদগ্ধজন দিব্যেন্দু পালিতকে নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং তাঁর সাহিত্যকে ঘিরে মনোগ্রাহী আলাপ-আলোচনা করেছেন। তবে এর বাইরেও বিভিন্ন পত্র-

পত্রিকা এবং অনলাইন পোর্টালে দিব্যেন্দু পালিতকে স্মরণ করে নানান ছোটো-ছোটো প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লেখা হয়েছে। তাছাড়া উচ্চতর সারস্বত-স্তরেও তাঁকে নিয়ে দুটি (আমার জানা মতে) গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষক গুরুপদ অধিকারী 'নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের মনোজগতের রূপকার দিব্যেন্দু পালিত (১৯৫৫-২০০০)' এই শিরোনামে একটি কাজ করেছেন। তারপরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষক রবীন্দ্র কুমার বর্মন 'দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস : বিষয়বৈচিত্র্য, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ ও শিল্পরীতি' শীর্ষকে দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্য নিয়ে একটি সামগ্রিক গবেষণার কাজ করেছেন। তবে দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যের যে মূল অভিনবত্বের দিক, নগর-মনের দার্শনিক হিসেবে বাংলা কথাসাহিত্য-নির্মাণ, সেই দিকটির বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা বাকি রয়ে গেছে। গুরুপদ অধিকারী মহাশয়ের গবেষণা-কর্মের সূত্র ধরে বলা যায়, দিব্যেন্দু পালিত কেবল নাগরিক মধ্যবিত্তের রূপকার নন। নিম্নবিত্তের কথা সামান্যই এসেছে তাঁর কথাসাহিত্যে, তবে মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত, এমনকি উচ্চবিত্তদের মানস-যাত্রার নিখুঁত পর্যবেক্ষক তিনি। তাছাড়াও 'ওষুধ', 'জাতীয় পতাকা', 'লোকসভা-বিধানসভা'র মতো কিছু গল্পে দিব্যেন্দু পালিত নিম্নবিত্ত মানুষদের চিত্তবোধের, নগর-সভ্যতা এবং নিম্নবিত্তের সংঘাতের যে ছবি এঁকেছেন, তা বিশেষভাবে আলোচনার চাহিদা তৈরি করে। রবীন্দ্র কুমার বর্মন মহাশয়ের গবেষণা-সন্দর্ভে দিব্যেন্দু পালিত-রচিত গল্পগুলির প্রসঙ্গ আসেনি, যেহেতু মাননীয় গবেষক মহাশয়ের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস। আমি আমার গবেষণায় দিব্যেন্দু পালিতের গল্প এবং উপন্যাস সহযোগে বিস্তারিতভাবে নাগরিক একাকিত্বের বিভিন্ন তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক দিকগুলি নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আমার গবেষণা-অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্য: নাগরিক একাকিত্বের স্বরূপ-সন্ধান (নির্বাচিত

রচনা অনুসরণে)’। আমার গবেষণা-কর্মের বিষয়টিকে আমি মুখ্যত পাঁচটি অধ্যায় বিভাজন করে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে বলা জরুরি, দিব্যেন্দু পালিতের রচিত সবকটি উপন্যাস, গল্প বা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমার বক্তব্য-বিষয়ের নিরিখে যে-কটি উপন্যাস এবং গল্পের প্রসঙ্গ অবতারণা করা জরুরি বলে মনে হয়েছে, সে-কটির কথাই বিশদে আলোচনা করেছি। তাছাড়া তাঁর আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধটি ছাড়া আর কোনও প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ হয়নি, কারণ অন্যান্য প্রবন্ধের বিষয় আমার গবেষণার বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল না। অধ্যায়গুলি শুরু করার আগে ‘প্রাক্‌কথন’ অংশে আমি ‘নাগরিক একাকিত্ব’ বিষয়টির একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং নাগরিক একাকিত্ব কেন, কীভাবে দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যে এতখানি প্রাধান্য লাভ করল সেই নিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করেছি, যা আমার পরবর্তী অধ্যায়গুলির ভিত্তিস্বরূপ। অধ্যায়-বিভাজনসহ আমার গবেষণা-কর্মে আলোচিত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ—

প্রাক্‌কথন:

- নাগরিক একাকিত্ব।
- কার্ল মার্কসের ‘অ্যালিয়েনেশন থিওরি’র ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ।
- দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য রচনার প্রিয় বিষয় কেন ‘নাগরিক একাকিত্ব’, সেই সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা।

প্রথম অধ্যায়: **নগর-দর্পণে দাম্পত্য**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, হতাশাগ্রস্ত দিনলিপিতে অভ্যস্ত নগরবাসীর কথা।

- যৌথ পরিবার থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা অণু (নিউক্লিয়ার) পরিবারের কথা, পিতৃপুরুষের বসত বাড়ি থেকে ফ্ল্যাট বাড়িতে উঠে আসা দম্পতির কথা, স্ত্রীর হঠাৎ আর্থিক স্বাবলম্বিতা লাভের ঘটনাকে আত্মস্থ করতে না পারা বিপর্যস্ত স্বামী, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দাম্পত্য সম্পর্কে পুরুষ এবং নারীর অবস্থানের স্বরূপ।
- এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রে *ঘরবাড়ি, সিনেমায় যেমন হয়, সেকেন্ড হানিমুন, অবৈধ* এবং *আড়াল* উপন্যাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়: **নগর, নারী ও স্বাবলম্বন**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
- বিবাহ-বিচ্ছিন্ন, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী মেয়েদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা এবং সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু, তা নির্ধারণ করার সূত্রে *প্রণয়চিহ্ন* এবং *অনুভব* উপন্যাস।
- মেয়েদের মেসবাড়িতে বসবাস করা কর্মরত মেয়েদের জীবনযাপন এবং মানস-যাপনের পর্যালোচনার সূত্রে *মধ্যরাত* ও *স্বপ্নের ভিতর* উপন্যাস।
- আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এক বিধবা মেয়ের মানসিকভাবে স্বাবলম্বিতা অর্জনের প্রতিটি পদক্ষেপের বিশদ ব্যাখ্যা *সংঘাত* উপন্যাসের সূত্র ধরে।

তৃতীয় অধ্যায়: **নগরজীবনে নিঃসঙ্গ-বিভ্রান্ত পুরুষ**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- বিজ্ঞাপন জগতের প্রতি দিব্যেন্দু পালিতের গভীর পর্যবেক্ষণ এবং সেই সূত্রে বিজ্ঞাপন জগতের মহারথীদের নিয়ে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ('ম্যাকিয়াভেলিয়ানিজম' তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)। এই বিষয়টির সমর্থক দুটি উপন্যাস *সম্পর্ক* এবং *বিনিদ্র*।
- স্বাধীনতা-পরবর্তী মোহভঙ্গের কাল থেকে শুরু করে নকশাল-আন্দোলনের প্রস্তুতি-পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক আলাপ-আলোচনা এবং সেই সময়ের সাধারণ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত রাজনীতিবিমুখ যুব-সমাজের কথা প্রসঙ্গে *ভেবেছিলাম* এবং *আমরা* উপন্যাস।
- নকশাল-আন্দোলন পরবর্তী যুব-সমাজের ছত্রভঙ্গ হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একজন উচ্চ-মধ্যবিত্ত, ক্ষমতাবান পরিবারের শিক্ষিত যুবকের বিভ্রান্তি, দোলাচলতা ও দ্বন্দ্বের আলোচনা-সূত্রে *ঢেউ* উপন্যাস।

চতুর্থ অধ্যায়: **দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অভিঘাত**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- পণ্য-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে পেটের দায়ে শহরে চলে আসা মানুষগুলোর নাগরিক ভাগ্য নির্ধারণ হওয়ার বিস্তৃত ইতিহাস।
- এই ঘটনার আধুনিক পরিণতির স্বরূপবিশিষ্ট কিছু গল্প।

পঞ্চম অধ্যায়: **নাগরিক নিঃসঙ্গতার কণ্ঠস্বর**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- নাগরিক নিঃসঙ্গতার চিহ্ন-নির্ধারণ।
- এই নির্ধারিত চিহ্নগুলির নিরিখে দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্য থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান।

পরিশেষ

- কলকাতাকেন্দ্রিক কিছু উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্য নিয়ে একটি ছক নির্মাণ।
- এইসব নগরকেন্দ্রিক কথাসাহিত্য-সম্ভারের মাঝে দিব্যেন্দু পালিতের বিশিষ্টতা নির্ধারণ। সেই সূত্রে আব্রাহাম হ্যারল্ড মাসলো-নির্দেশিত 'হায়ারার্কি অফ নিড্‌স্' তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।
- দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য নিয়ে সম্ভাব্য আর কী কী গবেষণার কাজ হতে পারে, তা চিহ্নিতকরণ।
- দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যানুরাগী হিসেবে গবেষণা-কর্মের মুখ্য অনুসন্ধান।

গ্রন্থপঞ্জি:

- আকর গ্রন্থাবলি
- সহায়ক গ্রন্থাবলি (বাংলা ও বিদেশি)
- অনূদিত গ্রন্থাবলি
- পত্র-পত্রিকা (বাংলা ও বিদেশি)
- বৈদ্যুতিন মাধ্যম

(দিব্যেন্দু পালিতের পূর্ণাঙ্গ জীবনপঞ্জি এবং গ্রন্থপঞ্জির উল্লেখ আমি আমার এই গবেষণা-সন্দর্ভের অন্তর্গত করিনি। কারণ তাঁর জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জির একটি সুসংবদ্ধ, সম্পূর্ণ উপস্থাপনা রয়েছে প্রদীপ্ত রায় সম্পাদিত *প্রিয়দর্শিনী*-র দিব্যেন্দু পালিত সংখ্যায় (জানুয়ারি—মার্চ ২০০৩), তাছাড়াও পূর্বোক্ত গবেষক শ্রী রবীন্দ্র কুমার বর্মন মহাশয় তাঁর গবেষণা-সন্দর্ভে দিব্যেন্দু পালিতের 'কালপঞ্জি' এবং 'বংশতালিকা'র উল্লেখ করেছেন)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা-কর্মটি সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক মাননীয়া অধ্যাপিকা ড. শম্পা চৌধুরী মহাশয়ার কাছে আমি সর্বতোভাবে ঋণী। অদ্যাবধি তাঁর অপরিসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সুপরামর্শ এবং সহায়তা ব্যতিরেকে এই গবেষণাটি সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজটি করতে পেরে আমি আন্তরিকভাবে আনন্দিত এবং আপ্লুত। পাশাপাশি আমার 'গবেষণা উপদেষ্টা কমিটি'র সদস্য বাংলা বিভাগের মাননীয়া অধ্যাপিকা ড. অনন্যা বড়ুয়া মহাশয়া এবং তুলনামূলক সাহিত্যের মাননীয় অধ্যাপক ড. পার্থসারথী ভৌমিক মহাশয়ের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এঁরা প্রতিনিয়ত গবেষণাটি নিয়ে এঁদের মূল্যবান মতামত জ্ঞাপন করে গেছেন এবং অসীম ধৈর্য নিয়ে গবেষণা পরিচালনার কাজে আমাকে সহায়তা করেছেন। তাছাড়াও বাংলা বিভাগের মাননীয় সহযোগী অধ্যাপক ড. ছন্দম চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে প্রয়োজনানুযায়ী নানান বিষয়ে বিশেষ সাহায্য এবং সুপরামর্শ পেয়ে আমি তাঁর প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয়া সহকারী অধ্যাপিকা ড. অঙ্কনা বেতাল মহাশয়ার কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞ। এছাড়া প্রযুক্তিগত সহায়তা ও গবেষণা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে প্রতিনিয়ত উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করে যাওয়ার জন্য আমার বিশেষ বন্ধু প্রত্যুষা চক্রবর্তী, আমার সহকর্মী-গবেষক এবং বন্ধু দিব্যেন্দু দলুই, সৌম্যদীপ বসু, মহম্মদ সামসুর রহমান, সৃজিতা সান্যাল, বিশ্বজিৎ ঘোষাল এবং বিশ্বজিৎ সর্দার—এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা জানাই। এঁদের সকলের সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাতে এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার

করা বাহুল্যমাত্র। গবেষণা-কার্যের পূর্ব অভিজ্ঞতাজাত বিবিধ সমস্যা-সমাধানের পথ দেখিয়ে এবং গবেষণা সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয়া সহকারী অধ্যাপিকা ড. হাসনুহেনা। এই কারণে আমি তাঁর কাছে ঋণগ্রস্ত। সেই সঙ্গে জরুরি কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী আইভি আদক মহাশয়া এবং হরিশ মণ্ডল মহাশয়কে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেকশন এবং পি এইচ. ডি. সেল-এর আধিকারিক-কর্মচারীদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই গবেষণার প্রযুক্তিগত দিকগুলিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য। সবশেষে যার কথা না বললেই নয়, তিনি আমার জীবনসঙ্গী শ্রী অনঘ ঘোষ মহাশয়। তিনি পাশে না থাকলে আমি গবেষণার প্রযুক্তিগত বিভিন্ন বিষয় কখনই সুসম্পন্ন করতে পারতাম না। তাঁর দ্বারা আমি নানা পরিসরে নানাভাবে উপকৃত এবং সমৃদ্ধ।

গবেষণার অন্তর্গত ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে বিধিসম্মত সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও যদি কিছু মুদ্রণ ও বানানগত অনবধানতা থেকে যায়, তার জন্য গবেষক আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

১০১/৬ গড়ফা মেইন রোড

কলকাতা-৭৫ মৌলিকা সাজোয়াল

গবেষণা পদ্ধতি

প্রদত্ত গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসৃত হয়েছে:

১। প্রস্তাবনা, প্রাক্কথন, মূল আলোচনা, পরিশেষ ও গ্রন্থপঞ্জি—এই পাঁচটি পর্বে প্রদত্ত গবেষণাপত্রটি বিন্যস্ত করা হয়েছে।

২। প্রথম পর্যায়ে গবেষণার অভিমুখ-নির্ধারণ করার সূত্রে কার্ল মার্কস কথিত 'অ্যালিয়েনেশন থিওরি' গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক বিষয় হিসেবে দিব্যেন্দু পালিতের নির্বাচিত উপন্যাস ও ছোটোগল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। সহায়ক উপাদান সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থ, নারীবাদী গবেষণামূলক কাজ, মনস্তাত্ত্বিক গবেষণামূলক কাজ এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণামূলক কাজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪। তত্ত্বসম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে।

৫। সমগ্র গবেষণাপত্রটি কালপুরুষ ১৪ ফন্টে মুদ্রিত হয়েছে। দীর্ঘ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বামদিক ইনডেন্ট করা হয়েছে। ইনডেন্ট করার জন্য ১২ ফন্টের নির্বাচন করা হয়েছে, তাই উদ্ধৃতিচিহ্নের ব্যবহার বাহুল্য বিবেচনা করে তা বর্জন করা হয়েছে।

৬। প্রদত্ত গবেষণা-অভিসন্দর্ভটিতে আকাদেমি-বানানবিধি অনুসৃত হয়েছে।

৭। তথ্যসূত্র এবং গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের ক্ষেত্রে মুখ্যত 'Chicago Manual of Style' (17^{th} edition)–এর মান্য পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। তবে বাংলা ভাষায় এই রীতির অভিযোজন করার ফলে প্রয়োজনানুযায়ী অল্প-বিস্তর পরিবর্তন করতে হয়েছে।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রাক্‌কথন:	১—১৪
প্রথম অধ্যায়	
নগর-দর্পণে দাম্পত্য:	১৫—৬২
দ্বিতীয় অধ্যায়	
নগর, নারী ও স্বাবলম্বন:	৬৩—১৩১
তৃতীয় অধ্যায়	
নগরজীবনে নিঃসঙ্গ-বিভ্রান্ত পুরুষ:	১৩২—১৯৭
চতুর্থ অধ্যায়	
দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অভিঘাত:	১৯৮—২৫৩
পঞ্চম অধ্যায়	
নাগরিক নিঃসঙ্গতার কণ্ঠস্বর:	২৫৪—২৯৩
পরিশেষ:	২৯৪—৩২০
গ্রন্থপঞ্জি:	৩২১—৩৩৩

প্রাক্‌কথন

শহর কলকাতার যান্ত্রিক জীবন অতিবাহিত করা যে মানুষগুলো প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নাকে-মুখে গুঁজে অফিসে ছোটে, যাদের ধুলো খাওয়া প্রাণ গলায় রাশ টেনে ক্বচিৎ-কদাচিৎ নির্জন দুপুরে একঘেয়ে কা-কা ডাকের শব্দে বা কোকিলের মিঠে ডাকের ফাঁকে হঠাৎ আবিষ্কার করে নির্জনতা কী ভীষণ বেদনাময়, তাদের ক্লান্ত-উদাসীন চোখ দিয়ে নিপুণভাবে এ শহরকে দেখেছেন দিব্যেন্দু পালিত। প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলা এইসব নাগরিকদের অবসন্ন হৃদয়ের প্রতিটি আকুতির খোঁজ রয়েছে তাঁর সাহিত্যের পাতায়। যেসব বিভ্রান্ত নগরবাসী সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে ভুগতে অবশেষে ক্লান্ত বুকে গভীর ঘুম দিয়ে জীবন থেকে অসহায়ভাবে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাদের মনের প্রতিটা বাঁকের খোঁজ রয়েছে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে। এ শহরের প্রতিটি মানুষ লাখো মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়েও একা, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। এই বিচ্ছিন্নতা কেবল একে অপরের সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গে নিজের, নিজেকে না বোঝার, নিজেকে না জানার, না চেনার তীব্র আস্ফালন। কোথায় এই নিষ্ঠুর বিচ্ছিন্নতার জন্ম, তা বুঝতে গেলে প্রাথমিকভাবে জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) কথিত ‘অ্যালিয়েনেশন থিওরি’র প্রসঙ্গ টানতেই হয়। বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ হিসেবে নগর জীবনের দুটি দিককে চিহ্নিত করা যেতে পারে—

- যান্ত্রিক জীবন যাপন
- শ্রমিক বা মানুষের তুলনায় বস্তু বা পণ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ

অ্যালিয়েনেশন অর্থে ‘separation from’, বিচ্ছিন্ন। শ্রেণি-সংগ্রাম এবং অ্যালিয়েনেশনের মধ্যে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। এর প্রধান লক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন একাকিত্বের বোধ, শক্তিহীনতা এবং জীবন সম্পর্কে অর্থহীনতার বোধ। এই বোধের মূল উৎস সমাজবদ্ধ মানুষের পারিপার্শ্ব, মার্কস কথিত ‘Superstructure’। ‘Maddening work’, ‘No expression of creativity’ অর্থাৎ যন্ত্রচালিতের মতো জীবন-যাপন, রুটিন মাফিক দৈনন্দিনতা তিল-তিল করে এই বিচ্ছিন্নতার বোধকে ঘনীভূত করে।

পুরো বিষয়টাই বস্তু নির্ভর। মানুষের আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই। পুঁজিবাদী সমাজে অর্থই মূল, অর্থের ওপরই সবকিছু নির্ভরশীল। মানুষের অস্তিত্ব, কদর, সম্মান সবকিছুই নির্ধারিত হবে টাকার দাঁড়িপাল্লায়—

> In bourgeois society capital is independent and has individuality, while the living person is dependent and has no individuality…By freedom is meant, under the present bourgeois conditions of production, free trade, free selling and buying.[১]

পণ্য বা বস্তুর মূল্য নির্ধারিত হয় তার বিনিময় মূল্যের দ্বারা। বস্তুর ব্যবহারিক মূল্য বা ব্যবহারিক উপযোগিতা সেখানে গুরুত্ব হারায়। তার ফলে পণ্যগুলির বিনিময় মূল্য তাদের বাস্তব মূল্যকেও ছাপিয়ে যায়। তাছাড়া মানুষ এই পণ্যগুলির ওপর এমনভাবে নির্ভরশীল হয়ে যায় যে তারা ভুলে যায়, এই পণ্যগুলির নির্মাতা আসলে তারাই, এ তাদেরই শ্রমের ফসল। ফলে শ্রমিকদের থেকে তাদেরই উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য অনেক বেশি হয়ে দাঁড়ায়।

মার্কস বলছেন, মানুষের প্রকৃতির দুটি দিক থাকে, একটি দিক ক্রমপরিবর্তনশীল। ‘Mode of production’ অনুযায়ী এই দিকটির অভিমুখ নির্ধারিত হয়। এই দিকটি মানুষের সমাজ-সচেতন দিক। ধনতান্ত্রিক সমাজে এই স্বার্থপর মনটার ভার অনেক বেশি,

এই দিকটিই মানুষকে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় চালিত করে। মার্কস যান্ত্রিক জীবনে আবদ্ধ এই মানুষগুলোর মনের এই দিকটিকে ‘social being’, বা ‘social consciousness’ এর দিক বলেছেন—

> It is not the consciousness of man that determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their consciousness.[২]

মানব-মনের আরেকটি দিক অপরিবর্তনীয়, স্থির, ধ্রুব, অটল, অবিরাম। এটি মনের সৃষ্টিশীলতার দিক। মার্কস কমিউনিজম তত্ত্বে কেবলমাত্র এই দিকটির অস্তিত্ব থাকবে বলে জানাচ্ছেন। মার্কস-কল্পিত কমিউনিস্ট সমাজে মানুষ হবে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ববাহী কারণ সেখানে মানুষের অস্তিত্বের দিকটিই হবে প্রকট, সামাজিক অস্তিত্বের দিক নয়।

প্রকৃতির ওপর মানুষের দখল যত জোরালো হচ্ছে, মানুষ যত বেশি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হচ্ছে, একাকিত্ব ততই বাড়ছে। সুতরাং প্রকৃতি-বিচ্ছিন্নতা বা প্রকৃতির বিরুদ্ধতা মানুষকে আরও বেশি যান্ত্রিক, আরও বেশি একা করে দেয়। মার্কসের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রাচীন উৎপাদন-পদ্ধতি (ancient mode of production) থেকে ক্রমান্বয়ে অ্যালিয়েনেশন বাড়তে থাকে, ক্যাপিটালিজিমে অ্যালিয়েনেশন তার চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে, সোশালিজমে আবার এর স্খলন হয়। অবশেষে কমিউনিজম ফিরে এলে তবেই অ্যালিয়েনেশন বিলুপ্ত হবে এবং মানুষ তার সর্বোচ্চ স্বাধীনতা লাভ করবে।

Das Kapital-এর প্রথম অধ্যায়ে মার্কস দেখিয়েছেন ইন্ডাসট্রিয়াল সোসাইটিতে ‘commodity fetishism’ কীভাবে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করছে। মানুষ যখন কোনও পণ্য দেখে বা ক্রয় করে, তখন তারা সেই পণ্যের পিছনে যে শ্রম এবং সামাজিক সম্পর্ক

রয়েছে, সে কথা বিস্মৃত হয়। মানব-শ্রম এবং সামাজিক সম্পর্কের থেকে পণ্যটি বেশি মূল্যবান এবং আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায় তাদের কাছে। পণ্যের ঔজ্জ্বল্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় শোষণ ও শ্রমের প্রকৃত বাস্তবতা এবং তৈরি হয় বিচ্ছিন্নতা। চারটি মুখ্য কারণ দেখিয়ে চার ধরনের বিচ্ছিন্নতার উল্লেখ করেছেন মার্কস। কারণগুলি নিম্নোল্লিখিত—

- উৎপাদন-ব্যবস্থার ওপর শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণের অভাব
- উৎপাদিত দ্রব্যের হাজাররকমের প্রলোভন
- যন্ত্রের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা
- নিজের সত্তার থেকে নিজের বিচ্ছিন্নতা

১) উৎপাদন-ব্যবস্থার ওপর শ্রমিকের সরাসরি কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকলে বা উৎপাদন-ব্যবস্থা আর শ্রমিকের আয়ত্তাধীন না থাকলে বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য। যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা, নিষ্প্রাণ উৎস থেকে শক্তি-উৎপাদন এই বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ, যেমনটা কিনা আজকের যন্ত্রসভ্যতায় নিয়ত ঘটে চলেছে। মানুষের শরীরের যন্ত্রগুলো দিন দিন বিকল হয়ে যাচ্ছে, ঘরের দৈনন্দিন কাজ থেকে শুরু করে কায়িক শ্রমের যাবতীয় কাজ, এমনকি মস্তিষ্কের কাজও মানুষ যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে করা শুরু করেছে। লাঙল থেকে যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতার শুরু, সেই নির্ভরশীলতার এখন বিস্তার ঘটেছে কম্পিউটার থেকে মোবাইলে, রোবটে, যন্ত্রমানবে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে। দৈনন্দিন জীবনে, এমনকি উৎসব-অনুষ্ঠানেও প্রায় সকলেই ব্যস্ত থাকে মোবাইলে, খাওয়ার টেবিলে টিভিতে। যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা যত বাড়ছে মানুষের গুরুত্ব ততই কমছে, হাজার হাজার শ্রমিকের কাজ করে দিচ্ছে একটি যন্ত্র, সুতরাং বেকারত্বও বাড়ছে। আজকের এই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে দাঁড়িয়ে বয়জ্যেষ্ঠরা বারবার বলে থাকেন, এই প্রজন্ম নাকি অধৈর্য, অস্থিরমতি,

আবেগহীন। মানবিক প্রবৃত্তির মর্যাদা তো যন্ত্রসভ্যতায় থাকার কথা নয়। আজকাল ভালোবাসা থেকে প্রণাম, আশীর্বাদ সবকিছুই মোবাইলে পাঠানো হয়। যন্ত্র দূরের মানুষকে কাছে এনে দিয়েছে। মোবাইল, কম্পিউটারের কারসাজিতে যেখানে এক আঙুলের খেলায় সুদূর আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে যোগস্থাপন করা সম্ভব, সেখানে প্রিয়জনের জন্য অপেক্ষার জায়গা কোথায়? এই সুবিধেগুলোকে অস্বীকার করা, এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও মানুষের নেই, কারণ মানুষের হাতে আর কোনও ক্ষমতাই নেই। মানুষেরই তৈরি যন্ত্র তার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে কোন কালে, তা মানুষ টেরই পায়নি, বোঝেনি এই ভার্চুয়াল যোগাযোগ যেটা দেয়, সেটা আসলে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ। কারণ এর মধ্যে কোনও রক্ত-মাংসের মানবিক স্পর্শ নেই। তাই খুব সহজেই দু-দিন বাদে মানুষ নিজেই সেই আনন্দ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, হন্যে হয়ে খুঁজে ফেরে অন্য আরেকটা আনন্দ-আশ্রয়, তবে সেটাও যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে। ফোন, হোয়াট্স্ অ্যাপ, ভিডিও কলিং প্রতিনিয়ত একজন মানুষকে খুব কাছে এনে দেওয়া সত্ত্বেও সকলে নতুনত্বের খবর চায়, নতুন আনন্দ-আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে আবারও সেই ফেসবুক, টিন্ডারের মতো যান্ত্রিক অ্যাপের আশ্রয় নেয়। যন্ত্র মানুষকে যতটুকু তথ্য প্রদান করে, যতটুকু চেনায়, ঠিক ততটুকুই চেনে, জানে, বোঝে। ফলে চেনা-জানার সীমাবদ্ধতা থেকে বিশ্বাসভঙ্গ হতে দেরি হয় না। রক্তমাংসের স্পর্শহীন, বিশ্বাসহীন ভার্চুয়ালিটি মানুষকে বিচ্ছিন্নতা ছাড়া আর কীই বা উপহার দিতে পারে !

২) উৎপাদন-ব্যবস্থার কারণে সামাজিক প্রাণী হিসেবে প্রতিটা মানুষ যেমন বিচ্ছিন্ন, তেমনি উৎপাদিত দ্রব্যের কারণেও মানুষ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। দ্রব্য-গ্রাহকেরা কেউ জানে না উৎপাদিত দ্রব্যের কতটা, বা কী কী আসলে জীবনের জন্য জরুরি। উৎপাদিত দ্রব্যের কতটা ব্যবহার করতে হবে, সেটা ভোক্তা বা গ্রাহকেরা নিজেরা নির্ধারণ

করে না, করে শিল্পপতিরা, দ্রব্য-উৎপাদনকারী মালিক শ্রেণি। বাজার-চলতি হাজার একটা বিকল্পের হাতছানি, প্রলোভনে গ্রাহকের মূল চাহিদা বিভ্রান্ত হয়। উৎপাদিত দ্রব্যের ভোক্তা প্রলুব্ধ হয় এবং নিদারুণভাবে ঠকে যায় আকর্ষক বিজ্ঞাপনের রঙিন ফাঁদে পড়ে। অবিশ্বাস ঘনীভূত হয়। প্রকৃত চাহিদা কী, তা অনুধাবন না করতে পেরে সাধারণ গ্রাহকের দল দিনমান হতাশার বীজ বপন করে। নিজেকে নিজে বুঝতে না পেরে, নিজের প্রকৃত চাহিদার খোঁজ না পেয়ে, নিজের প্রকৃত সত্তার থেকে নিজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৩) যন্ত্র-সভ্যতার যুগে মানুষ সারাদিন, সারাক্ষণ যন্ত্রে নিমজ্জমান। যন্ত্রনিমগ্নতা মানুষ থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে জোরালো করে। চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যায়, বহু কষ্টে ছোটোবেলার একদল পুরোনো বন্ধু নিজেদের মূল্যবান সময় থেকে এক চিলতে সময় বার করে দশ বছর পর একজোট হবে স্থির করল। একদিকে, এই সিদ্ধান্তটিকে সুগম করল ফোন কল, ভিডিও কল বা কনফারেন্স কলের সুযোগ-সুবিধে, অন্যদিকে একজোট হওয়ার পর কাজের ফোন, সোশাল মিডিয়ার রংচঙে হাতছানি আড্ডার গোটা সময়টাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিল। গল্পের মধ্যে মধ্যে ফোনের নোটিফিকেশন, কলের ভাইব্রেশন কড়া নেড়ে জানিয়ে গেল নিজেদের দাপুটে উপস্থিতি। প্রথম সুবিধেটিকে যেমন কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না, তেমনি উল্টোপিঠের ক্ষতিকারক দিকটিকেও অস্বীকার করা অসম্ভব। এটাই যন্ত্রযুগের চক্রব্যূহ, যা মানুষকে যন্ত্রের কারাগারে চিরতরে নিক্ষেপ করে ফেলেছে। এখান থেকে বেরিয়ে মানুষে মানুষে মিলিত হওয়ার আশা নিতান্তই ক্ষীণ, বা বলা ভালো নেই।

৪) এর চূড়ান্ত ফলাফল নিজের সত্তার থেকে নিজের বিচ্ছিন্নতা। আত্মীয়-স্বজন, পরিবার, বন্ধু-বান্ধবদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মানুষ নিজের জন্যও দুদণ্ড সময় বার

করতে পারে না। হয় সে টাকা উপার্জনের জন্য কাজে ব্যস্ত থাকে দিনে নিদেনপক্ষে আট ঘন্টা বা তারও বেশি, অথবা কাজ না থাকলে যন্ত্রনির্মিত চিত্তাকর্ষক প্রতারণায় সময় ব্যয় করে। উপার্জন কম হলে তো কথাই নেই, আরও উপার্জনের আশায় সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে, ওভারটাইম করে, ঘুমোতে যাওয়ার সময়ও ভাবে ঠিক কী কী করলে আরও অর্থ সমাগম হবে। কারণ পণ্য-সভ্যতায় মানুষের পরিমাপ হয় টাকার নিক্তিতে। অর্থাৎ, নিজেদের শ্রম নিজের ইচ্ছেমতো ব্যয় করার স্বাধীনতাও মানুষের নেই। টাকা মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করে। তাই সাধারণ মানুষও নিজের ভালোলাগার, ভালোবাসার কাজকে না বেছে, নিজের সুবিধেমতো শ্রম ব্যয় না করে, সেইসব কাজে লিপ্ত হয় যাতে শ্রম বিক্রির বিনিময়ে বেশি পরিমাণ টাকা হাতে আসে। বিত্তগতভাবে ওপরের দিকে উঠে সামাজিক সম্মান পাওয়ার লোভ এক্ষেত্রে মানুষকে পরিচালনা করে। তাই এই দুর্ভাগা সামাজিক প্রাণীর দল নিজেরাই নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে, হতাশায় ভোগে, নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে ভয়ঙ্করভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

ক্যাপিটালিজমে অ্যালিয়েনেশন নিজের চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। মার্কস বলছেন, বিষয় (subject) এবং লক্ষ্যের (object) ভূমিকা বিপরীতমুখী এবং বিপর্যস্ত। লক্ষ্য, বিষয়ের মালিক হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়, যন্ত্রকে নির্মাণ করেছে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে, অথচ মানুষ নিজেই বর্তমানে যন্ত্রের দাসত্ব করে।

ডি-অ্যালিয়েনেশনের পদ্ধতিও মার্কস জানিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মতে, পুরো উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। প্রাথমিকভাবে ক্যাপিটালিজমের মূল উৎস ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ঘটাতে হবে, তার ফলে সোশালিজম আসবে। অর্থাৎ, সোশালিজমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে আর কিছু থাকবে না, এখানে সব সম্পত্তিই সমাজের

সম্পত্তি। সোশালিজম কমিউনিজমের দশায় উত্তরণের ঠিক আগের অবস্থা। কমিউনিজমে ‘total man’-এর আবির্ভাব সম্ভব, যেখানে মানুষ তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা, সর্বোচ্চ শক্তিসমেত সবচেয়ে সম্ভাবনাময় রূপ পাবে। মার্কসের মতে, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকেরা তাদের কাজের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কারণ তারা তাদের কাজের ফলাফলের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং একটি সংকীর্ণ, পুনরাবৃত্তিমূলক কাজে সীমাবদ্ধ থাকে। মার্কসের ধারণার মূল লক্ষ্য ছিল, এমন একটি সমাজ গঠন করা যেখানে মানুষ তাদের পূর্ণ সম্ভাবনাময় অবস্থায় পৌঁছতে পারে এবং একটি সৃজনশীল, অর্থবহ জীবনের অধিকারী হতে পারে। অর্থাৎ, ‘total man’ হল ব্যক্তির এমন এক অবস্থা যেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তি তার প্রতিভা, দক্ষতা এবং উদ্ভাবনশীলতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে। যদিও এই পদ্ধতির বাস্তবায়ন মোটেই সহজসাধ্য নয়, বরঞ্চ দুঃসাধ্য।

নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক জীবনাচরণে অভ্যস্ত নারী-পুরুষদের একাকিত্বের যে বিশেষ মানসিক আবেগার্দ্র দিক, তা দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যের মূলগত ভাবধারার একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কখনও ব্যক্তিগত, কখনও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, কখনও প্রেম বা দাম্পত্য সম্পর্কে ব্যর্থতা, কখনও জীবন সম্পর্কে অর্থহীনতার মতো নানান কারণকে অবলম্বন করে তাঁর গল্প-উপন্যাস গতি লাভ করেছে। দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, চিন্তাধারার বিপুল সমাবেশও অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে একাকিত্বকে ঘনিয়ে তুলেছে। তাই হয়তো সাহিত্য-সাধনার সময় তিনি মানব-মনের একাকিত্বের দিকটি নিয়ে অধিক চর্চা করেছেন। ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর বাল্যকাল, কৈশোর এবং প্রথম যৌবন তিনি কাটিয়েছিলেন বিহারের ভাগলপুরে। ভাগলপুরে থাকাকালীন তাঁর অভিজ্ঞতার ঘড়া প্রায় অর্ধেক পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বাঁকুড়া জেলার বেতুড় গ্রামে। বিশের দশকের শেষের দিকে যখন স্বাধীনতা-সংগ্রাম জোরালো গতিতে

এগোচ্ছিল, তখন মূলত রাজনৈতিক কারণে তাঁর বাবা বগলাচরণ পালিত বিহারের বাঙালিপ্রধান শহর ভাগলপুরে এসে থিতু হন এবং ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে বিহারে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল, তার শরিক হন। যদিও দিব্যেন্দু পালিত তখনও জন্মাননি। জন্মানোর পর তিনি দেখেছেন তাঁর হাসিখুশি, মিশুকে, দিলদরিয়া, পরোপকারী বাবা উচ্ছৃঙ্খল মানুষ না হওয়া সত্ত্বেও যা উপার্জন করেছিলেন, তার কিছুই প্রায় সঞ্চয় করতে পারেননি। ফলে অপরিসীম কষ্টে ভুগে তাঁর বাবাকে তিনি মারা যেতে দেখেন। দিব্যেন্দু পালিতের বাবার জীবদ্দশায় তাঁর মা নীহারবালা পালিতের ভূমিকা ছিল অন্তরালবর্তী, চাপা। কিন্তু দিব্যেন্দু পালিত সম্ভবত উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর বাবার প্রাণোচ্ছলতার পরিবর্তে মায়ের অন্তর্মুখীনতার দিকটিই পেয়েছিলেন। নীহারবালা দেবীর নিয়মিত বই পড়ার অভ্যেস থেকে শুরু করে আবেগানুভূতির গভীরতার দিকটিও দিব্যেন্দু পালিত ধারণ করেছিলেন আজীবন। তাঁর বাবার অকাল মৃত্যুর পর তাঁর মায়ের গোপন নিঃশব্দ বিষণ্ণতা অল্প বয়সেই তাঁকে নিঃসঙ্গতা চিনিয়েছিল। তিনি নিজেই জানান, সেই একাকিত্ববোধই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র—

> হেঁসেলে উনুনের সামনে বসে রান্না করতে করতে মাঝে-মাঝে চুপচাপ চোখের জল ফেলতেন মা, তখন বড়োই নিঃসঙ্গ লাগত তাঁকে। চারিদিকের বিপুল আনন্দ ও প্রশান্তির মধ্যে থেকেও এ-রকম অনুযোগহীন, নিঃশব্দ কান্না আমি কাঁদতে দেখেছি আরও অনেককে—রোগশয্যার শেষ দিকে আমার বাবাকেও। তখন তাদের চারিদিকে ক্রমাগত ঋতুবদল করত নিরুপায় অসহায়তা। তখনই মনে হতো নিজের মধ্যে প্রত্যেক মানুষই বড়ো একা; একের সঙ্গে অন্যের পারস্পরিক সম্পর্ক যতোই নিবিড় হোক, মাঝখানে কোথাও আছে এক অতিকায় লোহার দরজা—ভারী খিল আঁটা, তার আড়ালে বসে প্রত্যেকেই ছুঁয়ে যাচ্ছে নিজের অপূর্ণতা, কথা বলছে, কেঁদে যাচ্ছে আপন মনে। দূর থেকে দেখা, তবু এই আবছা বোধ সেই ছোটো বয়সেই আমার মনে ঘনিয়ে তুলত এক ধরনের একাকিত্ব। তখন জানতাম না, আবছা এই বোধ একদিন আমাকে নিয়ে

যাবে বিশ্বাসের দিকে। গল্পে ততোটা না হলেও, প্রকারান্তরে এই বোধ গোড়ার দিকে লেখা 'সেদিন চৈত্রমাস', 'ভেবেছিলাম', 'মধ্যরাত' প্রভৃতি উপন্যাস থেকে শুরু করে এ-পর্যন্ত প্রকাশিত আমার প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই কমবেশী উপস্থিত; বিশেষত শেষের দিকের চারটি উপন্যাস—'আমরা', 'বৃষ্টির পরে', 'বিনিদ্র' ও 'চরিত্র'র মধ্যে। পটভূমি, কাহিনী, সমস্যা ও চরিত্রসমূহে বিভিন্নতা থাকলেও দূর বেহালার সুরের মতো এই অপূর্ণতা, অসহায়তা ও নিঃসঙ্গতার বোধই সম্ভবত এইসব রচনার মূল আবহ। এদের যদি কোনো সার্থকতা থাকে, তা এই মূল সত্যকে স্পর্শ করার জন্যেই।[৩]

এই নিঃসঙ্গতার করুণ কাহিনির মাঝে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পুরুষদের যে জায়গাটুকু দেয়, মহিলাদের সেটুকুও দেয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় মহিলাদের প্রাপ্য জায়গাটুকু অর্জন করে নিতে হয় অথবা অর্জন করবার জন্য নিরন্তর লড়াই করে যেতে হয়। স্বাধিকার অর্জনের জন্য মহিলাদের লড়াই, দ্বিতীয় লিঙ্গের তকমা লাভ করা মহিলাদের সামাজিক অবস্থান, কর্মসূত্র থেকে ব্যক্তিগত সূত্রে প্রাপ্ত একাকিত্বের ঐশ্বর্য সবিশেষ স্থান পায় দিব্যেন্দু পালিতের রচনায়। বিশিষ্ট সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯) এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, দিব্যেন্দু পালিতের কলমে মেয়েদের দিক থেকে জীবনকে দেখবার প্রবণতা দেখা যায়। এই 'স্পর্শকাতরতা'র জন্যই তিনি পঞ্চাশের দশকের অন্যান্য 'যৌনতা-রঙিন নজর'-বিশিষ্ট লেখকদের থেকে আলাদা বিশেষত্বের অধিকারী হয়ে ওঠেন। এ বিষয়ে স্বয়ং দিব্যেন্দু পালিত নবনীতা দেবসেনকে জানিয়েছিলেন—

এরকম অনেক দেখেছি আমি—এবং অন্য অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও, ভালোবাসাটাসার ক্ষেত্রেও সবসময়ই আমার মেয়েদের মনে হয়েছে, different আসলে যদি অন্যভাবে বলা যায়, পুরুষ চরিত্রগুলোকে আমার সবসময় one dimensional মনে হয় where as মেয়েরা multidimensional।[৪]

দিব্যেন্দু পালিতের এই ভাবনার পশ্চাতেও রয়েছে ভাগলপুরের অভিজ্ঞতা। মায়ের পাশাপাশি তাঁর দিদির দুর্ভাগ্যপীড়িত জীবনের একটা গভীর প্রভাব ছিল তাঁর মনে। খুব অল্প বয়সে ক্লাস নাইনে পড়াকালীন বিয়ে হয়ে যায় তাঁর দিদির, বিয়ের পর একটা বাচ্চাও হয়। কিন্তু বিয়ের মাত্র তিন বছরের মাথায় তাঁর স্বামী গ্যাসট্রিকের কোনও একটি সমস্যার কারণে সেপটিক হয়ে মারা যান। দুর্ভাগ্যের এমনই ছোবল যে এমতাবস্থায় তাঁর দিদি ছিলেন দ্বিতীয়বারের মতো গর্ভবতী এবং তাঁর স্বামী মারা যাওয়ার ঠিক সাত দিনের মাথায় তিনি প্রসব করেন। দ্বিতীয় বাচ্চাটির (ইন্দিরা) আগমনে গুমোট আবহাওয়ায় সবেমাত্র বাড়ির পরিবেশে একটু ঠান্ডা তাজা বাতাস বইবে বইবে করেছে, এমন সময় হঠাৎ সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় ইন্দিরার। শিশু ইন্দিরার মৃতদেহ মাটিতে পুঁততে গিয়েছিলেন দিব্যেন্দু পালিত নিজে। মাত্র উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ে, যে কিনা সম্পর্কে তাঁর নিজের দিদি, তাঁকে জীবনের চরমতম দুর্বিপাকের স্রোতে সাঁতার দিতে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন কিশোর দিব্যেন্দু পালিত। এই মর্মবিদারক নিদারুণ অভিজ্ঞতা কিশোর বয়সেই তাঁর মস্তিষ্কে যে অভিঘাত হেনেছিল, যে জীবনবোধ তৈরি করে দিয়েছিল, সেই দুর্মূল্য বোধশক্তি দিয়ে খুব সহজেই তিনি বুঝেছিলেন পিতৃতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে মহিলাদের বাধ্যত যে দুর্ভাগ্যকে বরণ করে নিতে হয়, তা পুরুষদের করতে হয় না। তাই মহিলাদের প্রতি তাঁর স্নেহ এবং মমতা বরাবরই বেশি, তবে সেটা ‘মেয়েমানুষ’ বলে নয়, মানুষ বলে। নবনীতা দেবসেন এবং শ্রাবন্তী বসুর কাছে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে নবনীতা দেবসেন দিব্যেন্দু পালিতের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তিনি ‘ফেমিনিস্ট’ কিনা। এর উত্তরে তাঁদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তা দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য-ধর্মকে অনুধাবন করবার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

দিব্যেন্দু: না। তা আমি মনে করি না। কারণ এ ধরনের কোনো ব্র্যান্ডেই আমি বিশ্বাস করি না, আমি কথাটা ব্যবহার করি না। আসল কথা হচ্ছে আমি মানুষ হিসেবে দেখি। আমি 'ঢেউ' প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলে নিই, ওই যে মেয়েমানুষ শব্দটা ব্যবহার হয়, এই শব্দটা আমার কানে শুনতে খুব খারাপ লাগে। আমি আসলে দেখাতে চেয়েছিলাম একটি মানুষকে, সে ঘটনাচক্রে মেয়ে, বাধ্যতামূলকভাবে মেয়ে। কিন্তু তার ভিতরে যে মানুষটা তাকেই কিন্তু আমি বার করতে চেয়েছিলাম।

নবনীতা: শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এল মেয়েটাই কিন্তু।

দিব্যেন্দু: কিন্তু মেয়েমানুষ নয়। তার sex টা মেয়ে কিন্তু সে মানুষ। তার বাঁচাটা, তার লড়াইটা, সর্বস্ব দিয়ে যে লড়াইটা সে করলো, including her flesh, সেটা কিন্তু মানুষেরই লড়াই। এবং শেষ পর্যন্ত সে পারলো না, পৃথিবী তাকে থাকতে দিলো না, সমাজ তাকে থাকতে দিলো না।

নবনীতা: দিলো না, সে মেয়ে বলে।

দিব্যেন্দু: আমি তাই বলছি। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের আমার কমজোরি মনে হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেয়েরা যত firm decision নিতে পারে, আবেগটা যত ধরে রাখতে পারে, পুরুষরা ততটা পারে না। কেউ কেউ হাউ হাউ করে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।

নবনীতা: তাহলে emotionally মেয়েরা অনেক stronger বলছো?

দিব্যেন্দু: অনেক depth এ গিয়ে ভাবতে পারে।[৫]

ভাগলপুরের নির্জনতা এবং পারিবারিক অভিজ্ঞতা দিব্যেন্দু পালিতকে কাঁচা বয়সেই যে একাকিত্ববোধের সঙ্গে পরিচিত করেছিল, সেই পরিচয় গাঢ়তর রং পায় ১৯৫৮ সালে তিনি যখন কলকাতা শহরের অপরিচিত বিরাটত্ব এবং বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হন। চারপাশের বিচিত্র কোলাহল এবং পরস্পরবিরোধী শব্দের প্রাচুর্য নিয়ে শহর কলকাতার বিরাট হাঁ মুখ তাঁর ক্ষুদ্র প্রাণকে গ্রাস করেছিল। তারপর নানান ঘাত-প্রতিঘাত, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিয়ত পরিশ্রম, গ্লানি, 'স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান' ক্রমে তাঁর মনকে প্রস্তুত করে—

বস্তুত, সে বড়ো নিঃসঙ্গ সময় : ক্ষুধা, ভয়, একাকিত্ব, অসহায়তা, মানুষের প্রবঞ্চনা ও অকারণ বিরুদ্ধাচরণ—এই কয়েক বছরে আমাকে উপর্যুপরি এতো আঘাতের সম্মুখীন হতে হয় যে, এমনিতে স্বাস্থ্যবান আমার শরীরে দেখা দেয় স্নায়ুর চাপ।...মনে হতো হেরে যাচ্ছি, খুব তাড়াতাড়ি একটা বিকল্প খুঁজে না পেলে আর টানতে পারব না নিজেকে। কিন্তু এই বোধও স্থায়ী হতো না বেশীক্ষণ। আশঙ্কা একা আসত না; সঙ্গে নিয়ে আসত জীবনযাপন সম্পর্কে একরকম উদাসীনতা—যা ক্লান্তি ও বিষণ্ণতা থেকে টেনে নিতে পারে নতুনতর শক্তি সঞ্চয়ের দিকে।[৬]

মফঃস্বলের আপাত সরল আবহাওয়া এবং শহরের জটিল গাঢ় ধোঁয়াশার মাঝে দু-রকমভাবে জীবন কাটানোর পর এ দুইয়ের পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনে জন্ম হয় 'এক তৃতীয় অভিজ্ঞতার'। সেই তৃতীয় অভিজ্ঞতাজাত গভীর বোধশক্তি, নিস্তরঙ্গ গভীর বিষণ্ণতা, সংযমী নিঃসঙ্গ প্রাণ ব্যাপ্তি লাভ করেছে দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যে। তাঁর সাহিত্য রচনার বিষয় সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য—

যে-দুঃখ অনাটকীয়, যে-অপমান প্রলয় জানে না, যে-দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয় ও বিবেকবোধ সুড়ঙ্গ খুঁড়ে যায় আত্মার ভিতরে, যে-কান্না সংযম মানে—আপামর মানুষকে ভিজিয়ে দেয় না চোখের জলে, যে-প্রেম তাকিয়ে থাকে, যে-ভালোবাসা উচ্ছিষ্ট করে না, যে-সব কথা, শব্দ ও সংলাপ তাদের বহুব্যবহৃত আভিধানিক অর্থ ছাড়িয়েও যেতে চায় দূরে—আরও বেশী অর্থময়তার দিকে, তা নিয়ে কি সাহিত্য রচনা করা যায়? জানি না। শুধু এটুকু জানি, যদি না যায়, তাহলে ব্যর্থ শুধু আমার প্রচেষ্টাই নয়, ব্যর্থ আরও অনেক কিছুই, এমনকি আমার দেখা-শোনা-জানা চারপাশের মানুষ ও পারিপার্শ্ব, আমার ন্যায়, নীতি, ধর্ম বিষয়ে ধারণাও।[৭]

তথ্যসূত্র:

১। Karl Marx, Friederich Engels, *Manifesto of the Communist Party*, Progress Publishers, Moscow, 1969, P. 23

২। Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, Progress Publishers, Moscow, 1859, On-Line Version: Marx.org 1993 (Preface, 1993), Marxists.org 1999, P. 4

৩। দিব্যেন্দু পালিত, 'কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান', সাগরময় ঘোষ (সম্পা.), *দেশ সাহিত্য সংখ্যা*, ১৩৮৩, এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ২০৩

৪। অনুলিখন: শ্রাবস্তী বসু, 'দিব্যেন্দু - নবনীতা আলাপচারিতা', *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), জানুয়ারি—মার্চ ২০০৩, গল্‌ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ১৯৫

৫। তদেব, পৃ. ২০২

৬। দিব্যেন্দু পালিত, 'কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান', সাগরময় ঘোষ (সম্পা.), *দেশ সাহিত্য সংখ্যা*, ১৩৮৩, এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ২০৫

৭। তদেব, পৃ. ১৯৬

(প্রথম অধ্যায়)

নগর-দর্পণে দাম্পত্য

অ্যালার্ম ক্লকের বিরক্তিকর সুর, রিকশার ভেঁপু বা পেপারওয়ালার সাইকেলের ঘন্টিতে যাদের ঘুমের রেশ কাটে, তারপর শরীরের যন্ত্রগুলোকে কোনোরকমে খাবার দিয়ে পুষ্ট করে যান্ত্রিক জীবনে আত্মসমর্পণ করা যাদের দৈনন্দিন অভ্যেস, জীবনের মূল সুর-হারানো সেই সব যন্ত্রমানুষগুলোর মনের প্রতিটা বাঁকের খোঁজ রয়েছে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে। বেঁচে থাকার যে প্রাথমিক সুরটুকু প্রতিটা মানুষকে একসঙ্গে গেঁথে রাখে, যে সুর আমাদের প্রাণের সুর, সেই সুরটাই যদি হারিয়ে যায় তবে তো সেই সুরহীন জান্তব জীবনে আর সাধর্ম থাকে না, মিলনের সুর ধ্বনিত হয় না। তখন নিজ-নিজ স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠার খেলায় নেমে শুরু হয় প্রতিযোগিতা, একে অপরের থেকে এগিয়ে যাওয়ার বিষমন্ত্র-চর্চা। প্রতিযোগিতামূলক আচরণের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে মানুষ আক্রান্ত হয় মানসিক চাপ, উদ্‌বেগ, হতাশা ইত্যাদি নেতিবাচক আবেগ-অনুভূতির দ্বারা। এরপর শুরু হয় আত্মমর্যাদার ক্ষয়, সৃজনশীলতা হ্রাস, সর্বোপরি একাকিত্ববোধ এবং অস্তিত্বের সংকট। তখন নিষ্প্রাণ যন্ত্রের বিকাশকেই মনে হয় সভ্যতার বিকাশ, সভ্যতার অগ্রগতি। কিন্তু যন্ত্র-সভ্যতার প্রবল প্রতাপে ক্ষয়ীভূত প্রাণের সহজ সুর, আবেগ-অনুভূতির বিলুপ্তিই যে সভ্যতার সংকট, সে কথা সহজে ঠাওর হয় না। যন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিপুল আগ্রাসনের মাঝে উৎপাদনযোগ্য সমস্ত ব্যবস্থার মতো সামাজিক ব্যবস্থাকেও যান্ত্রিক রূপ দেওয়া হয়েছে। এখানে সমাজের অন্যান্য শোষক ও শোষিত শ্রেণির মতো নারী এবং পুরুষকেও দুটো আলাদা শ্রেণিতে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে।

নারী এবং পুরুষের মধ্যে উৎপাদন-ব্যবস্থার সমান অংশীদার হিসেবে যে স্নেহ-প্রেম, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত, তার পরিবর্তে উৎপাদন-ব্যবস্থায় পুরুষের অগ্রাধিকার জারি করা হয়েছে। আসলে নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে যৌথ পরিবার হিসেবে সমাজ-ব্যবস্থায় যোগদান করলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় দ্বিগুণ উন্নতি হয় ঠিকই, কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের শাসকগোষ্ঠী শ্রমিকের ক্ষমতাকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতে ভয় পায়। জনগণের মিলিত শক্তি বরাবরই শাসকগোষ্ঠীর ভয়ের কারণ। তাই সর্বশক্তিমান শাসকশ্রেণি নিজেদের ক্ষমতা অটুটভাবে ধরে রাখতে যেমন বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে জাত-ধর্ম এবং অর্থনৈতিক কারণে পরিকল্পিত ভেদাভেদ তৈরি করে, তেমনই নারী-পুরুষের সমমনস্কতা এবং বন্ধুত্বে ভাঙন ধরানোর ইন্ধন যোগায়। ষড়যন্ত্র করে নারীকে সামাজিক কাজকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে পুরুষকে সরাসরি অর্থ রোজগারের অধিকারী হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়। অর্থনৈতিক শোষণ-পীড়ন যত জোরালো হয় নারীর ওপর পুরুষের অধিকার তত প্রবল হতে থাকে এবং নারী পরিণত হয় পণ্য-সভ্যতার ভোগ্যবস্তুতে। শিল্পবিপ্লবের পর নারী-পুরুষের সম্পর্ক আরও জটিল রূপ পরিগ্রহ করে। এই সময় গ্রাম এবং মফঃস্বল থেকে যৌথ পরিবার ছেড়ে পুরুষের দল শহরে আসতে থাকে কলকারখানায় যোগ দেওয়ার জন্য। পুরোনো বন্ধনের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে তারা একরকম বাধ্য হয়েই শহরে নতুন দম্পতিকেন্দ্রিক অণু-পরিবারে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট কবি এবং নারীবাদী লেখক মল্লিকা সেনগুপ্ত (১৯৬০-২০১১) যুগ-পরিবর্তনের একটা ক্রম দেখিয়েছেন—

> শিল্পযুগ বহুযুগের রাজতন্ত্রকে সরিয়ে গণতন্ত্র নিয়ে এল, কৃষিনির্ভরতা কমিয়ে শিল্পপ্রাধান্য, গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা থেকে ব্যক্তিমনস্কতা, সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদ এবং বড়ো যৌথ পরিবার

থেকে অণুপরিবার। মানব সমাজের বহু দিনের অভ্যেসে এ যে কত বড়ো ধাক্কা ছিল তা আমরা এখন বুঝতে পারব না। কিন্তু সারা পৃথিবীর সাহিত্যে এই পাল্টে যাওয়ার ইতিহাস ধরা আছে।[১]

এই 'পাল্টে যাওয়ার ইতিহাস' নয়, কিন্তু পাল্টে যাওয়ার পরবর্তী ইতিহাস তুলে ধরেছেন দিব্যেন্দু পালিত তাঁর কথাসাহিত্যে। অণু-পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যেমন বেড়েছে, তেমনই অধিকারবোধও প্রবল বেগে বেড়েছে। আর অধিকারবোধের আগ্রাসন যত প্রবল হতে থাকে, ভালোবাসার স্থান তত ক্ষীণ হতে হতে একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। অধিকারবোধ এবং ভালোবাসার টানাপোড়েনের মাঝে রয়েছে আরও বিচিত্র আর্থ-সামাজিক প্রলোভন। ভাড়া বাড়ি বা কলোনি ছেড়ে ফ্ল্যাটে উঠে আরও একান্ত হওয়ার লোভ, বাড়তি রোজগারের লোভ ইত্যাদি। তাছাড়া স্বাধীনতা-পরবর্তী মোহভঙ্গের কালে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়, তার ফলে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও একপ্রকার বাধ্য হয়েই রোজগারের আশায় চাকরি করতে শুরু করেন। একান্ত আপন হিসেবে চিনে আসা চশমা, জুতো ইত্যাদির মতো 'ঘরের বউ'-এর প্রতি স্বামীরূপী পুরুষদের যে প্রবল অধিকারবোধ, তা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে স্ত্রীর আর্থিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করে। কখনো কখনো সেই আন্দোলন প্রকাশ্যে মারধোর, গালিগালাজের আকারে নির্গত হয়, আবার কখনও অর্থের অভাবজনিত কারণে নিরুপায় হয়ে তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়ে গুমরে গুমরে মরে। অন্যদিকে মহিলারাও তো পিতৃতান্ত্রিক সমাজেরই অঙ্গ। তারাও তাদের আবাল্যলালিত সংস্কারবোধ থেকে জেনে এসেছে যে পরিবারের মালিক হবে একজন পুরুষ, কখনও পিতারূপে, কখনও স্বামীরূপে। সুতরাং পারিবারিক কর্মচারী হিসেবে মালিককে সন্তুষ্টি প্রদান করাই তো তার প্রধান কাজ। সেই চিরাচরিত কাজটি ছেড়ে অর্থ উপার্জনের জন্য নতুন কাজ শুরু করার বিষয়টি অনেক সময় তাদের নিজেদের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। আকস্মিকভাবে লাভ করা আর্থিক স্বাধীনতা বহু ক্ষেত্রেই

তাদের মানসিকভাবে স্বাধীন করে তুলতে পারেনি। ফলে মহিলাদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে সুতীব্র সংকোচ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। ফাটল-ধরা দুটি মনের যৌথ নির্মাণ হিসেবে দাম্পত্য সম্পর্ককে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন দিব্যেন্দু পালিত।

১

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর কথাসাহিত্যে এমন একটা সময়কে ধরছেন, যখন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, বিভ্রান্ত মানুষ একে অপরকে আর বিশ্বাস করতে পারে না, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা উজাড় করে দিতে পারে না। যেখানে মানুষ মানুষকে প্রতি মুহূর্তে সন্দেহ করে চলে, এমনকি নিজের সম্পর্কেও সন্দিগ্ধ থাকে, সেখানে দাম্পত্য সম্পর্ক কলুষমুক্ত অমৃতভাণ্ড হয়ে থাকবে, এমনটা আশা করাই ভুল। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশ এবং সভ্যতার আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্যের নগর-যাপনের আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করেছেন দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে। দিব্যেন্দু পালিত যখন লিখছেন তখনও যন্ত্রের আগ্রাসন মুঠোফোনের রূপ পরিগ্রহ করেনি, কম্পিউটার আবিষ্কার হলেও ভারতবর্ষ তখনও তার দাপট দেখেনি। তবু আশি-নব্বইয়ের দশকে ল্যান্ডফোন, টাইপ মেশিন, বেতার, টিভি মধ্যবিত্ত মনে কীভাবে ছেয়ে যাচ্ছে, শহরের বুকে বনেদি বাড়ির উঁচু নাক ঘষে উঠে দাঁড়াচ্ছে গর্বিত বহুতল ফ্ল্যাট, সাইকেল, ট্রাম, বাসের সস্তা-সুলভ আরাম ফেলে দৈনন্দিন আভিজাত্যের মাপকাঠি হয়ে উঠছে চারচাকা বা কমপক্ষে দুপেয়ে মোটর, তার একটা নিখুঁত চালচিত্র উঠে আসে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে। বলা চলে এখনকার মোবাইল এবং সোশাল মিডিয়ার যুগের প্রস্তুতিপর্বটিকে অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে পাঠকের সামনে পেশ করেছেন তিনি।

সব মধ্যবিত্তেরই আজন্মলালিত শখ থাকে নিজের বাড়ির মালিক হওয়ার। একান্ত আপন একটি বাড়ির, যেখানে ইচ্ছেমতো গা-হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যাবে, বাড়িওয়ালার হুমকি থাকবে না, যখন যা খুশি করা যাবে। কিন্তু একফালি ঘর পাওয়ার আশায় পৃথিবীসুদ্ধ লোকজন, বিশেষত মধ্যবিত্তেরা যে ফ্ল্যাট জোটাতে প্রাণপাত করে ফেলছে, তাকে কি আদৌ বাড়ি বলা যায়? ফ্ল্যাট বা মাল্টিস্টোরেডও তো একপ্রকার বারো ভূতের সংসার, নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকতে গেলেও পেরিয়ে আসতে হয় বারোয়ারি উঠোন, বারোয়ারি সিঁড়ি, নিজস্ব বলতে কেবলই নিজের চারপাশের দেওয়ালটুকু। আপন বলতেও চারপাশে যাঁরা থাকেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা রক্তের সম্পর্কবিহীন, নিতান্ত অপরিচিত। তবু *ঘরবাড়ি* (১৯৮৪) উপন্যাসের জয়াকে দেখা যায়, সে আর পাঁচজন অত্যন্ত সাধারণ গৃহিণীর মতো আদুরে গলায় বলে উঠেছে—

> ‘আমার কাছে ফ্ল্যাটই বাড়ি।’...‘বাব্বা! এই করতেই হিমশিম! এত টাকার ধাক্কা জানলে আমার স্বামীকে এগোতে মানা করতাম’[২]

ভারতবর্ষের প্রথম ফ্ল্যাটবাড়িটি (পরেশ অ্যাপার্টমেন্ট) তৈরি হয়েছিল ১৯৭৪ সালে বেঙ্গালুরুর মালেশ্বরমে এইচ এন অনন্তরামন এবং এইচ এন দ্বারকানাথের কন্ট্রাক্টরিতে। আশির দশক থেকে কলকাতা শহরে ফ্ল্যাট বাড়ির জয়যাত্রা শুরু। ২০১৩ সালের গণনা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞদের মতে, সম্পত্তিতে লগ্নি করার জন্য ফ্ল্যাটবাড়ি এখন অন্যতম সেরা জায়গা। সোনার দাম যেমন হুড়মুড়িয়ে বাড়ছে এবং আরও বাড়বে, ঠিক তেমনটাই ফ্ল্যাটবাড়ির ক্ষেত্রেও সত্য। মুম্বাই, পুণে, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, গুরগাঁও, নয়ডার মতো শহরকে ঘিরে কলকারখানা, তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থা, আপিস-কাছারি, ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ব্যবসার যে আড়ম্বর রয়েছে, তার সিকিভাগও কলকাতায় নেই। কিন্তু ফ্ল্যাটের ব্যবসায় কলকাতা রীতিমতো এগিয়ে রয়েছে, কারণ কলকাতার জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের

গণনা অনেকাংশেই গত কয়েক বছরে প্রমাণিত সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পেছনে রয়েছে মূলত তিনটি কারণ—

১) ভারতবর্ষের প্রথম পাতালরেলের শহরের তকমা কলকাতার হাতে থাকায় ফ্ল্যাটের দাম এখানে হু-হু করে বাড়ছে। পাতাল-রেলসংলগ্ন অঞ্চলের ফ্ল্যাটের দাম সবসময়ই বেশি, কারণ পাতালরেল সবচেয়ে দ্রুতগামী এবং সস্তা যাতায়াত ব্যবস্থা।

২) বহু অনাবাসী ভারতীয় বা প্রবাসী বাঙালি কলকাতায় একটি স্থায়ী বাসস্থান রাখবেন মনে করে সবচেয়ে দামি ফ্ল্যাটগুলি কিনে রাখেন। এর পেছনেও ব্যবসা রয়েছে, পরবর্তীকালে এখানে ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকলেও তাঁরা দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ দামে ফ্ল্যাট বেচে দিতে পারবেন অথবা ভাড়াও খাটাতে পারবেন।

৩) যেকোনো আবাসনকে ঘিরে তৈরি হয় বড়োসড়ো বাজার। কলকাতায় মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, সুতরাং থাকবার জায়গার দামও ক্রমবর্ধমান। যত মানুষ আছে, তত জমি নেই। তাই একটি ছোটো জমিতে বহুতল বাড়ি বানিয়ে কারাগারের মতো একসঙ্গে অনেক লোককে একই খাঁচায় পুরে ফেলার বন্দোবস্তই সবচেয়ে লাভজনক, তাও আবার খাঁচা নিয়েও কাড়াকাড়ি। খাঁচা একটা, প্রার্থী ১০০ জন। সুতরাং খাঁচার ব্যবসা, প্রমোটিং, সিন্ডিকেট, ব্যাঙ্কের লাভজনক ব্যবসা এখন তুঙ্গে। মানুষের তুলনায় জমির চাহিদা যত বাড়ছে, জমি বা জমির ওপর বাড়ি ব্যাপারটিও মানুষের কাছে ততই দুর্লভ হয়ে উঠছে। সেই জায়গা থেকে ফ্ল্যাট এখন আর কেবল অ্যারিস্টোক্রেসির জায়গায় নেই, মাথার ওপর একফালি ছাদ রাখার প্রাথমিক প্রয়োজনের স্তরে নেমে এসেছে। হাত-পা খেলানোর একান্ত আপন জায়গার প্রলোভন দেখিয়ে যার জয়যাত্রা শুরু, তার দশ ফুট বাই দশ ফুট একটি ঘর, একটি বারান্দা-বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের দাম কম করে বারো লাখ টাকা।

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত উপন্যাস *ঘরবাড়ি* আবাসনকে ঘিরে তৈরি হওয়া প্রথম যুগের মোহভঙ্গের উপন্যাস। নববিবাহিত দম্পতি জয়া এবং হিমাদ্রির ছিল সাদামাটা যৌথ পরিবার। আরও একটু সুখী হওয়ার আশা কার না হয়! সেই আশা তিল তিল করে জন্ম দেয় অসম্ভব সব স্বপ্নের। স্বপ্ন বড়ো সাঙ্ঘাতিক জিনিস। পূরণ হওয়ার সামান্যতম আভাস দেখা দিলেই মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে, কখনো বা দিশেহারা হয়ে পড়ে। জয়ার নিরন্তর আবদার, কিছুটা বা জেদাজেদি শেষ অবধি হিমাদ্রিকে পঁচাশি হাজারের গগনচুম্বী বাড়ির সম্মুখীন করিয়েই ছাড়ে—

> নীচে তাকালে বোঝা যায় পঁচাশি হাজারের বিনিময়ে অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে তারা। তবে পুরোপুরি অধিকার প্রতিষ্ঠার আগে আরও কিছু দাম দিতে হবে। আশপাশের ঘরবাড়িগুলো এখান থেকে অনেক নীচে—বিভিন্ন আকার ও আয়তন নিয়ে অদ্ভুত, প্রান্তরেখা পর্যন্ত বহুদূর বিস্তৃত থমথমে জ্যোৎস্নায় যা স্বাভাবিক তার চেয়ে অনেক বেশি রূপান্তরিত লাগে। তার স্পর্শ জয়াও এড়াতে পারে না।[৩]

পণ্য-সভ্যতার কাজই যেকোনো পণ্যকে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি আকর্ষক করে তোলা। তবেই না বস্তু বা পণ্য নিয়ন্ত্রণ করবে মানুষকে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার থেকে আরও ভালো, আরও সুন্দরের আশায়, আরও একান্তভাবে নিজের স্বামী-সংসারকে পাওয়ার আশায় জয়া এমন এক পণ্যের কামনা করে বসে, যা তাকে, তার পরিবারকে চিরতরে স্বাভাবিকতা-মুক্ত করে। উঁচুতলা বাড়ির সঙ্গে সমাজে আরও এক ধাপ উঁচুতে ওঠার লোভ সামলাতে পারেনি জয়া। তাই নিজেদের আর্থিক ক্ষমতার বাইরে বেরিয়ে অনেকটা দূর এগিয়ে যাওয়ার পর বুঝতে পেরেছে—

> ফ্ল্যাট কি তবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটাকেও নষ্ট করে দেবে! কী হত যদি ফ্ল্যাটটা না হত, যদি এইভাবেই এইরকম ছোট্ট এক টুকরো বাড়িতে কাটিয়ে দিতে পারত তারা! জীবন কি

বদলে যেত খুব? চেতনাটা আছে—প্রায় সারাক্ষণই কাজ করে যাচ্ছে নিঃশব্দে; তবু সে কিংবা হিমাদ্রি কি জানে ওই আটতলায় উঠে গেলেই বা কেমন হবে জীবন![৪]

অনাস্বাদিতের প্রতি প্রবল মোহ, উচ্চবিত্ত না হওয়া সত্ত্বেও উচ্চবিত্ত জীবনের ক্ষীণতম স্পর্শ পাওয়ার লোভ, একান্ত হওয়ার স্বাভাবিক স্বার্থপরতা জয়া এবং হিমাদ্রির দাম্পত্যকে তছনছ করে দিয়েছে। হিমাদ্রি তার সাধারণ রোজগারে কুলোতে না পেরে জয়ার গয়না বেচেছে, শেষপর্যন্ত তীব্র আপত্তি থাকা সত্ত্বেও পয়সার প্রয়োজনে জয়াকে দিয়ে মডেলিং করিয়েছে, জয়ার সৌন্দর্যকে বিক্রি করেছে। যতখানি মানসিক ঔদার্য থাকলে সৌন্দর্য আপামর জনসাধারণের কাছে মেলে ধরা যায়, ততখানি মানসিক উদারতা জয়া বা হিমাদ্রির মধ্যবিত্ত পিতৃতান্ত্রিক বেড়ে ওঠায় কোনোদিনই স্থান পায়নি। তাই সম্পর্কে ঘুণ ধরতে দেরি হয়নি। পণ্য এভাবেই প্রলুব্ধ করে, অনেকটা পথ এগিয়ে নিয়ে আসে, যেখান থেকে আর ফেরার রাস্তা থাকে না, আর অল্প একটুর হাতছানি ধীরে ধীরে সবকিছুকে সবকিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রথমে জয়া-হিমাদ্রিকে তাদের স্বাভাবিকতা, দৈনন্দিন-যাপনের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, তারপর তাদের দাম্পত্যের পেলব জোটকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এর ফলে অনিবার্যভাবে তাদের চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছে দুস্তর ব্যবধান, সবশেষ হয় যখন আটতলার ঐশ্বর্য থেকে ঝাঁপ দিয়ে জয়া জীবন-বিচ্ছিন্ন হয়। জয়ার আনন্দ–হাসি–কান্না-প্রাণের সমস্ত আবেগ যে হিমাদ্রিকে ঘিরে আবর্তিত হত, সেই হিমাদ্রির থেকে দূরত্ব সে মেনে নিতে পারেনি। জয়া বুঝতেই পারেনি তার প্রকৃত আনন্দ হিমাদ্রির সহচরী হওয়ায়, বহুতল ফ্ল্যাটে একান্ত যাপন করায় নয়। এইভাবেই পণ্যের হাতছানি মানুষকে বিভ্রান্ত করে, বিচ্ছিন্ন করে।

বিত্তগত অবস্থান সমাজের একটা দিক মাত্র, বলা যায় বহিরাঙ্গিক দিক। মানুষের সমাজ-মনের দিকটি সমাজের পিতৃতান্ত্রিকতার দিক। সেই দিক থেকেও একবার জয়া-হিমাদ্রির দাম্পত্যকে দেখা আবশ্যিক।

এঙ্গেলস নারী-পুরুষ সমানাধিকার আনার জন্য প্রাথমিকভাবে পরিবার প্রথার উচ্ছেদের কথা বলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সিমন দ্য বোভায়া (১৯০৮-১৯৮৬) তাঁর 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' (১৯৪৯) বইতে এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। বোভায়ার মতে, নারীর শারীরিক দুর্বলতাকে টেনে এনে এঙ্গেলস পুরুষের হাতে নারী-নিগ্রহের যে রূপ তুলে ধরেছেন, তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। লিঙ্গ-বৈষম্যকে তিনি দিতে চেয়েছেন শ্রেণিসংগ্রামের রূপ। শ্রেণিসংগ্রাম আলাদা বিষয়, নারীর জন্য অধিকারের লড়াই আলাদা বিষয়। শ্রেণিসংগ্রাম ঘুচে গেলেও তাতে মেয়েদের অবস্থান যে তিমিরে আছে, সেই তিমিরেই রয়ে যাবে। কারণ শ্রেণি বলতে প্রাথমিকভাবে পুরুষের বিত্তগত সামাজিক অবস্থানকেই চিহ্নিত করা হয়। তাছাড়া নারীকে কেবলমাত্র শ্রমিক হিসেবে গণ্য করা যায় না। কারণ তার প্রজনন-ক্ষমতা তার উৎপাদন-ক্ষমতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ, যে ক্ষমতা কেবল ব্যক্তিজীবনে নয়, সমাজ-অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্তানের জন্মদান বিষয়টি ভূমি-কর্ষণের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় বলে বোভায়া মনে করছেন। উৎপাদনের প্রয়োজন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি (হ্রাসও বটে) এর মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে ঘনঘন বাজেট অধিবেশন বসে, রাজনীতি পাল্টায়। তবে বর্তমানে নারী আর প্রজননের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ নয়, সে এখন ঘরের বাইরে বেরোচ্ছে, অর্থ উপার্জন করছে। নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান এখন স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত, যে ঘটনা বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের ভিত গোড়া থেকে নাড়িয়ে দিয়েছে। বোভায়া জানিয়েছেন—

> The economic evolution of woman's condition is in the process of upsetting the institution of marriage: it is becoming a union freely entered into by two autonomous indivisuals; the commitments of the two parties are personal and reciprocal; adultery is a breach of contract for both parties; either of them can obtain a divorce on the same grounds.[৫]

পিতৃতন্ত্র আন্তিগোনেকে জীবন্ত কবর দিয়েছে, সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেছে, খনার জিভ কেটে নিয়েছে, সুলতানা রিজিয়াকে সিংহাসন চ্যুত করেছে। সুতরাং জয়ার মতো নিতান্ত সাধারণ মেয়ের ঘর ছেড়ে বাইরে এসে বিজ্ঞাপনের মডেল সেজে অর্থ উপার্জন করা, তাও আবার স্বামীকে সাহায্য করার জন্যই করা—এরকম একটি পিতৃতিন্ত্র-বিরোধী বিষয়কে আদর-আপ্যায়ন করবে, সেটা হতে পারে না, হয়ওনি। স্বামীকে সাহায্য করতে গিয়ে, স্বামীর কথা মতো কাজ করতে গিয়ে সে স্বামী হিমাদ্রির দ্বারাই সর্বাধিক অপমানিত এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছে—

> 'তুমি একটা বেশ্যা!' কথার সঙ্গে সঙ্গে জয়ার মুখ লক্ষ করে আক্রোশের হাতটা ছুড়ে দিল হিমাদ্রি।[৬]

জয়া নিজেকে ছোটো থেকে মেয়ে বলেই জেনেছে, শুধু মেয়ে নয়, পুরুষের ছায়াসঙ্গিনী। তার চমৎকার স্বাস্থ্য, নিখুঁত মুখশ্রী তা যে কেবল হিমাদ্রির জন্যই বরাদ্দ, এ বিষয়ে কোনও দ্বিধা ছিল না তার মনে। পঁচাশি হাজার টাকার সিংহভাগ হিমাদ্রি এদিক-ওদিক থেকে যুগিয়ে ফেললেও শেষ সাড়ে বারো হাজার টাকার অভাব তাকে বাধ্য করে বউকে মডেল বানাতে। গ্ল্যামার বা টাকা কোনোটারই মোহ তাদের ছিল না। কিন্তু লোভ ছিল সমাজে জাতে ওঠার। সেই লোভ তাদের প্রয়োজনীয়তার জায়গাটাকে বিভ্রান্ত করে। পণ্যের আকর্ষণ এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে বিলাসিতাকে মনে হয় প্রয়োজনীয়তা। সেই বিলাসিতা তাদের দাম্পত্যকে খাদের কিনারায় নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দেয়—

টাকা অধিকার দেয়, টাকাই কেড়ে নেয়—ঘরের এক কোণে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে চুপচাপ সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ করতে করতে এক অনিশ্চিত মানসিকতার মধ্যে কখনও বা ভাবতে বাধ্য হয়েছিল হিমাদ্রি। দু হাজারের বিনিময়ে এক পুতুল খেলার দর্শক হয়ে থাকার এই যে নিরপেক্ষতা, এটা সে নিজেই কিনেছে।[৭]

হিমাদ্রি বা জয়া কারও মনই জয়ার আর্থিক স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি। জয়া নিজেও শ্রমের বিনিময়ে যেটুকু রোজগার করেছে, সেই টাকাটুকুর চেক কাটতে বলেছে হিমাদ্রির নামে। তাদের মধ্যবিত্ত মনের মিলন, পারস্পরিক ভালোবাসার যে আশ্রয় একে অপরকে ঘিরে তৈরি করেছিল, সেই ছিল তাদের প্রকৃত বাড়ি। পণ্য-সভ্যতার রঙিন হাতছানিতে সাড়া দিতে তাদের প্রকৃত বাড়ির দেওয়ালে ফাটল ধরে। সামন্ততান্ত্রিক মনের সঙ্গে বুর্জোয়া মনের অসম-সহাবস্থানের ফলে তৈরি হওয়া তাদের নতুন বহুমূল্য ফ্ল্যাট বাড়ি কোনোদিন তাদের আশ্রয় হয়ে উঠতে পারেনি। সম্পর্কের আশ্রয়হীনতা নিজের চাওয়া-পাওয়াকে আরও ধাঁধিয়ে দিয়েছে, একাকিত্বকে নিরবচ্ছিন্ন অনুভব করে তুলেছে। হিমাদ্রির অনুভব এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ—

যাকে মনে হত নিজেরই অংশ, সেই জয়াকেই এখন সে স্ত্রী বলে চেনে, নিজেকে তার স্বামী। অন্যমনস্কতার মধ্যে বুঝতে পারে, প্রকৃত অর্থে সে আসলে দুজন—একজন হিমাদ্রি, আর একজন যে জয়ার স্বামী।[৮]

অথবা—

হিমাদ্রি স্ত্রীকে দেখল। ঘন হয়ে উঠেছে মুখ, টলটল করছে চোখের দৃষ্টি। এতদিন জয়াকেই ভেবে এসেছিল তার ঘরবাড়ি; এখন দেখল, ঘরবাড়ির মধ্যে ওকে নিজের করে দেখার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে শিকড়। এতদিনের চেনা, তবু এই মুহূর্তে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে, ওর ঠোঁট দুটো নিজের মুখের মধ্যে টেনে নিতে নিতে হিমাদ্রি অনুভব করল—এই প্রথম—শরীরের কোলাহল যেখানে গিয়ে ঘা মারে বুকের সেইখানে জমে আছে খাঁ খাঁ শুষ্কতা।[৯]

অন্যদিকে জয়াও খুশি হতে পারেনি তার আর্থিক-স্বাধীনতা লাভের ঘটনায়। আসলে সে আর্থিকভাবে কোনোদিনই স্বাধীন হতে চায়নি। হিমাদ্রি যখন আর একা পেরে উঠছিল না, তখন হিমাদ্রিকে সাহায্য করার জন্যই মডেলিং-এর কাজে যোগদান করা ছিল তার ক্ষণিকের প্রয়াস। অর্থের প্রয়োজন মিটবার সঙ্গে সঙ্গে সে তার রূপ-বিক্রির কাজে ইস্তফা দিতে চায় কিন্তু পণ্য-সভ্যতার আরেক পাকচক্র 'কনট্র্যাক্ট' তাকে জড়িয়ে রাখে। পয়সা যখন সে নিয়েছে, কাজে ইস্তফা দেওয়াটা আর তার হাতে নেই। তাকে চলতে হবে মালিক শ্রেণির প্রয়োজন অনুযায়ী। পিতৃতান্ত্রিক আদলে বেড়ে ওঠা জয়া ছিল যথার্থই হিমাদ্রির স্ত্রী। যে স্বামীর পরিচয়কেই নিজের পরিচয় বলে জানে, যে জানে বাইরের কাজ, আর্থিক উপার্জনের কাজ একান্তভাবেই তার স্বামীর। তাকে হিমাদ্রি বিয়ে করে এনেছে মানে তার যাবতীয় জাগতিক চাহিদা পূরণের দায়ও হিমাদ্রির। সেই জায়গা থেকেই তার ফ্ল্যাটের বায়না। হিমাদ্রিও সেই দুঃসাধ্য বায়না পূরণ করাকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করে, স্ত্রীকে অর্থ উপার্জনের জন্য কাজে পাঠানোর ব্যাপারটিকে নিজের অক্ষমতা, পৌরুষের অপমান বলে চিহ্নিত করে। 'স্বামী' নামক পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত হওয়া একটি উপগ্রহের জীবনই ছিল জয়ার কাঙ্ক্ষিত জীবন। তাই সে নিজেও শরীর বা শরীরী বিভঙ্গকে শিল্প হিসেবে দেখতে পারে না। তার কাছে শরীর কোনও অপূর্ব সৃষ্টি নয়, তা শুধুই তার স্বামীর জন্য গচ্ছিত গুপ্তধন, যা সে গোটা পৃথিবীর থেকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে নিবেদন করেছে স্বামী হিমাদ্রির পায়ে। তাই বিজ্ঞাপনের কাজ তার কাছে কেবল এবং কেবলমাত্র শরীর-বিক্রি, অন্য আর কিছু নয়। বিজ্ঞাপনের কাজ করে পাওয়া টাকাও তার কাছে অসহনীয়। নিজের অস্তিত্বের ওপর নিজের মালিকানাকে অস্বীকার করে বড়ো হওয়া জয়া তাই কখনোই মেনে নিতে পারেনি শ্যামলের সাধারণ প্রশংসাকে, বা সেই টাকায় পাওয়া তার স্বপ্নের ফ্ল্যাটটিকে। তথাকথিত পুরুষের জগতে ঢুকে পড়ে, পুরুষের কাঁধে

কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার পর অপরিচয়ের অভিজ্ঞতা তার কাছে হয়ে ওঠে ক্লেদাক্ত। কারণ স্বামীর বুকে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাওয়া আর স্বামীকে তুষ্ট করে চলাকেই যে সে নিজের জীবনের চরমতম সার্থকতা বলে মনে করে। সেইরকম পিতৃতান্ত্রিক শিক্ষাই রয়েছে তার রক্তে-মজ্জায়। শারীরিক বিশুদ্ধির সেই অহংবোধে যেদিন হিমাদ্রি ঘা বসায়, সেইদিনই সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

২

জয়ার ঠিক বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে *সিনেমায় যেমন হয়* (১৯৯০) উপন্যাসের গার্গী। গার্গী টাকার মর্ম বোঝে কিন্তু সে টাকা তার স্বামী দীপঙ্করের টাকা নয়। সে বোঝে তার নিজের উপার্জিত অর্থের মূল্য, যা তাকে এনে দেয় আত্মবিশ্বাস, জীবনের পথে হেঁটে চলার পায়ের জোর, সম্মান এবং স্বাতন্ত্র্যের বোধ। শুধু নিজের দায়িত্ব নয়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চলতি নিয়মানুযায়ী ছেলেদের যেমন নিজের বাড়ির প্রতি কিছু দায়বদ্ধতা থাকে, তেমনি গার্গীও স্বামীর অমত থাকা সত্ত্বেও বিয়ের পরও নিজের (বাবার) বাড়ির আর্থিক দায়দায়িত্ব যতদূর সম্ভব পালন করবার চেষ্টা করে। গার্গী দ্বিচারী নয়, ব্যভিচারীও নয়, স্বামী-সন্তানের দায়িত্ব যতদূর সম্ভব পালন করে। কাজের লোক, ছেলেকে দেখার লোক থাকলেও তাদের অনুপস্থিতিতে গার্গীকেই সংসারের জোয়াল টানতে হয়। সকালে উঠে বাজারহাট, রান্নাবান্না, স্বামী এবং ছেলেকে তৈরি করা, স্কুলে ছেড়ে দিয়ে আসা, নিজের অফিস, আবার ফিরে ঘরের কাজ—সবকিছুর দায় গার্গীর কাঁধে। তবু তার সংসারে তিল-তিল করে ভাঙন ধরে, শেষে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় প্রধানত চারটি কারণে।

প্রথমত, যাবতীয় দায়দায়িত্ব গার্গী বিনাবাক্যে মেনে নেয়নি, যখন-তখন প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং জানানোটাই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, বিয়ের পরও শ্বশুর-বাড়ির তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও, স্বামীর হাজার অনুনয়-বিনয়কে উপেক্ষা করে বাড়ির বাইরে যায় রোজগার করতে—

> দীপঙ্কর বিশ্বাস করে দোষ তার স্ত্রীরই। কোনও স্ত্রী বা বাড়ির বউকেই এতটা স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। কিছু কিছু ব্যাপার গার্গী যদি মুখ বুজে সহ্য করে নিত—বিশেষ করে ছেড়ে দিত চাকরিটা, তাহলে এসব ঘটনা ঘটত না।[১০]

তৃতীয়ত, বিয়ের পর যেখানে শ্বশুরবাড়িই মেয়েদের একমাত্র ধর্ম এবং কর্মের স্থান বলে সমাজ মনে করে, সেই সমাজ-মনে ঘা দিয়ে গার্গী নিরন্তরভাবে নিজের বাপের বাড়িকে আর্থিক সাহায্য করে গেছে। হয়তো দীপঙ্কর বা তার বাড়ির লোক গার্গীকে আপিস যাওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় দিত যদি গার্গীর সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিকানা পেত তার স্বামী কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা না হওয়ায় স্বাভাবিক নিয়মেই গার্গীর প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা ক্রমবর্ধমান হয়েছে।

চতুর্থত, গার্গী সরকার থেকে গার্গী ব্যানার্জী হয়ে ওঠার প্রকল্প সমাজের তীব্র হুঙ্কারের কাছে শেষপর্যন্ত মুখ থুবড়ে পড়েছে। অসবর্ণের শরীর ভোগ করা যায় কিন্তু তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত দীপঙ্করের মা নীহার কোনোদিনও মেনে নিতে পারেননি। দীপঙ্করের বোন তমসা যদিও তাদের বাবার টাকার দম্ভ, মায়ের ব্রাহ্মণত্ব এবং বনেদিয়ানার অহঙ্কার, দাদার একচেটিয়া সুখভোগের মুখে চুনকালি দিয়ে তার বৌদি গার্গীর এগিয়ে যাওয়াকে, অযথা বাগ্‌বিতণ্ডা না করে নিঃশব্দে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকাকে মুগ্ধ নয়নে প্রশংসা করে গেছে, কিন্তু শেষ জয় হয়নি গার্গীর। কারণ সমাজে তমসার মতো মেয়ে যেমন রয়েছে, তেমনিই রয়েছে নীহারের মতো মেয়েও। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সবসময় নীহারদেরই দুহাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করেছে কারণ নীহার সমাজের নিজস্ব

ছাঁচে গড়া মডেল, পিতৃতন্ত্রের নাড়ি থেকে সৃষ্ট প্রতিনিধি। তাই দীপঙ্করের ঝোঁকও ছিল তার মায়ের দিকে, বোনের দিকে নয়। তাছাড়া দীপঙ্কর কোনোদিন তার স্ত্রীকে মানুষ হিসেবে দেখেনি, দেখেছে রঘুনাথ ও নীহারের একমাত্র পুত্রবধূ হিসেবে, নিজের স্ত্রী (ব্যক্তিগত সম্পত্তি) হিসেবে এবং তার ঔরসজাত সন্তান দীপ্রর মা হিসেবে—

> ...—গার্গী হিসেবে, একজন ব্যক্তি হিসেবে, যার ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে, মান অভিমান আছে, এবং, যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা, আছে আত্মবোধ, এগুলো দেখেনি। দেখলে বুঝত, অনুভবও করতে পারত, শুধুই সামাজিক পরিচয়ের অজুহাত দিয়ে মানুষের সহ্যশক্তি বাড়ানো যায় না। মানুষ পরিচয়ের স্বীকৃতিও চায়।[১১]

দীপঙ্কর গার্গীকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া দুরস্থান, বিবাহিত অবস্থাতেই অন্য নারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে এবং শেষকালে গার্গীকে ডিভোর্স দিয়েছে তাকে দোষারোপ করেই। বিয়ে এবং সন্তানের জন্মদান বা সন্তান পালন করাকে গার্গী নিজের জীবনের চরমতম পরিণতি হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। তাছাড়া বিয়ের আগে থেকেই সে চাকরি করত। হঠাৎ বিয়ে করার পর দীপঙ্করের জীবন যেখানে কণামাত্র পরিবর্তিত হয়নি, সেখানে গার্গীকে তার আপাদমস্তক পরিবর্তন করতে হবে কেন—এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর গার্গী নিজেই নিজেকে দিতে পারেনি। এর মধ্যেই রয়েছে লিঙ্গ রাজনীতি, যা একটি মেয়ের কাছে দুটি বিকল্পকে খোলা রাখে, এক, স্বামী-সন্তানের প্রতি জীবন নিবেদিত করে সমাজ-নির্মিত কাল্পনিক সুখে গা ভাসানো। দুই, নিজের চাওয়া-পাওয়াগুলিকে গলা টিপে হত্যা না করে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া, ব্যক্তিমানুষ হিসেবে নিজেকে সম্মান করা এবং পরিণাম হিসেবে সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে একার জীবনকে মেনে নেওয়া।

ড. বুলা ভদ্র সমাজ-নির্মিত লিঙ্গভেদকে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রয়োগ করেছেন ভারতীয় নারীত্বের ওপর বিভিন্ন প্রাদেশিক সমীক্ষার ফলাফল আলোচনার সূত্রে—

ভারতীয় পৌরুষ/ ভারতীয় নারীত্ব

১। আক্রমণাত্মক ও আগ্রাসী/ একেবারেই আক্রমণাত্মক নয়

২। স্বাধীনচেতা/ আদৌ স্বাধীনচেতা নয়

৩। বস্তুনিষ্ঠ/ বস্তুনিষ্ঠ নয়

৪। একেবারেই আবেগপ্রবণ নয়/ খুব আবেগপ্রবণ

৫। সহজে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় না/ সহজে প্রভাবিত হয়

৬। কর্তৃত্বপূর্ণ/ বাধ্য ও বশ্য

৭। আত্মবিশ্বাসী/ একেবারেই আত্মবিশ্বাসী নয়

৮। কখনও কাঁদে না/ খুব অল্পেই কাঁদে

৯। নরম অনুভূতি প্রকাশে অক্ষম/ সহজেই নরম অনুভূতি প্রকাশ করে

১০। কড়া কথা বলে/ কড়া কথা বলে না

১১। কম কথা বলে/ বেশি কথা বলে

১২। যুক্তিনিষ্ঠ/ অযৌক্তিক

১৩। প্রতিযোগিতা পছন্দ করে/ প্রতিযোগিতা পছন্দ করে না

১৪। উচ্চাকাঙ্ক্ষী/ উচ্চাশা নেই

১৫। সবকিছুতে সক্রিয়/ কোন কিছুতেই সক্রিয় নয়

১৬। এলোমেলো ও অগোছালো/ পরিষ্কার ও গোছালো

১৭। নিজের চেহারা সম্বন্ধে সচেতন নয়/ খুব সচেতন

১৮। অঙ্ক ও বিজ্ঞান পছন্দ কিন্তু কলা ও সাহিত্য পছন্দ নয়/ কলা ও সাহিত্য পছন্দ কিন্তু অঙ্ক ও বিজ্ঞান পছন্দ নয়।

১৯। ভোগী, কলঙ্ক স্পর্শ করে না/ সতীত্ব, পবিত্রতা ও ত্যাগ অপরিহার্য মতাদর্শ।[১২]

সমাজ-নির্মিত এই গুণগত মানগুলির কোনোটিই গার্গী ছুঁতে পারেনি। অন্যদিকে দীপঙ্কর প্রায় সবকটি গুণের অধিকারী। সুতরাং সামাজিক জীব হিসেবে, সমাজে বসবাসকারী প্রাণী হিসেবে দীপঙ্করকে সমাজ পুরস্কৃত করেছে, নতুন করে জীবন শুরু করার, নতুন করে ঘর বাঁধবার সুযোগ করে দিয়েছে আর গার্গীকে 'বিবাহবিচ্ছিন্না' তকমা দিয়ে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং, একজন পুরুষের বিচ্ছিন্নতার, একাকিত্বের অনুভূতিকে যদিও বা মার্কসের অ্যালিয়েনেশনের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু একজন নারীর একাকিত্বের কারণ অনেক বেশি জটিল। এই একাকিত্বের শুরু প্রায় তার জন্মের পর থেকেই, নারী হয়ে ওঠার অনেক আগে থেকেই। বোভায়া বলেছিলেন, নারী হয়ে কেউ জন্মায় না। কিন্তু জন্মানোর পর থেকে গোটা সমাজ উঠে পড়ে লাগে তাকে নারী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। এই গড়ে তোলার প্রক্রিয়াই নারীকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যায়। নারীর শৈশব থেকে যৌবনের যাত্রা অনেকটা এইরকম—

> Throughout her childhood, the littile girl was bullied and mutilated; but she nonetheless grasped herself as an autonomous indivisual; in her relations with her family and friends, in her studies and games, she saw herself in the present as a transcendence: her future passivity was something she only imagined. Once she enters puberty, the future not only moves closer: it settles into her body; it becomes the most concrete reality. It retains the fateful quality it always had; while the adolescent boy is actively routed toward adulthood, the girl looks forward to the opening of this new and unforeseeable period where the plot is already hatched and toward which time is drawing her. As she is already

> detached from her childhood past, the present is for her only a transition; she sees no valid ends in it, only occupations. In a more or less disguised way, her youth is consumed by waiting. She is waiting for man.[১৩]

তারুণ্যের এই যাপনই ঠিক করে দেয় নারী আসলে পুরুষের জীবনের একটি মাত্র অংশ, আর অন্যদিকে পুরুষ একজন নারীর জীবনের সমগ্র। একজন পুরুষই পারে নারীর নারীত্বকে সার্থক করতে, তাকে পূর্ণতা এবং মুক্তি দিতে। পুরুষ মুক্তিদাতা, ক্ষমতাশালী, সমাজের চাবিকাঠি তার হাতে এবং সে এক বা একাধিক নারীকে উদ্ধার করে, তার সঙ্গে সঙ্গম করে তাকে ধন্য করে। সঙ্গমের জন্য পুরুষটি যদি নারীকে সামাজিক মর্যাদা দেয়, অর্থাৎ বিয়ে করে এবং সঙ্গমের স্মারক হিসেবে একটি সন্তানের জন্ম দেয়, তবে তা হবে নারীর জীবনের চরমতম সার্থকতা, নারীত্বের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। তাই সমাজের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া একজন খাঁটি মেয়ের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যই হয়ে দাঁড়ায় বিবাহ। কারণ বিবাহ সম্পন্ন হলেই সমাজ একটি মেয়ের যাবতীয় দ্বন্দ্ব, শঙ্কা, অনিশ্চয়তাসহ স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার অবসান ঘটিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে। এর ফলে দুটি দিক সুরক্ষিত হয়—

১) নারীর নিজের শরীরের ওপর তার নিজের আর কোনও অধিকার থাকে না। তার মালিকানা পায় তার স্বামী, প্রকারান্তরে তার শ্বশুরবাড়ি তথা সমাজ।

২) নারী গর্ভধারণ করবে কিনা বা ঠিক কত বার গর্ভধারণ করবে বা কোন লিঙ্গের সন্তান তার শ্বশুরবাড়ি এবং সমাজকে উপহার দেবে, সেটাও আর তার নিজের হাতে থাকে না। এমনকি শিক্ষিত, চাকুরিরত নারীর ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। সে শখের জন্য বা শ্বশুরবাড়িতে অর্থ সমাগমের জন্য রোজগার করতেই পারে কিন্তু তার প্রাথমিক কাজ পতিসেবা এবং স্বামীর বংশের বিকাশ-সাধন তথা সমাজের জন্য

ভবিষ্যতের শ্রমিক-নির্মাণ করা। এর অন্যথা হলেই দাম্পত্যে তৈরি হয় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার বাহ্যিক কারণ হিসেবে বিদগ্ধ গবেষক সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৯২১-২০১৪) দৃষ্টিগোচর কিছু কারণের উল্লেখ করেছেন—

> ...আর্থিক অসঙ্গতি, রুচির বৈষম্য, সন্তানপালন সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্য, জীবনের লক্ষ্য ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে মতবৈষম্য, পারিবারিক সমালোচনা, স্বামীর নিজের পরিবারের আচরণ ব্যাপারে পক্ষপাতী অন্ধতা, স্ত্রীর আপন পরিবারের প্রতি আনুগত্য বা কর্তব্য-বোধ সম্বন্ধে স্বামীর ও শ্বশুরবাড়ির অসহিষ্ণুতা—এইসব এবং আরও একহাজারটা কারণ দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে। যথাকালে অর্থাৎ সূচনাতেই পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে এর নিষ্পত্তি না ঘটলে অভিযোগ ক্রমে অনুক্ত থেকে উক্ত এবং মৃদু থেকে দুর্বিষহ কটুতায় পরিণত হয়। তখন পরস্পরকে সহ্য করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে, বিয়ের ভিৎ টলে যায় এবং বিচ্ছেদ যেন অনিবার্য বলে মনে হয়।[১৪]

গার্গী এবং দীপঙ্করের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং রুচির বৈষম্য রয়েছে এমন কোনও ইঙ্গিত উপন্যাসে পাওয়া যায়নি। তবে এই দুটি দিক ব্যতিরেকে বাদ বাকি সব কটি সমস্যাই তাদের দাম্পত্যে ঘনিয়ে উঠেছিল। হয়তো নিয়মিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলির সুরাহা করা সম্ভব ছিল কিন্তু আলাপ-আলোচনায় মানুষ তখনই আগ্রহী হয় যখন দাম্পত্যে প্রেম থাকে। প্রেম কিন্তু রাগ, ঘৃণা, বিদ্বেষ ইত্যাদির মতোই একটি আবেগ, যা সম্পূর্ণ অকারণেই আসে, আবার অকারণেই চলে যেতে পারে। আবার উক্ত বহিরাঙ্গিক কারণগুলির চাপেও প্রেমের মৃত্যু ঘটতে পারে। *সিনেমায় যেমন হয়* উপন্যাসে দীপঙ্করের দিক থেকে প্রেমের মৃত্যু ঘটেছিল, সন্দেহ নেই। কারণ আলাপ-আলোচনা, তেল-তোয়াজের মাধ্যমে গার্গীর প্রাণান্তকর চেষ্টার পরও উপন্যাস জুড়ে দীপঙ্করের দিক থেকে চূড়ান্ত অনাগ্রহ এবং নিস্পৃহ আচরণ সেই কথাই ঘোষণা করে।

তাছাড়া উপন্যাসের শেষের দিকে দেখা গেছে, সে অন্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে এবং সে-ই ডিভোর্সের জন্য প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে। অর্থাৎ, যেকোনো একজনের অনিচ্ছা, বা একজনের তরফ থেকে প্রেমের অভাব সম্পর্কে ভাঙন ধরানোর জন্য যথেষ্ট।

৩

অস্বস্তি আর চূড়ান্ত অসহায়তা, হতাশা মাখানো এক গভীর বিষণ্ণতা *সেকেন্ড হানিমুন* (১৯৯৬) উপন্যাসের মূল সুর। সুপর্ণা আর শিলাজিৎ এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। তাদের প্রায় ভঙ্গুর দাম্পত্য সম্পর্ককে ঘিরে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আশেপাশের পরিচিত শব্দগুলো ঝিমিয়ে পড়ে, রাতের অন্ধকারে গুম হয়ে যায়, তেমনি প্রতিনিয়ত ঝগড়াঝাটি, মারপিট, বিষাক্ত পরিবেশের অপরিচ্ছন্ন-অন্ধকার ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে দাম্পত্যের পরিচিত নির্ভরশীলতাকে, পরিচিত আদর–যত্নগুলোকে। তখন অচেনা গতির নৈঃশব্দ্য এমনভাবে ঘনিয়ে ওঠে যে নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ, হৃৎপিণ্ডের শব্দ, চোখের অন্তঃস্থলে শুকিয়ে যাওয়া অভিমানের শব্দ দাম্পত্যের সাধারণ মায়ায় গড়া আটপৌরে শব্দের মাধুর্যকে ছাপিয়ে যায়। বুকের মধ্যে খাঁ-খাঁ করে ওঠে কেবলমাত্র শূন্যতার শব্দ—

> সত্যিই বদলে গেছে, তারা, যেন স্বাভাবিকতা হারিয়ে ঢুকে পড়েছে এক ধরনের বাধ্যতামূলক জীবনযাপনে। সম্পর্ক থেকে স্বাভাবিকতা চলে গেলে কী থাকে![১৫]

উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি আবর্তিত হয়েছে সুপর্ণা ও শিলাজিতের দাম্পত্য জীবনের একটি অসঙ্গতিপূর্ণ রাত্রিকে ঘিরে। যদিও অসঙ্গতি, ঝগড়া, ঝামেলা, অশান্তিই তাদের দাম্পত্যের মূল সুর। তবু কোনোরকমে জোড়াতালি মেরে একমাত্র সন্তান পূষণের মুখ চেয়ে তারা দুজনেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল কিন্তু একদিন রাত্রির আকস্মিক একটি ঘটনায় তাদের

তাসের ঘর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। গত দু-বছর ধরেই তাদের সম্পর্কের স্রোতে ভাঁটা পড়েছে, ঝগড়া, কথা-কাটাকাটি কম হয়নি, শিলাজিৎ মাঝেমধ্যে সুপর্ণার গায়ে হাত চালাতেও কসুর করেনি কিন্তু সুপর্ণা কোনোদিনই শিলাজিতকে পালটা আঘাত হানেনি। বরাবর শিলাজতের মার হজম করে নিতে নিতে একসময় সুপর্ণার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়, সেই রাতে সেও শিলাজিতের থাপ্পড়ের উত্তরে তার গায়ে হাত তোলে। পিতৃতান্ত্রিকতার সাধারণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এই কাজে স্বভাবতই শিলাজিৎ স্তম্ভিত হয় এবং তারপর 'গেট আউট' বলে গর্জন করে সুপর্ণাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। আটত্রিশ বছরের যুবতী সুপর্ণাও রাগের প্রচণ্ডতায়, জেদের ঘোরে আসন্ন বিপদ, সন্তানের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে সাত–পাঁচ না ভেবে মাঝরাতেই বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নামে। সমস্যা কিন্তু এক দম্পতির মধ্যেকার মনোমালিন্য নিয়ে নয়, তাদের প্রায়-ভঙ্গুর দাম্পত্য নিয়েও নয়। সমস্যা হল, এই সামাজিক সম্পর্কটি ভেঙে যাওয়ার পর সমাজ এই ভাঙনটিকে কীভাবে গ্রহণ করছে, ভাঙনের দায়ভার কার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, তাই নিয়ে। গল্পের ভেতর প্রবেশ করার পর পাঠক ক্রমে দেখতে পাবেন শিলাজিতের প্রতি সমাজ যতটা সদয়, সুপর্ণার প্রতি মোটেই ততটা নয়। উপন্যাসের শুরুতে দেখা গেল, সুপর্ণা অন্যায়ের প্রতিবাদ করল কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রতিবাদে স্থির থাকতে পারল না। সমাজ, সামাজিক সম্পর্ক, এমনকি রক্তের সম্পর্কযুক্ত মানুষগুলিও তার লড়াইয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল না। নিরন্তর মানসিক চাপ, সমাজের নির্লজ্জ একচোখোমি তাকে এমন একাকিত্বের দিকে ঠেলে দিল যে সে সমস্ত অন্যায় মেনে নিয়ে মাথা নোয়াতে বাধ্য হল।

পুরুষশাসিত সমাজ, যেখানে পুরুষের ভূমিকা মুখ্য আর নারীর ভূমিকা গৌণ, যেখানে বিবাহসূত্রে একটি মেয়ে তার পিতৃবংশ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য আরেকটি পিতৃবংশের সদস্যপদ লাভ করে মাত্র, সেখানে সে যে 'সদস্যের' মর্যাদাটুকুই পাবে, এতে

আর আশ্চর্যের কী আছে। এমনকি চাকরির পদ ধরে রাখার জন্য যেমন নিয়ম করে শর্তাবলী পালন করতে হয়, মুখ বুজে ঊর্ধ্বতনের যাবতীয় স্বৈরাচার মেনে নিতে হয়, ঠিক তেমনই সংসারে নিজের সদস্য পদটি ধরে রাখার জন্য একজন বিবাহিত মহিলাকে বিনাবাক্যে পরিবারের সর্বনিম্ন অধস্তন কর্মচারীর দায়দায়িত্ব পালন করে যেতে হয়। সুপর্ণা এতদিন তাই করছিল কিন্তু দিনের পর দিন 'domestic violence' আর স্বামীর অসৎ আচরণকে মেনে নিতে না পেরে একদিন শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে মাঝরাত্তিরেই বেরিয়ে আসে এবং কোথায় আশ্রয় নেবে বুঝতে না পেরে নিজের দিদি অপর্ণার কাছে যায়। আশ্চর্যের বিষয় সমস্ত ঘটনা শোনার পর তার নিজের দিদি তার পাশে দাঁড়ায়নি, বরঞ্চ অবিশ্বাসের চোখ নিয়ে বলেছে—

> ...'তা বলে এইভাবে চলে আসবি! জীবনটা নিয়ে খেলিস না, সুনু। ছেলেটার কথাও ভাববি তো!'[১৬]
>
> ...'এক হাতে তালি বাজে না, সুনু। সত্যি বল তো, কী হয়েছিল কাল? শুধু শুধু ও গায়ে হাত তুলবে কেন!'[১৭]

অপর্ণার তরফ থেকে প্রশ্নটা হওয়া উচিত ছিল 'গায়ে হাত তুলবে কেন'। পরিবর্তে প্রশ্ন এল, 'শুধু শুধু' গায়ে হাত তুলবে কেন? অর্থাৎ অপর্ণা পিতৃতান্ত্রিকতার একজন প্রতিনিধি হিসেবে মনে করে, গায়ে হাত তোলাটা বড়ো কথা নয়। কারণ থাকলে স্বামী স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতেই পারে অথবা, এমনি এমনি তো গায়ে হাত তোলেনি। যথার্থ কারণ ছিল বলেই সুপর্ণার স্বামী তাকে শাসন করেছে এবং স্বামী হিসেবে স্ত্রীকে শাসন করার অধিকার শিলাজিতের আছে।

গায়ে হাত তোলার কারণ হিসেবে সুপর্ণা জানিয়েছে, তার অফিসের অডিও-ভিস্যুয়াল ইউনিটের ডিরেক্টর অভিমন্যুর সঙ্গে একটি চায়ের বিজ্ঞাপনে স্বামী-স্ত্রীর একটি

‘ইনোসেন্ট সিকোয়েন্সে’ সে মডেল হিসেবে কাজ করে। তাতে শিলাজিতের যথেচ্ছ রাগ হয় কারণ তার অফিসের সহকর্মীরা নাকি বিজ্ঞাপনটি দেখে তাকে জানিয়েছে তার স্ত্রী অভিমন্যুর সঙ্গে ‘অ্যাফেয়ারে’ জড়িয়ে পড়েছে। এই অভিমন্যু অফিসের টি-পার্টি থেকে ফেরার পথে সুপর্ণাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যায় বলে শিলাজিৎ তার সঙ্গে গোল পাকায় এবং ভয়ঙ্কর আক্রোশ নিয়ে গায়ে হাত তোলে। শিলাজিৎ নিজে যখন তার বন্ধুদের মদের পার্টিতে মদ্যপ অবস্থায় তার বন্ধু সোমদেবের স্ত্রী রীতাকে জোর করে সর্বজনসমক্ষে চুম্বন করে, সেটাকে অবশ্য সে তার স্বাভাবিক অধিকার বলে মনে করে। সব শোনার পর সুপর্ণার দিদি সুপর্ণাকেই দোষারোপ করেছে। শিলাজিতকে দায়ী করেনি এমন নয়, কিন্তু তা নেহাতই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো করে আলগা কপটতা নিয়ে বলা কয়েকটা সংলাপমাত্র। কারণ তার বিশ্বাস এই বয়সে ছেলেরা এরকম করেই থেকে, সেইটেই স্বাভাবিক।

সুপর্ণা আর অপর্ণা একই বাড়ির সন্তান, একইসঙ্গে একইরকমভাবে তাদের বেড়ে ওঠা। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই যতখানি দাপটের সঙ্গে সে শিলাজিতের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল, সেই প্রতিবাদের অগ্নিশিখা ম্লান হতে দেরি হয়নি। একটি চাকরি থাকা সত্ত্বেও, স্বাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তার ভেতরে প্রোথিত সামাজিক শিকড়, তার নিকটতম মানুষজনেদের অস্বস্তিদায়ক আচার-আচরণ, কথাবার্তা তার আত্মবিশ্বাসের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু সময়ের ব্যবধানেই সে তার অন্তরকে চিনেছে—

> দৃষ্টি এখন আর নির্দিষ্ট কিছুতে নিবদ্ধ নয়, স্মৃতি বলতে শুধুই গতকাল—তার পরের ভাবনায় এগোনোর সূত্র নেই। কোনো-কোনো গল্প যেমন, অসংখ্য শব্দে ভরা থাকলেও এগোয় না, ক্লান্ত করে, কিংবা সেই যে এক পাহাড়ি ঢল দেখেছিল কোথায় গিয়ে যেন—সরু হতে হতে হঠাৎই হারিয়ে গেছে মাটি, পাথর আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে, সেইরকম, তার জীবনও কি থেমে গেল

এইখানে! শিলাজিৎ দত্তের স্ত্রী সুপর্ণা দত্ত—এইমাত্র পরিচয়ের বাইরে সে আর এগোতে পারছে না কেন![১৮]

সুপর্ণা-শিলাজিতের আঠারো বছরের দাম্পত্য জীবনে শিলাজিৎ এর আগেও সুপর্ণার গায়ে হাত তুলেছে, সুপর্ণা রাগ করেছে, তার দিদির বাড়িতে এসেছে। তার দিদির স্বামী রাজীব কিছুই ঘটেনি এমন ভাব করে শিলাজিতকে বাড়িতে ডেকে এনে খানিক হুইস্কি খাইয়ে আপাতভাবে সুপর্ণা-শিলাজিতের সম্পর্কে সেলোটেপ লাগিয়েছে। দিনকয়েকের জন্য হয়তো শিলাজিৎ নিজের আচরণের কারণে অনুতপ্তও হয়েছে কিন্তু ক-দিন যেতে না যেতেই কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী মেজাজে ফিরে এসেছে।

ওই দিনের ঘটনার পর শিলাজিৎও বিচলিত হয়েছে। গানে ধুয়ো তুলবার মতো তার মাথাতেও যখন-তখন সেদিনের বিশ্রী ঘটনাটার সুর হানা দিয়েছে। আঠারো বছরের সম্পর্কজনিত অভ্যেসের থেকে ছাড়পত্র পাওয়া সহজ নয়। সেও সম্পর্কে ছেদ পড়ার বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, বিচলিত হয়েছে কিন্তু এই ঘটনার ফলে তার জীবন সুপর্ণার মতো থমকে যায়নি। সম্পর্কে ভাঙন ধরায় সে যত না বেশি দুঃখিত ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তিত ছিল দুটি কারণে, প্রথমত তাদের সন্তান পূষণ এই বিষয়টি নিয়ে কী ভাববে, সে পূষণের চোখে খাটো হয়ে যাবে কিনা—

পূষণ এখনও জানে না কী হয়েছে। যখন জানবে, প্রথমে কার দিকে চোখ তুলে তাকাবে সে! মায়া কিংবা দুঃখে নয়, অবিশ্বাসে চোখ নাড়ল শিলাজিৎ।[১৯]

অন্যদিকে সুপর্ণার ভাবনায় ছিল—

...না—না, পূষণকে এই ঘেরাটোপে ফেলে লাভ নেই। দোষটা তার, হয়তো শিলাজিতেরও—হয়তো, শুধু হয়তো কেন, নিশ্চয়ই, দোষটা তাদের দুজনেরই। সোহিনী (অপর্ণা-রাজীবের সন্তান)

তার বাবা-মা'র কাছে যা পেয়েছে, তারা কি তা দিতে পেরেছে পূষণকে? দিয়েছে? সব দায়িত্ব স্কুলই নেবে নাকি![২০]

অর্থাৎ, সুপর্ণা-শিলাজিতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা গাঢ় হওয়ার পর পূষণ কোথায় থাকবে, কার কাছে থাকবে, তার ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, সমাজ পূষণকে কীভাবে গ্রহণ করবে, সেই বিষয়টি নিয়ে সুপর্ণা চিন্তিত ছিল। অপরদিকে, শিলাজিতকে ভাবিয়ে তুলেছিল তার আত্মসচেতনতা। তার নায়কোচিত, স্মার্ট, কর্পোরেট উপস্থাপনা। যথাযথ পারিবারিক জীবনের সর্বময়কর্তার চিত্রকল্পে ফাটল ধরেছে, সেই ফাটল তার সন্তানের চোখে, সমাজের চোখে, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধবের চোখে উন্মোচিত হয়ে পড়বে, এই আতঙ্ক তার চেতনাকে গ্রাস করেছিল। তাই সুপর্ণা যখন শিলাজিতের বন্ধু সোমদেবের গাড়িতে লিফ্‌ট নেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে শিলাজিৎ তাতে ভীষণ বিব্রতবোধ করে। তার চিন্তা হয় তাদের দাম্পত্যের অসঙ্গতির খবর বুঝি তাদের বন্ধুদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে—

শালা, নাটক! ফোনটা ছেড়ে দিয়ে বিরক্ত হয়ে ভাবল শিলাজিৎ, যখন যেখানে খুশি সর্বত্রই যেন নাটক চলছে! তা না হলে কালই কেন আর্লি বাড়ি ফিরবে সোমদেব, কালই কেন জামাকাপড় নিয়ে আসবার কথা মনে হবে সুপর্ণার! এবং দেখা হয়ে যাবে দুজনের! একেবারে মধুযামিনী রে! অ্যাক্সিডেন্টাল? হতে পারে। বাট হোয়াই ডিড শি মেক ফেস! আনমাইন্ডফুল, না কি তাকে বিব্রত করার জন্যে আর কোনও প্যাঁচ কষছিল সুপর্ণা!...কী এমন হতো সোমদেবের গাড়িতে লিফ্‌ট নিলে! এতদিনের বন্ধু, বাড়িতেও চেনে সকলে। সোমদেব নিশ্চয়ই অভিমন্যু নয় যে কেউ দেখে ফেললে আবার একটা কেলেঙ্কারি হতো! নাটক করতে গিয়ে খামোখা একটা সন্দেহ ঢুকিয়ে দিল সোমদেবের মনে, হয়তো রীতাকেও বলেছে। তবু ভাল, স্যুটকেস নিয়ে ফিরে আসতে দেখেনি সুপর্ণাকে, তাহলে এনকোর পড়ে যেত চারদিকে।[২১]

শিলাজিতের এই আত্মপরায়ণতার কারণও নিঃসন্দেহে তার মা-বাবার শিক্ষা, আদর্শ, সর্বোপরি সামাজিক প্রভাব। শিলাজিতের মা তৃপ্তি দেবী ছেলের শত অন্যায় সত্ত্বেও

তার সপক্ষেই কথা বলেছেন। শিলাজিতের বোন দেবযানী সুপর্ণার সঙ্গে তার সহকর্মী অভিমন্যুকে দেখে শিলাজিতকে সে খবর দেয় এবং তার মনে অনর্থক সন্দেহের বীজ বপন করে। তৃপ্তি দেবী আশ্চর্যজনকভাবে ছেলের স্বৈরাচার, মাতলামো ইত্যাদি নিয়ে কোনও প্রশ্ন না তুলে সুপর্ণার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াকে ঘিরে ব্যঙ্গোক্তি করেন—

> ...ড্যাং-ড্যাং করে বেরিয়ে তো গেলেন। এখন বুঝবে কত ধানে কত চাল!’[২২]

সুপর্ণা একা মাঝরাত্তিরে বেরিয়ে গেছে, তা নিয়ে তিনি যত না চিন্তিত ছিলেন তার চেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন সুপর্ণার জন্য থানা পুলিশ না করতে হয়, তাদের পরিবারের বদনাম না ছড়িয়ে পড়ে এই বিষয়টি নিয়ে। তৃপ্তি দেবীর যথার্থ সন্তান শিলাজিৎ স্বার্থপরের মতো নিজের অবস্থানকে সুরক্ষিত করার জন্য, নিজের বহিরাঙ্গিক জীবনকে সমাজের কাছে স্বচ্ছ রাখার কথাই আগে ভেবেছে। নিজের ভাবমূর্তি পরিশুদ্ধ রাখবার জন্য সে কখনও অভিমন্যুর নাম করে সুপর্ণার দিদির বাড়িতে ফোন করে সুপর্ণাকে বেকায়দায় ফেলেছে যাতে সুপর্ণার বাড়ির লোকজন মনে করে শিলাজিৎ সুপর্ণার গায়ে হাত তুললেও সুপর্ণার দোষ নেহাত কম নয়, কখনো নিজেকে নিজে ভুল বুঝিয়ে আত্মরক্ষার দুর্গ তৈরি করেছে। বহুদিনের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করার পর সুপর্ণা যেদিন পালটা হাত চালিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, সেদিনই শিলাজিৎ বুঝেছিল স্বামী, ছেলে, সামাজিক সংস্কার ইত্যাদি নিয়ে ভয় তার কেটে যাচ্ছে। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পর থেকেই আত্মসম্মানের বিকাশ ঘটেছে সুপর্ণার অন্তঃকরণে। মানবিকতা, সুস্থ মানসিকতার জায়গা থেকে সুপর্ণার কাছে এই পরাজয় শিলাজিৎ মেনে নিতে পারেনি। তাই একটা ভ্রান্ত, মনগড়া কল্পনার দেওয়াল তুলে নিজের অহংবোধকে পরিপুষ্ট করেছে সে—

> যা হচ্ছে হোক, যা করছে করুক, যেভাবে এগোতে চায় এগোক; শিলাজিৎ ভাবল, দায় তার একার হবে কেন! তবে, সুপর্ণা যদি মনে করে থাকে নিজের তৈরি অহঙ্কারের জায়গায় দাঁড়িয়ে

> সে শুধুই ভুরু কুঁচকে যাবে—এটাকে প্রেস্টিজ ইস্যু করে তুলবে, মস্ত ভুল করবে তাহলে।...আই ট্যু হ্যাভ ইগো! চলুক না, দরকারে ডিভোর্স হবে।[২৩]

শিলাজিতের আত্মপরায়ণ মানসিকতায় মসৃণ প্রলেপ দিয়েছে তার জীবনযাপন। তার অফিশিয়াল কাজকর্মের বিস্তৃত বিবরণ উপন্যাসে নেই, তবু বোঝা যায় সে কোনও এক মাল্টি-ন্যাশানাল কোম্পানিতে বেশ উচ্চপদে চাকরি করে। কাজ শেষে সে অবসর-যাপন করে ক্লাবে গিয়ে, পার্টি করে, মদ খেয়ে, তাসের আসরে বসে যেখানে উচ্চকিত মেকিপনাটাই প্রাধান্য পায়। সেখানে নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশার, উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগ রয়েছে অথচ সেই উচ্ছৃঙ্খলতার দায়ভার গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা নেই। কারণ বাহ্যিকভাবে তথাকথিক আধুনিকতার জোয়ারে গা ভাসালেও তারা মনে মনে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ বহন করে। তাই আপাতভাবে নিজের বৈবাহিক জীবনকে লোকসমাজে 'পিকচার পারফেক্ট' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গোপনে শিলাজিৎ বন্ধুর স্ত্রী রীতার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। দিব্যেন্দু পালিত নবনীতা দেবসেনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মানুষের নীতিবোধের আবশ্যিকতা বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার দিকটি নিয়ে একটি মন্তব্য করেন—

> আমাদের বদ্রীপ্রসাদ নামে একজন অধ্যাপক ছিলেন, তিনি একবার ক্লাসে ঠাট্টা করে বলেছিলেন— every man wants to sleep with the other men's wife –এটা ঠাট্টা করে বললেও কিন্তু অসত্য নয়। কিন্তু কেন ঘটনাগুলো ঘটে না? কারণ মানুষের নীতিবোধ তাকে আটকায়। নীতিবোধ নিয়ে অনেক অস্থিরতা, অনেক চারিত্রিক দুর্যোগ পার হয়ে যায়। সমাজ যতক্ষণ না collectively, যাকে বলে সামগ্রিকভাবে এই নীতিবোধ দ্বারা নিজেদের বাঁধছে ততক্ষণ কিন্তু এইটা চলতে থাকবে।[২৪]

শিলাজিৎ এমনই একজন নীতিজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারী পুরুষ। প্রকাশ্যে নিজের স্বরূপ-উন্মোচন করবার মতো ক্ষমতা বা সাহস কোনোটিই তার নেই। নিজে যথেচ্ছাচার করেও সংসারের বাইরে বেরিয়ে স্ত্রীর চাকরি করাকে, বিজ্ঞাপনে কাজ করাকে, তার আর্থিক স্বাবলম্বিতাকে, সর্বোপরি স্ত্রীর পুরুষ-সহকর্মীকে মুক্তমনে গ্রহণ করতে পারে না শিলাজিৎ। অধিকারবোধ তাকে বারবার বুদ্ধিভ্রষ্ট করে। আজ পার্টি, কাল ক্লাবের হই-হুল্লোড়ের মাঝে নিজের বিবেকবোধকে দূরে ঠেলে রাখে, একাকিত্ব কাটানোর জন্য মৌতাত খোঁজে রীতার কাছে।

সুপর্ণা হয়তো এসবকিছুকে পিছনে ফেলে নতুন করে স্বাবলম্বী জীবন শুরু করতে পারত কিন্তু পারল না কারণ, একটি মানুষও, এমনকি তার নিজের দিদি পর্যন্ত তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল না। উপরন্তু তাকে দোষারোপ করল, তার সবচেয়ে দুর্বলতম স্থান পূষণের ভবিষ্যৎকে ঘিরে তার মনে আতঙ্কের চোরাস্রোতের পথ উন্মুক্ত করে দিল—

> ...'তুই বাঁচবি, কিন্তু পূষণ বাঁচবে না। ও ডিভোর্সের সুযোগ নেবে—পূষণকে বঞ্চিত করবে।'[২৫]

দীর্ঘকালব্যাপী চলে আসা বিচ্ছিন্নতার পরবর্তী একাকিত্বের ভার ক্রমশ ক্লান্ত করছিল সুপর্ণাকে। কারণ অফিস শেষ হলে তার না আছে ক্লাব, না আছে পার্টি, না আছে সে অর্থে কোনও বন্ধু। লক্ষ করবার মতো বিষয় দীর্ঘদিনের দাম্পত্য জীবনে সুপর্ণা এতটাই শিলাজিৎ-অনুগামী ছিল যে একাকিত্বের অবসর-যাপনের ফাঁকে সে মনে করেছে—

> আঠারো বছর বিয়ের পর নিজের বন্ধুটন্ধু থাকে না, স্বামীর বন্ধুরা কিংবা তাদের স্ত্রীরাই বন্ধু হয়ে যায়। হাতে গোনা যায় তাদের।[২৬]

একাকিত্বের বিপুল ভারের ওপর প্রিয়জনের সাহচর্যের অভাব, পূষণকে নিয়ে দুশ্চিন্তার জোয়ারে সুপর্ণার সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত ক্রমশ কমনীয় হয়ে এসেছে। প্রবল অন্ধকারের মাঝেও

সে হাতড়ে হাতড়ে আশার আলো খোঁজার চেষ্টা করেছে। হোস্টেল থেকে পূষণ বাড়ি ফিরে আসার পর সুপর্ণা শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গেছে, অপমানিত হয়েছে, তবু ভেবেছে—

> ...এমনও তো হতে পারে যে পূষণই বদলে দেবে শিলাজিতকে, নিজের ভ্রম-বিভ্রম থেকে বেরিয়ে এসে সেও আবার শুরু করবে নতুন করে! এমন কি হয় না? হয়তো সময় লাগবে। হয়তো চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি শিলাজিতের মনের মতো হয়ে উঠবে সে। তখন অভিমন্যু থাকবে না, সুতরাং সন্দেহও থাকবে না। অনেক দিন আগে রাজীবদা আর সোহিনী যেমন বলেছিল, সেকেন্ড হানিমুনে যাবে তারা![২৭]

সুপর্ণা হয়তো জানে তাদের আর সেকেন্ড হানিমুনে যাওয়া হয়ে উঠবে না, হয়তো জানে অভিমন্যু জীবনে থাকা বা না থাকাটা তাদের জীবনের মুখ্য সমস্যা নয় অথবা তার চাকরি ছেড়ে দেওয়াটা শিলাজিতের ক্ষণস্থায়ী আনন্দের কারণ হতে পারে কিন্তু চিরন্তন কখনই নয়, তা সত্ত্বেও সে বারবার আশায় বুক বাঁধতে চেয়েছে। কারণ সমাজ, পরিস্থিতি, সম্পর্ক তাকে চোখে আঙুল দিয়ে বারবার দেখিয়ে দিয়েছে সে কতটা অসহায়, কতখানি সমাজ-বিচ্ছিন্ন। তাই শিলাজিতের নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ দেখে, অবৈধ প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কথা শুনে সে দ্বিতীয় বার শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে কিন্তু আবার ফিরে যায় সেখানে। নিজেকে ভুল বোঝায়, হয়তো শিলাজিতের তার ওপর সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক, হয়তো সে সন্দেহের সবটাই ফেলনা নয়। পূষণকে হারানোর ভয় থেকে, সমাজ-পরিত্যক্ত হয়ে একাকিত্বের ভার বহন করার কষ্টকল্পনা থেকে ভ্রান্তির জাল বুনে সমাজের সঙ্গে আপোস করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় সে। সম্পর্কে থেকেও সে যে কতটা একা, কোণঠাসা সেই সত্যকে মেনে নেওয়ার মতো দৃঢ়তা তার বুর্জোয়া-সামন্ততান্ত্রিক দুর্বল মানসিক কাঠামোর ছিল না।

অসীম ব্যানার্জী এবং জিনার একঘেয়ে, নিরুত্তাপ, নীরস, শুষ্ক আট-ন বছরের দাম্পত্য জীবনের ছবি ধরা পড়ে *অবৈধ* (১৯৮৯) উপন্যাসে। জিনা অসীমের সমাজকর্তৃক মান্যতা পাওয়া ‘বৈধ’ স্ত্রী। বৈধ নিয়মেই অসীম জিনার ভাত, কাপড়, বাসস্থান এবং অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্যের ভার কাঁধে তুলে নিয়েছে। অর্থ দিয়ে ক্রয় করা যায় এরকম কোনোকিছুর অভাব জিনার নেই। কিন্তু জিনা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সে লেডি ব্রেবোর্নে পড়া ‘স্মার্ট’ মেয়ে। বিয়ের শুরুতে স্বামীর মর্জির ওপর পুরোটা ছেড়ে দিলেও যত দিন গেছে দাম্পত্যের একঘেয়েমি তাকে দ্বিধান্বিত করে তুলেছে। তাদেরই মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং-এর বাসিন্দা পার্থকে দেখার পর থেকে তার ছাই-চাপা পড়া ধিকিধিকি আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। সে জীবনের যাবতীয় রস, মন–প্রাণ ভরে ভোগ করায় বিশ্বাসী। অসীমকে বিয়ে করার পর থেকে তার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে অসীম অফিস যাওয়ার আগে তার জন্য রান্নার জোগাড় করা, অসীম যতক্ষণ না অফিস থেকে ফিরছে ততক্ষণ বাড়িতে বসে একাকিত্ব কাটানোর জন্য টিভি দেখা বা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রাস্তাঘাটের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা, অসীম বাড়ি ফেরার পর ক্লাব বা পার্টিতে যেতে ব্যস্ত না থাকলে তার জন্য দু–চার পদ বেশি রান্না করা, কারণ সে খেতে ভালোবাসে। মাঝেমাঝে ট্যুরে গেলে তার স্যুটকেস গোছগাছ করে দেওয়া। কখনো-কখনো অভ্যেসবশত পূজাআর্চাও সে করে কিন্তু ‘ভগবান-টগবানে’ তার বিশ্বাস নেই।

জিনা ব্যানার্জী আত্মবিশ্বাসী, নিজের রূপ সম্পর্কে, নিজের অবস্থান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তার একটা নিজস্ব স্বর আছে, ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য রয়েছে। কিন্তু সে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী নয়। তাই কোথাও যেন দাম্পত্যের প্রতি চূড়ান্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে পার্থর সঙ্গে

একটা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েও স্বামীর সবরকম চিহ্ন, সামাজিক বৈধতার টান সে ছিন্ন করে দিতে পারেনি। পিতৃতান্ত্রিকতার বেড়াজালও সে শেষপর্যন্ত ছিন্ন করে উঠতে পারেনি। অসীমের থেকে নিষ্কৃতি পেতে গিয়ে জিনা পার্থর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অসীম ব্যানার্জীর 'প্রপার্টি' থেকে পার্থ মজুমদারের 'প্রপার্টি' হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে তাদের সম্পর্কের ভিত তৈরি হয়েছিল দাম্পত্যের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য 'থ্রিল'-এর খোঁজ করতে গিয়ে। সেই থ্রিলটি গড়ে উঠেছিল পুরোটাই শরীরকে কেন্দ্র করে—

> লুকিয়ে কাউকে ভালোবাসার এই যে থ্রিল, এটা সে কোনওদিন অনুভব করতে পারত না। একুশ বছরে বি-এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার চেয়ে এগারো বছরের বড়ো অসীমের সঙ্গে বাড়ির দেওয়া বিয়ে এই থ্রিলটা পেতে দেয়নি তাকে। তা ঠিকঠাক বুঝে ওঠার আগেই সে অসীমের প্রপার্টি হয়ে গেল![২৮]

এখানে মূল সমস্যা দুটি, জিনা নিজে ভালোবেসে বিয়ে করেনি, তার ওপর পরিবারের মতামত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সমস্যা, বয়সের ব্যবধান। যদি মনের মিল থাকত বা প্রেম করে বিয়ে করত তাহলে হয়তো এই ব্যবধানটি নিতান্তই লঘু মনে হত। কিন্তু মনের মিল না হওয়ায় ব্যবধানটি দুস্তর হয়ে গেছে। জিনার মতো স্বাধীনচেতা, আত্মসচেতন মানুষের মনে হয়েছে, বিয়ের পর থেকে তার নিজস্ব অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে, সে তার স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিকভাবে তার কখনও মনে হয়নি অসীম তাকে, তার ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে আমল দিচ্ছে না। অসীম তার সঙ্গে সঙ্গম করত, তাকে আদর-যত্নও করত, তবে সেটা অসীমের নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী, চার দেওয়ালের মধ্যে গড়ে ওঠা দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ থেকে। যেমন, একদিন অসীম জিনার একাকিত্ব কাটানোর জন্য বাড়িতে ভি. সি. আর. (ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার) কিনে আনে যাতে অসীম ট্যুরে গেলে তার সময় কাটাতে অসুবিধে না হয়। কিন্তু জিনা জানে সে যে ধারাবাহিক নিঃসঙ্গতা

কাটাতে অসীমের অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝেই তার দাদার বাড়ি কিংবা মার কাছে যায়, তা অসীমের পছন্দ নয়। অসীম পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিনিধি। টাকার অঙ্ক দিয়ে জীবনকে বুঝতে চায়। মানুষের যে মানসিক খোরাকেরও প্রয়োজন পড়ে, তা তার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়—

> বুঝতে চায় না মনের ব্যাপারটা। একদিন বলেও ছিল এরকম: 'কিসের অভাব তোমার! ইউ হ্যাভ এভরিথিং!' সত্যি, সত্যিই তো!
>
> কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন এমন হল যে বিয়ের পর ছ সাত বছর কাটতে না কাটতেই জিনার মনে হতে লাগল তার সঙ্গে অসীমের বয়সের ব্যবধানটা ঠিক এগারো বছরের নয়, আরও বেশি। যত দিন যাচ্ছে, যত প্রোমোশন হচ্ছে অসীমের এবং বাড়ছে স্বাচ্ছল্য ও ব্যস্ততা, ব্যবধানটা ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে আরও।[২৯]

আসলে এক্ষেত্রে বয়সের ব্যবধানের থেকেও বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে মানসিক ব্যবধান। সেই দুরতিক্রম্য ব্যবধানের জায়গা থেকেই অসীম ব্যানার্জীর আদর যত্নকেও জিনা 'ভোগ' করতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হিসেবে ধরে নিয়েছে। তার দৈনন্দিন বিরক্তি, একাকিত্বের মাঝে পার্থর শারীরিক প্রাবল্য, পরকীয়ার উত্তেজনা জিনাকে সর্বাঙ্গীণভাবে গ্রাস করে। বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' (১৯৬৭) উপন্যাসের মালতীর সঙ্গে জিনার এ-বিষয়ে কিছু মিল চোখে পড়ে। দিনের পর দিন নয়নাংশুর ইচ্ছাধীন জীবন যাপন করতে করতে একসময় যেমন মালতী প্রবল জেদ এবং অভিমান নিয়ে পরকীয়ার প্রবল আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল, খানিক স্বেচ্ছাচারী হয়ে মুক্তির আস্বাদ পেতে চেয়েছিল, এক্ষেত্রে জিনাও কিছুটা সেই ধারায় বহমান। মালতীর মতোই জিনারও পার্থর স্বাদ পাওয়ার পর মনে হয়—

...পুরুষসঙ্গ বলতে কী বোঝায় তা ও অনুভব করছে এই প্রথম, সর্বাঙ্গ দিয়ে, এই প্রথম পাচ্ছে ভালবাসার স্বাদ।[৩০]

সমাজে চর্চিত প্রাচীন শাস্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীকে নিজের দেহের বা নিজের সম্পত্তির ওপরে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। স্বামীর সম্পত্তিও স্ত্রীরা নিজের ইচ্ছে মতো ভোগ করতে পারে না, তবে জিনার এ বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার রয়েছে। নিউক্লিয়ার পরিবারের সদস্য হিসেবে সে তার স্বামীর সম্পত্তি ইচ্ছেমতো ভোগ করে। বিবাহিত জীবনে তার কোনও আর্থিক বন্দীত্ব নেই। তবে তার নিজের দেহের ওপর তার কোনও অধিকার আছে কিনা, সেইটিই দেখবার বিষয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদেহের ওপর পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টা রয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় একা পুরুষ নয়, নারীও সমানভাবে সামিল হয়েছে। জিনা তার উৎকৃষ্টতম উদাহরণ হতে পারে। সে যতই শিক্ষিত, স্বাধীনচেতা, তথাকথিত আধুনিকমনস্ক হোক না কেন, সে আসলে পিতৃতান্ত্রিকতারই বাহক। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় যেমন বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে নারীদেহকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়, তেমনই জিনা নিজের দেহের ওপর তার স্বামীর একচেটিয়া অধিকারকে অস্বীকার করতে চাইলেও শেষপর্যন্ত সে তার নিজের দেহের ওপর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। স্বামী অসীমের হাত থেকে তার শরীরের ওপর অধিকার কেড়ে নিয়ে পার্থর হাতে সেই অধিকার সঁপে দিয়েছে। একটি বিবাহ-মুক্ত হয়ে সে ঢুকে পড়তে চেয়েছে আরেকটি বিবাহবন্ধনে। সে যে নিরাপত্তা চেয়েছে, তা কখনই তার নিজের অর্জিত সম্পদ নয়, তার আকাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা সবসময়ই ছিল কোনও না কোনও পুরুষ-প্রদত্ত। এমনিতে পিতৃতন্ত্রের চোখে যৌনতায় পারদর্শী বা যৌন কামনায় অত্যুৎসাহী নারী মানেই 'ভ্যাম্প গার্ল' আর যৌন বিষয়ে অপারদর্শী, লাজুক প্রকৃতির, মাতৃত্বের আগমনের জন্য যৌনতায় লিপ্ত হয়, এমন নারী মানেই সে পুণ্যকায়া,

সংসারী, ভদ্র মেয়ে। যদিও বা যৌন বিষয়ে মহিলারা আগ্রহ দেখান, তবু তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষসঙ্গীকে তৃপ্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। মেয়েরা জন্মে থেকেই নিজের কামনা-বাসনাকে 'স্যাক্রিফাইস' করার শিক্ষা পায়। সুফলটুকু, ভালো অংশটুকু বাবা, দাদা-ভাই, স্বামী, সন্তানের জন্য ছেড়ে দেওয়ার শিক্ষা নিয়ে বড়ো হয়। জিনা কিন্তু সেই জায়গা থেকে এগিয়ে। সে নিজের চাহিদা সম্পর্কে সচেতন। নিজের চাহিদার পুরো মূল্য চুকিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তার শান্তি হয় না। এক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়-নীতিকে সে অনায়াসে অস্বীকার করতে পারে। জিনা নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন, নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন কিন্তু সেই সচেতনতা যতটা না তার নিজের শরীর সম্পর্কে তার চেয়ে ঢের বেশি তার শরীর অন্য মানুষের কাছে কতটা আকর্ষণীয়ভাবে ধরা দিচ্ছে সেই সম্পর্কে। সে পার্থর চোখে নিজেকে রমণীয়ভাবে পেশ করতে চায়। কিন্তু তার মনে আরেকটি বিদ্রোহী দিকও রয়েছে। তাই একাধারে সে পার্থর কথাবার্তা শুনে, পার্থর শারীরিক চাহিদাযুক্ত কথা-বার্তায় রোমাঞ্চিত হয়, আবার পার্থর যৌনস্বার্থকে ঘিরে তার মনে বিভিন্ন প্রশ্নও হানা দেয়—

> নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলোকে যতটা গুরুত্ব দিয়েছে পার্থ, যেভাবে, ঠিক সেইভাবে জিনার প্রয়োজনের ব্যাপারগুলো ভাবল না কেন! এই ট্রেন জার্নিতে সঙ্গে জল নেবার কথাটা সাজেস্ট করতে পারত পার্থ, বললে নিশ্চয়ই ভুলত না সে। পার্থ কি সেলফিশ, ওর স্বার্থপর চিন্তার আড়ালে সে হারিয়ে যাচ্ছে না তো!...দুজনের ধরন আলাদা হলেও জোর খাটানোর ব্যাপারে অসীমের সঙ্গে পার্থর কোনও তফাত খুঁজে পাচ্ছে না সে।[৩১]

পার্থ জিনাকে মনে করে ট্রেনের টিকিট আর টু-পিস সুইমিং কস্টিউম নিতে বলেছে অথচ জল নিতে বলেনি। জিনাকে নিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে আনন্দ উদ্‌যাপন করতে যাওয়ার টিকিট কেটেছে অথচ ফেরার টিকিট কাটেনি। পার্থর এই ধরনের আচরণের

ফলে জিনার মনে দ্বন্দ্ব থাকলেও পাঠকের মনে সন্দেহ থাকে না, পার্থ নিজের রিরংসা চরিতার্থ করার জন্য জিনাকে বেছে নিয়েছে। জিনাকে শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ ভোগ করবার পর পার্থ তাকে একরকমভাবে ছেড়ে দিয়েছে এবং তার ফলে জিনা কেবল শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও আশাহত হচ্ছে। কারণ সে পার্থর ওপর মানসিকভাবেও নির্ভর করেছিল, তার সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিল। এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য দিব্যেন্দু পালিত একটি বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়ের দলের ইমেজ ব্যবহার করেছেন। এই দলটির সঙ্গে ট্যুরে আসার সময় প্ল্যাটফর্মে জিনার সাক্ষাৎ হয়, আবার ট্যুর শেষ করে সে যখন মানসিকভাবে সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু হয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় বাধ্য হয়ে নিজের স্বামীর কাছে ফিরে যাচ্ছে, তখনও ওই প্ল্যাটফর্মেই বিকলাঙ্গের এই দলটির সঙ্গে দেখা হচ্ছে তার। এই বিষয়ে ঔপন্যাসিক স্বয়ং জানিয়েছেন—

> এটা আমার একধরনের পলিটিক্স মনে হয়। মানে পুরুষদের একধরনের Politics; এই যে 'অবৈধ' উপন্যাসের কথা বলছিলাম। মেয়েটিকে ব্যবহার করতে করতে ফেলে দিল, এটা কিন্তু— মেয়েটা কিন্তু ভালোবাসা, আকর্ষণ, এইসব দিকে যাচ্ছিল। পুরুষটি কিন্তু যাচ্ছে সম্পূর্ণ অন্যদিকে। এবং এখানে একটা ইমেজ আছে, যে কতগুলো disabled ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা দল গিয়েছিল—তারা যখন পৌঁছল তখন দেখল ট্রেন থেকে নামছে মেয়েটি। সে যখন ফিরছে, চলে যাবে আরকি—She was left out, তখন পথে ওদের সঙ্গে দেখা হলো। এটা প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু একধরনের ইমেজের একটা ব্যাপার আছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে মেয়েদের নিয়ে একটা Politics কিন্তু করা হয়—সেটা যৌনতার মধ্য দিয়ে।[৩২]

জিনা নিঃসন্দেহে এই যৌনতার রাজনীতির শিকার। জিনার মান-সম্মান, শারীরিক সুস্থতা-অসুস্থতা নিয়ে পার্থ মোটেই ভাবিত নয়। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই জিনা পার্থর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে খুশি নয়। তবে জিনার আদৌ পার্থর প্রতি প্রেম রয়েছে কি না, বা সে প্রেমের গভীরতা আদতে কতটুকু, সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। পার্থর তরফ থেকে

যথার্থ সম্মান পেলে হয়তো জিনা পার্থর প্রেমে পড়তে পারত কিন্তু পার্থর তরফে নিছক শরীরী উদ্‌যাপনের বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার পর জিনাও আর শরীরকে অতিক্রম করে প্রেমের স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। সে আসলে ভয়ংকর উদ্‌বিগ্ন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, দ্বিধান্বিত মন নিয়ে এক অবলম্বন ছেড়ে নতুন আরেকটি অবলম্বনের দিকে যাত্রা করতে চেয়েছিল। তাছাড়া জিনা তার নিজের চাওয়া-পাওয়া নিয়েও সুনিশ্চিত নয়। দৈনন্দিন একঘেয়েমির ক্লান্তি ঘোচাতে সে যে পথ বেছে নিয়েছে, তাতে রোমাঞ্চ আছে, উদ্দামতা আছে কিন্তু শান্তি নেই, কোথাও থিতু হওয়ার উপায় নেই। ঘুমোনোর জন্য তাকে নিয়মিত ঘুমের বড়ি খেতে হয়। অজস্র বিপরীতমুখী চিন্তার স্রোত তাকে ক্লান্ত করে, অথচ সে শান্তিতে ঘুমোতে পারে না। কারণ তার দ্বিখণ্ডিত মন। একদিকে সে চায় অসীম ব্যানার্জীর দেওয়া নিরাপত্তা, অন্যদিকে চায় পার্থ মজুমদার-প্রদত্ত উদ্দামতা। একদিকে সে চায় পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে, অন্যদিকে একজন পুরুষের যৌন-ক্রীড়নক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও তার বিস্তর আপত্তি রয়েছে। জিনা রূপোর কাঠি দিয়ে সূক্ষ্মভাবে সিঁথিতে সিঁদুর ছোঁয়ায়, যাতে শর্তও থাকে আবার সে যে বিবাহিত তা চট করে বোঝাও না যায়। আসলে সে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না, কারণ সে নিজের শর্তেও জীবন কাটাতে চায়, আবার সামাজিক নিরাপত্তাটুকুও ভোগ করতে চায়। তাই জিনা যে মুহূর্তে বুঝতে পেরেছে পার্থ মজুমদার তাকে নিছকই শারীরিকভাবে ভোগ করার জন্য বেড়াতে নিয়ে এসেছে, নিজের স্ত্রী বা সন্তানকে পরিত্যাগ করে জিনাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার কোনও পরিকল্পনাই তার নেই, সেই মুহূর্তে জিনা অসীমের কাছে ফিরে যাওয়ার সংকল্প নিয়েছে। এর কারণ সম্ভবত দুটি, জিনা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী নয়। সে অসীমের ওপর নির্ভরশীল, এমনকি ট্যুরে এসেও সমস্ত দিক থেকে সে পার্থর ওপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, সে নিজে পিতৃতান্ত্রিকতা-মুক্ত হতে পারেনি। তার মনের গোড়াটাই পিতৃতান্ত্রিক ছাঁচে গড়া। লেডি

ব্রেবোর্নের শিক্ষা বা ইংরেজি ছবি দেখার অভ্যেস তাকে ওপর থেকে তথাকথিত আধুনিকতার মোড়ক দিয়েছে, কিন্তু গোড়া থেকে সংস্কারমুক্ত করতে পারেনি। তার মনে যুক্তিগত আত্মজিজ্ঞাসা হানা দেয়, কিন্তু কোনও চিন্তাই কার্যক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় না। তাই সে নিজে যা করছে, সেই একই ঘটনা অসীমও ঘটাচ্ছে, এমন কথা ভাবলে সে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে—

> যদি এমন হত যে সে পার্থকে চিনত না, কিন্তু পার্থ এখন যা করছে সেরকম অসীমও কিছু করত কোনও মেয়ের সঙ্গে, তাহলে তার কী হত![৩৩]

জিনার চেতনা বিশ্বাস করে এ জীবন তার নিজের, এ শরীর তার নিজের, তাই সে তার দেহ নিয়ে যা খুশি করতে পারে, যাকে খুশি দেহ দান করতে পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে সবসময় অন্য পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। সে পুরুষ নির্বাচন করে না, পুরুষেরা তাকে নির্বাচন করবে এমনভাবেই সে নিজেকে পেশ করে। অসীমকে ছেড়ে পার্থর সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার হঠকারী সিদ্ধান্ত জিনার নিজের কাছেই অবৈধ। কারণ অসীম ব্যানার্জীকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করবার মতো সাহস তার নেই। আবার পার্থ মজুমদার যদি তাকে বিয়ে না করে, সেক্ষেত্রে সে যে স্বাধীনভাবে স্বনির্ভর হয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে সেই পরিকল্পনাও তার নেই। জিনার মধ্যে সর্বক্ষণ বন্ধন-মুক্তির এক অদ্ভুত টানাপোড়েন চলে। পার্থর সঙ্গে সঙ্গম-লিপ্ত অবস্থায় কখনও সে ভাবে এই প্রথম সে পরিপূর্ণতার স্বাদ পেল, এইবার প্রথম সে অন্তঃসত্ত্বা হবে। পরক্ষণেই তার মাথায় ঘোরাফেরা করে সেই অমোঘ আতঙ্ক—

> একই সময়ে, অনধিকার প্রবেশের মতো, প্রশ্নটা ফিরে এল মাথায়, এটা কি ঠিক? একবারের ভুল পরের বারের ইচ্ছায় অবৈধ হয়ে ওঠে না কি? যদি এমন হয় যে এইভাবেই অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল তারা, অবৈধের ভাবনা থেকে বিষটিষ খেয়ে এইভাবেই মরে গেল দুজনে, তাহলে

> অনেকক্ষণ পরে সন্দেহবশত দরজা ভেঙে যারা ঢুকবে, এই অবিন্যস্ত, লজ্জাকর দৃশ্য দেখে নিশ্চিত অস্বস্তিতে পড়বে তারা...কটেজ থেকে তাদের বডি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে পুলিশ ছবি তুলবে হয় তো, ঠিক এই পোজে, সে-ছবি কি চোখে পড়বে অসীম বা গায়ত্রীর? কী ভাববে ওরা![৩৪]

অসীম ব্যানার্জী একজন অসফল স্বামী। সে অফিসে বস, বাড়িতেও তাই। জিনার সঙ্গে তার কোনও হাসিঠাট্টার সম্পর্ক নেই। অসীমকে জিনা মোটেই বুঝতে পারে না, এবং উলটোটাও সত্যি। অসীমের গাম্ভীর্য ভেদ করে জিনা কোনোদিনই আসল মানুষটিকে ছুঁতে পারেনি। অসীম স্বামী হিসেবে সহজতা লাভ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, অপ্রস্তুতে পড়েছে। সে তার নিজের ব্যস্ত জীবন, ক্লাব-পার্টি থেকে কখনই আলাদা করে তার থেকে প্রায় এগারো বছরের ছোটো জিনাকে সময় দেওয়ার কথা ভাবেনি। ফলে বয়সের পাশপাশি মনের ব্যবধান ক্রমশ বেড়েছে। জিনারও নিজস্ব কোনও জীবন না থাকায় অসীমের অপেক্ষায় একাকী জীবন রোমাঞ্চহীন ক্লান্তিকর হয়ে পড়েছে। সেই জায়গা থেকেই পার্থর আচমকা শারীরিক স্পর্শ জিনাকে নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছে, কিন্তু প্রেমের আবেগ যোগাতে পারেনি।

৫

আড়াল (১৯৮৬) উপন্যাস জুড়ে রয়েছে রুচি আর সোমেন ব্যানার্জীর দাম্পত্য-সম্পর্কের টানাপোড়েন। চব্বিশ বছর ধরে রুচি একটাই পরিচয় বহন করেছে, সে সোমেনের স্ত্রী। পরবর্তীকালে পরিচয়পত্রে নতুনত্ব এসেছে শ্রীময়ী এবং কৌশিকের মা হিসেবে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এসে একটি আকস্মিক ঘটনার জেরে তার স্ত্রীসত্তা এবং মাতৃসত্তার মধ্যে ঢুকে পড়ে অন্য আরেকরকম অনুভূতি। সে নতুন করে নিজেকে চিনতে শুরু করে। নিজেকে, নিজের চাহিদাগুলোকে এতদিন ধরে রুচি 'আড়াল' করে এসেছে সমাজের

কাছে, এমনকি নিজের কাছেও। সোমেনের বন্ধু দীপঙ্করের হঠাৎ শারীরিক স্পর্শ রুচির আড়ালকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

গতানুগতিকতার স্বাচ্ছন্দ্য মেখে সবকিছু মেনে নিয়ে নিজেকে আপাত স্বাধীন মনে করে, স্বামী-সন্তানের অধিকারবোধকে যথেচ্ছ প্রশ্রয় দিয়ে রুচি মনে করেছিল এর নামই তো ভালোবাসা। রুচির সঙ্গে সোমেনের চব্বিশ বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক, অথচ টাকাকড়ি বা অন্যান্য সাংসারিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে তারা আর কখনও কোনও কথা একে অপরের সঙ্গে বলে না, এমনকি নিজেদের নিয়েও নয়। রুচির পরিবর্তে অন্য যেকোনো মহিলা, অথবা সোমেনের পরিবর্তে অন্য যেকোনো পুরুষ তাদের দাম্পত্যের অংশীদার হয়ে উঠতে পারত। সেক্ষেত্রেও খুব বেশি কিছু তফাত হতো বলে মনে হয় না। কারণ রুচি এবং সোমেন যে দাম্পত্যকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে কেবলমাত্র নিয়মানুবর্তিতা এবং সামাজিকতার পালন, একত্র-যাপনের, শারীরিক সম্পর্কের অভ্যেস। তার বেশি কিছু নয়। মাঝেমধ্যে পরিবর্তনের আস্বাদ পেতে তারা ছেলে-মেয়ে নিয়ে কখনও নেপাল বা পোখরায় প্যাকেজ ট্যুরে যায়, ক্লাবে-পার্টিতে সস্ত্রীক উপস্থিত হয়ে মেকি আনন্দে মেতে ওঠার ভান করে। রুচি এবং সোমেন দুজনের মনেই একটা আদর্শ পারিবারিক কাঠামোর ছবি রয়েছে। সেই ছবি মিলিয়ে মিলিয়ে তারা দিনলিপি স্থির করে এবং দাম্পত্য স্বাভাবিক গতিতেই এগোচ্ছে, এই বিশ্বাস নিয়ে বাঁচে। সন্তান-সন্ততি নিয়ে ভরভরন্ত সংসারে হঠাৎ উদাসীন হয়ে একাকিত্ব নিয়ে ভাববার মতো সময় ছিল না রুচির। কিন্তু হঠাৎ খাপছাড়াভাবে এক রাত্রির ঘটনা সাংসারিক রুচিকে খামচে ধরে বসিয়ে দেয় রুচির বহু যত্নে আড়াল করে রাখা নিজস্ব সত্তার সামনে—

> রুচি থেমে আছে অন্যত্র—আরও গভীর কোনও অনুভূতির মধ্যে, যা তাকে অনবরত টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিজেরই দিকে। সত্যি সত্যিই, কাল, সেই মুহূর্তে, কেন তার মনে হয়েছিল দীপঙ্করের

স্পর্শে আছে এক ধরনের আরাম, যা ধরে রাখার জন্যে ঘন হয়ে উঠেছিল তার সর্বাঙ্গ! এমন এক অনুভূতি যা সোমেন তাকে দিতে পারেনি কখনও!...শরীরে সঙ্কেত পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল চব্বিশ বছর ধরে অস্পষ্ট কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া অপূর্ণতার বোধ, যা তাকে রুচি হয়ে উঠতে দেয়নি কখনও, কিংবা ক্রমশ ঠেলে দিয়েছে শুধুই সোমেনের স্ত্রী এবং সেই সূত্রেই শ্রীময়ী ও কৌশিকের মা হয়ে থাকার দিকে! নাকি চব্বিশ বছর ধরে পেতে পেতে নিজের আড়ালে ক্রমশ একটা অভাবের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সে—যেখানে যা পাচ্ছে তা স্বীকার করে নিলে টেকা যায় হয় তো, নিজের দিকে ফেরার জো থাকে না কোনও![৩৫]

অন্যদিকে সোমেনের দিকে যদি তাকাই দেখা যাবে সেই একই সমস্যা। *অবৈধ* উপন্যাসে আলোচিত পার্থ বা অসীমের মতো সে কলকাতা শহরের বিরাট কোনও এক মাল্টি-ন্যাশানাল কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার খাপে খাপ বসানো জীবনযাত্রা তার। সারাদিন অফিসের ব্যস্ততা, তারপর সন্ধ্যের দিকে ক্লাবে গিয়ে অগভীর কিছু বন্ধুতার উদ্‌যাপন, কখনো-কখনো একজোট হয়ে সস্ত্রীক এর-ওর বাড়িতে আড্ডা বসানো, মদ্যপ হয়ে পরনিন্দা-পরচর্চায় মেতে ওঠা, সফ্‌ট পর্ন দেখে আমোদ করা, স্বাদ বদলাবার জন্য একটু-আধটু থিয়েটার চর্চা করে তাৎপর্যবিহীন আহ্লাদ নিয়ে জীবন কাটায় সোমেন। *অবৈধ* উপন্যাসের জিনার মতো এই উপন্যাসের রুচিরও কোনও নিজস্ব জীবন নেই, নিজের বন্ধু-বান্ধব নেই। তার স্বামীর বন্ধুরা এবং তাদের স্ত্রীরাই তার বন্ধু। আদৌ এদের বন্ধুত্ব কতটা খাঁটি সে বিষয়েও প্রশ্ন থেকে যায়, কারণ এদের সবকিছুই ওপর ওপর, আমোদ-আহ্লাদ-ফুর্তি নিয়ে স্রোতে গা ভাসানো ধরনের।

মদ আছে, ফুর্তি আছে, বিদেশি ছবির অ্যাডাল্ট সিন দেখা, বিদেশি অনুকরণে চলা-বলা, ক্লাব-পার্টি রয়েছে তবু মানসিকভাবে এইসব শহুরে দম্পতিরা নিতান্তই সামন্ততান্ত্রিক। মহিলা-পুরুষের এই অবাধ মেলামেশা, উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে যদি কোনও

মহিলাকে অন্য কোনও পুরুষ স্পর্শ করে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, যদি স্বামী ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষের প্রতি আকর্ষণ জন্মায় কোনও মহিলার মনে, সেক্ষেত্রে তার স্বামীর সংস্কারধর্মী অন্তঃকরণ বহিরাঙ্গিক আধুনিকতার মোড়ক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে দ্বিধাবোধ করে না। বাহ্যিক চাকচিক্য বজায় রাখতে তারা নিজেদের স্ত্রীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে পার্টিতে পেশ করে, অন্যের চোখ টাটিয়ে পরিতৃপ্ত হয়। অথচ তাদের বন্ধুদের কেউ তাদের স্ত্রীর প্রেমে পড়লে বা শারীরিকভাবে স্পর্শ করার চেষ্টা করলে স্ত্রীকে মারধোর করতে কসুর করে না। অর্থাৎ, পুরো বিষয়টা চোখের ইশারায় ঘটলে অসুবিধে থাকে না। সমস্যাটা ঘনীভূত হয় তখন, যখন শারীরিক সংযোগ ঘটে। কারণ স্ত্রী–শরীর স্বামীর কাছে সম্পত্তি বিশেষ। এই উপন্যাসেও দেখা যায় সোমেনের বন্ধু দীপঙ্কর রুচিকে শারীরিকভাবে স্পর্শ করতে পারে, এমন সন্দেহ মনে জাগবার সঙ্গে সঙ্গে সোমেন রুচির চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনি। এই একটিমাত্র ঘটনার প্রভাবে তাদের চব্বিশটা বছরের দাম্পত্যের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়—

> স্মৃতি আছে, ভূমি নেই—সুতরাং, শিকড়ও নেই। কাল রাতে যেমন গিয়েছিল, তেমনি, পুনরভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নিজেকে ফিরে যেতে দেখল সোমেন; অন্ধকারে। রুচি শুয়ে পড়েছিল। পাশে শুয়ে, স্পর্শ না করেও, ওর শরীরের কাঠিন্য অনুভব করল সোমেন। জেগে না থাকলে এই নৈঃশব্দ্যে নিশ্চয়ই শব্দ শোনা যেত রুচির নিঃশ্বাসের। যেটা পেল তা ওর মাংসের গন্ধ, সন্ধ্যায় ব্যবহৃত পারফিউমের গন্ধ। অন্ধকারই চিনিয়ে দেয় অন্ধকার, আদল, ক্রমশ সম্পূর্ণ অবয়ব। সোমেন কি ভাববার চেষ্টা করেছিল নৈকট্য থাকে শুধুই ক্রমাগত শরীর সংস্পর্শের মধ্যে, কারণ শরীরই টানে; সম্পর্ক একটা ধারণা মাত্র—শর্তাধীন, চুক্তিবদ্ধ, মেনে না নিলেই দাগ পড়ে সেখানে, অপরিচ্ছন্নতায় ঢুকে পড়ে রাগ, বিদ্বেষ, গ্লানি? মিলিতভাবে এগুলোই চিনিয়ে দেয় অসহায়তা।[৩৬]

যে সম্পর্কের সমস্যার সমাধান হয় বিছানায়, যেখানে শরীরই শেষপর্যন্ত 'ক্ষমা' হয়ে ওঠে, সেই সম্পর্কের ভিত আদৌ কতটা পোক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। সেই সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনোদিনই আত্মার মিলন হয়নি, তারা কোনোদিনই 'প্রাণের বঁধু' হয়ে উঠতে পারেনি। তাদের সম্পর্ক দাম্পত্য নামাঙ্কিত শারীরিক সম্পর্কই রয়ে গেছে। একে অপরের শরীর একে অপরের কাছে হয়ে উঠেছে বস্তুসামগ্রী, গাড়ি–বাড়ি–টাকাপয়সার মতো পার্থিব সম্পত্তি। এই মানুষগুলোকে শরীর বা সম্পর্ক নয়, শেষপর্যন্ত অন্ধকারই আশ্রয় দিয়েছে। তাদের চিন্তাভাবনার স্রোত, জগৎ ও জীবন সবই ডুবে গেছে অন্ধকারময়তার মধ্যে।

দীপঙ্করের আকস্মিক স্পর্শের পর থেকে রুচি বুঝতে পারে সে ভেতর থেকে অনেকটা বদলে গেছে। সে এমন একটা জায়গায় অবস্থান করছে যেখান থেকে সম্পর্কের ভিতরের টানগুলি স্পর্শ করা যায়। সম্পর্কের দায়িত্ববোধ বারবার এসে জানান দেয় তাদের কড়া উপস্থিতি কিন্তু সম্পর্কগুলোকে আর অনুভব করা যায় না। সম্পর্কজনিত ন্যায়-নীতির বোধও তার কাছে ক্রমে শিথিল হয়ে আসে। রুচি তার সামাজিক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে নিজেকে নিয়ে, নিজের অস্তিত্ব নিয়ে সচেতন হয়ে ওঠে—

> তুমি কারও স্ত্রী, স্বামী, বন্ধু, বান্ধবী হতে পারো, কিন্তু সবচেয়ে আগে তুমি কি নিজেরই নও! যন্ত্রণা বা অভাবের কথা বললে কেউ কেউ বুঝবে, সহানুভূতিও দেখাবে হয় তো; কিন্তু অনুভব করবে কি কোথায়, কেন এবং অসহায়তার ঠিক কোন স্তরে পৌঁছে বিমুখ হয়ে উঠছে রক্ত![৩৭]

কপালে অন্য পুরুষের চুম্বনের স্পর্শ যে শুধু শরীরে বিদ্যুৎ ছড়ায় না, তা যে অন্তঃকরণ থেকে ধস্ত করে তুলতে পারে, তা সেই প্রথম অনুভব করে রুচি। কাচের গ্লাস ভেঙে চুরমার হওয়ার শব্দ না হলে সেদিন হয়তো রুচিই ভেঙে পড়তে পারত দীপঙ্করের শারীরিক প্রাবল্যের সামনে। তাদের পূর্ণ শারীরিক সংযোগ ঘটেনি, কিন্তু ঘটতে পারত,

সেই কল্পনায় মগ্ন হয়ে রুচি সর্বক্ষণ সম্মোহিত হয়ে থাকে। সে নতুন করে স্নানকক্ষের নিভৃত নির্জনে নিজেকে আবিষ্কার করে, নিজেকে উন্মুক্ত করে মেলে ধরে নিজের শারীরিক সৌন্দর্যকে নিজেই নতুন করে উপভোগ করে। রুচিও জিনার মতো অল্পবয়সে সোমেনের কাছে নিজেকে অর্পণ করেছে। তবে সোমেনকে সে যতটা না পুরুষ হিসেবে চিনেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি চিনেছে স্বামীর প্রতি কর্তব্য এবং অভ্যেসের জায়গা থেকে। অভ্যাস, ন্যায়-নীতি, সামাজিকতার বাইরে বেরিয়ে দীপঙ্করের স্পর্শে সে প্রথম অনুভব করে পৌরুষের প্রাবল্য। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এসে রুচি নিজেকে আরও অনেক বেশি পরিপূর্ণতা নিয়ে অনুভব করে—

> ...অনুভব করে রুচি, এখনই সে অনেক পূর্ণ, অনেক তীব্র, মনের যে-কোনও আবেগই সংস্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে শরীরে, একটু অন্যরকম ভাবলেই বেজে ওঠে রোমাঞ্চে—আলতো স্পর্শ-লাগা একলা সেতারে যেমন হয় কখনও, থেকে-থেকে খাড়া হয়ে ওঠে রোমকূপ।[৩৮]

অন্যদিকে, পঞ্চাশোত্তর সোমেন নিজের শারীরিক অসাড়তা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তবে শরীর নিয়ে দুজনের দুই বিপরীতমুখী ভাবনার কারণ বোধহয় শুধু শরীর এবং বয়স নয়। নতুন মানুষের প্রতি আকর্ষণজনিত কারণে, নিজেকে নতুন করে পাওয়ার উত্তেজনায় রুচির শরীর রোমাঞ্চিত, শারীরিক চাঞ্চল্যে ভরপুর হয়ে ওঠে। দীপঙ্করকে ঘিরে তৈরি হওয়া ঘটনা সোমেনকে মানসিক নিরাপত্তাহীনতার বোধে জর্জরিত করে তোলে। সেই জায়গা থেকেই তার শারীরিক সক্ষমতা, যৌনতার বোধ তার নিজের কাছে প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হয়ে ওঠে। সোমেন ব্যানার্জীর তোলা দুর্গের বাইরেও যে একটা জগৎ আছে, সেটা বুঝতে পেরে রুচি যখন সেই জগৎ আবিষ্কারের নেশায় মানসিকভাবে পুলকিত, কিছুটা বা দিশেহারা, অস্থির, তখন সোমেন রুচির ওপর একচ্ছত্র অধিকার খর্ব

হওয়ার আতঙ্কে অনিশ্চয়তার সাগরে ডুব দেয়। সেইজন্য দাম্পত্যে থেকেও তারা দুজনেই ক্রমশ হয়ে পড়েছে একা, নিঃসঙ্গ।

তথ্যসূত্র:

১। মল্লিকা সেনগুপ্ত, *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৭৩

২। দিব্যেন্দু পালিত, 'ঘরবাড়ি', *দশটি উপন্যাস* ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৭৪

৩। তদেব, পৃ. ৮৮

৪। তদেব, পৃ. ৯৯

৫। Simone De Beauvoir, *The Second Sex*, First Vintage Books Edition, May 2011, P. 502

৬। দিব্যেন্দু পালিত, 'ঘরবাড়ি', *দশটি উপন্যাস* ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৩৮

৭। তদেব, পৃ. ১০৬

৮। তদেব, পৃ. ১০৫

৯। তদেব, পৃ. ১১৫

১০। দিব্যেন্দু পালিত, 'সিনেমায় যেমন হয়', *দশটি উপন্যাস* ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৬২২

১১। তদেব, পৃ. ৬২২

১২। মল্লিকা সেনগুপ্ত, *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৫৩-৫৪

১৩। Simone De Beauvoir, *The Second Sex*, First Vintage Books Edition, May 2011, P. 395

১৪। সুকুমারী ভট্টাচার্য, *বিবাহ প্রসঙ্গে*, ক্যাম্প, ২বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, তৃতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ৪

১৫। দিব্যেন্দু পালিত, *সেকেন্ড হনিমুন*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ২০

১৬। তদেব, পৃ. ১৩

১৭। তদেব, পৃ. ২৫ – ২৬

১৮। তদেব, পৃ. ১৯

১৯। তদেব, পৃ. ৩৫

২০। তদেব, পৃ. ৮২

২১। তদেব, পৃ. ৫৩-৫৪

২২। তদেব, পৃ. ৩৬

২৩। তদেব, পৃ. ৫৪

২৪। অনুলিখন: শ্রাবন্তী বসু, 'দিব্যেন্দু – নবনীতা আলাপচারিতা', *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), জানুয়ারি—মার্চ ২০০৩, গল্‌ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ১৯৭

২৫। দিব্যেন্দু পালিত, *সেকেন্ড হনিমুন,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৯১

২৬। তদেব, পৃ. ৪৫

২৭। তদেব, পৃ. ৭৬

২৮। দিব্যেন্দু পালিত, 'অবৈধ', *দশটি উপন্যাস* ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৫৩৪

২৯। তদেব, পৃ. ৫৩৪

৩০। তদেব, পৃ. ৫৩৫

৩১। তদেব, পৃ. ৫৪১

৩২। অনুলিখন: শ্রাবন্তী বসু, 'দিব্যেন্দু – নবনীতা আলাপচারিতা', *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), জানুয়ারি—মার্চ ২০০৩, গল্‌ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ১৯৬

৩৩। দিব্যেন্দু পালিত, 'অবৈধ', *দশটি উপন্যাস* ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৫৪৫

৩৪। তদেব, পৃ. ৫৬৫

৩৫। দিব্যেন্দু পালিত, ‘আড়াল’, *দশটি উপন্যাস* ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৫১

৩৬। তদেব, পৃ. ১৫৯

৩৭। তদেব, পৃ. ১৭৭

৩৮। তদেব, পৃ. ১৭৮

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

নগর, নারী ও স্বাবলম্বন

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে প্রায়শই দেখা যায় প্রায় একই সামাজিক অবস্থানের অধিকারী কয়েকজন যুবতীকে। এরা প্রত্যেকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একার জীবন বেছে নিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ একাকিত্বের বেড়াজাল মুক্ত করার আশায়, আবায় কেউ স্বেচ্ছায় নিজের তাগিদে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। মোটামুটি পাঁচের দশক থেকে একুশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত এই পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে অবিবাহিত, বিবাহ-বিচ্ছিন্ন, বিধবা বেশ কিছু যুবতীর বিচিত্র জীবনযাত্রার দরদী আখ্যান এই উপন্যাসগুলিতে উঠে এসেছে। তাদের বুঝতে গেলে আগে নারী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে কিছু প্রাথমিক কথাবার্তা বলে নেওয়া প্রয়োজন। একটা সময় পর্যন্ত নিজের সামাজিক অবস্থান নিয়ে ভাবার বা প্রশ্ন তোলার অধিকার নারীর ছিল না। নারীর দাসত্ব শুরু হয়েছে দাস-প্রথারও আগে। নারীকে পুরুষের বশবর্তী হয়ে থাকতে বলা হয়েছে সভ্যতার গোড়া থেকেই। বাইবেলের পূর্ব ভাগে বর্ণিত দশটি বিধান প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের স্বার্থেই কারণ দশম বিধানে নারীদের দাসদাসী এবং গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে সহাবস্থানে রাখা হয়েছে। তবে তারও আগে আদিম সমাজে নারীদের অবস্থান ছিল অন্যরকম। আসলে আদিম সমাজে মানুষের সংখ্যাই ছিল গোষ্ঠীর শক্তির মাপকাঠি। সম্পত্তির মালিকানার উদ্ভব তখনও ঘটেনি এবং ঠিক এই কারণেই সমাজ একরকম মাতৃতান্ত্রিক সাম্যবাদী অবস্থায় ছিল। মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক মর্গান দেখিয়েছেন, গোত্র প্রথায় মাতৃতান্ত্রিকতাই ছিল মূল। এই ধরনের ব্যবস্থায় একটি গোষ্ঠীর মেয়েরা অন্য গোষ্ঠী থেকে পুরুষ বিয়ে করে আনত। সেই পুরুষ যদি কার্যক্ষেত্রে যথাযথ

সক্ষমতা দেখাতে ব্যর্থ হতো, তাহলে সে ছেলেপুলের বাপই হোক, আর যাই হোক তাকে লোটা-কম্বল গুটিয়ে নিজের গোষ্ঠীতে ফিরে যেতে হতো অথবা অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাতাতে হতো। সব গোষ্ঠীতেই মেয়েদের ক্ষমতা বেশি ছিল এবং সন্তান জন্মালে সে মায়ের পরিচয়েই বড়ো হতো। এরপর হাতিয়ার আবিষ্কার হল এবং হাতিয়ার তৈরি করাটাই গোষ্ঠীর শক্তির মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াল। তারপর পশুপালন শুরু হওয়ার পাশাপাশি নিছক জীবনধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বাড়তি জিনিস মানুষ প্রকৃতি থেকে উৎপাদন করা শুরু করল। এই অতিরিক্ত উৎপাদন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিনিময় প্রথার জন্ম দেয় আর সেই সূত্রেই উদ্ভব হয় ব্যক্তি-মালিকানার। সেখানেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় এতদিনকার মাতৃতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা। নারীকে বন্দী করা আর ব্যক্তি-মালিকানার বিকাশ প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে। এই মাতৃতান্ত্রিক সাম্যবাদী কাঠামোর ভাঙন আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক মালিকানার মধ্যে দিয়ে উত্থান হয় পরিবার-প্রথার, শোষক ও শোষিত এই দুটি আলাদা শ্রেণির এবং শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের। এইসব পরিবারগুলির মালিক হল পুরুষ এবং নারী হয়ে গেল দাসী। এতদিনকার সামাজিক অধিকার হারিয়ে গৃহদাসী হিসেবে নারীর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল মালিকের সন্তান-উৎপাদন এবং তার প্রতিপালন।[১] ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনম্’—মনুসংহিতার এই কথাটুকু এই নিয়মেরই ফলাফল। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের মালিকানায় পুরুষেরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আর নারীরা এইসব শ্রমিকদের খাদ্য, বস্ত্র, বিশ্রামের যথাযথ যোগান দেয় এবং তাদের সন্তান-প্রতিপালন করে ভবিষ্যতের শ্রমশক্তিকে লালন করে। অর্থাৎ, বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায়, নারী ‘শ্রমিকের শ্রমিক’ হিসেবে শ্রেণি-বৈষম্যের সবচেয়ে নিচু স্তরে অবস্থান করে। এইরকম সমাজ-ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে যদি শিক্ষার জোরে ঘরের বাইরে বেরিয়ে ছেলেদের পাশাপাশি কাজে-কর্মে সামিল হয়েও পড়ে, স্বাধীন-স্বাবলম্বীর

তকমা গায়ে এঁটেও ফেলে, তবু যাবতীয় পরাধীনতা-মুক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত মানসিকভাবে কতখানি স্ব-অধীন হতে পারে তাই নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। দিব্যেন্দু পালিতের কয়েকটি মর্মস্পর্শী উপন্যাস নির্বাচন করে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১

দিব্যেন্দু পালিতের *প্রণয়চিহ্ন* (১৯৭১) উপন্যাসে দেখা যায়, আঠাশ বছর বয়স পর্যন্ত কোনও না কোনও অবলম্বনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া নমিতা ডিভোর্সের পর লতানো গাছের মতোই অসহায়, একা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী বিয়ের আগে সে ছিল তার বাবার এবং বিয়ের পরে তার স্বামী মহীতোষের। প্রেম, বিয়ে, বাচ্চা, নিপুণ হাতে সাজানো সংসারের কর্ত্রী, স্বাচ্ছন্দ্য এসব সত্ত্বেও মহীতোষের অহেতুক সন্দেহের কারণে তাদের সম্পর্কে চিড় ধরে। তা যদি না হতো হিসেব মতো এগোলে হয়তো সে একদিন বৈধব্যের দিকে যেত, কাঙ্ক্ষিত জীবন-যাত্রাই পেত। দীর্ঘ আঠাশ বছরের অভ্যেস থেকে মুক্ত হয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই সে হয়ে পড়ে খাঁচা থেকে উন্মুক্ত হওয়া পাখির মতো দিশেহারা। অর্থের প্রয়োজন বা নিরাপত্তার অভাব থেকে নয়, নিছক সময় কাটানোর জন্য এবং একঘেয়ে একাকিত্বের বোধকে এড়িয়ে চলার জন্য সে টুরিস্ট-গাইডের চাকরি নেয়, পরবর্তীকালে চাকরির পাশাপাশি মডেলিং করাও শুরু করে কিন্তু শেষপর্যন্ত কাজের মধ্যে দিয়ে কতখানি মুক্তির আস্বাদ পায়, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

নমিতা গোটা উপন্যাস জুড়ে নিজেকে একা, নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত, গতিহীন, নিশ্চল ছাড়া আর কিচ্ছু ভাবতে পারেনি। নমিতা স্বেচ্ছায় ডিভোর্স নেয়নি, সুতরাং স্বামী-পরিত্যক্ত হয়ে নিজের জীবনকে সে সমাজের এক প্রান্তে পড়ে থাকা, কিছুটা বা সমাজ-বিচ্ছিন্ন কবরখানার সামিল করে ফেলে। তার মনে হয়, সে কবরখানার বিভিন্ন স্মৃতিফলকের

মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে। টুরিস্ট-গাইডের চাকরি বা মডেলিং এর খ্যাতি কোনোটাই তাকে শান্তি দিতে পারেনি, তার চেয়ে বরঞ্চ গৃহবধূর রোজকার গতানুগতিকতাই তাকে অনেক বেশি আকর্ষণ করেছে। নমিতার এই সম্বন্ধীয় কিছু ভাবনা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায়—

> স্বামী হারানো মানে পুরুষকে হারানো।[২]
>
> যতই ক্লেশের হোক, সাংসারিক সম্পর্কের মধ্যে থাকার নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে—একা হয়ে—অবচেতনায় অদ্ভুত এক ভয়ের শুরু হল।[৩]
>
> মহীতোষকে বাদ দিলেও ওর সংস্পর্শ ও পরিবেশকে নতুন করে আঁকড়ে ধরলাম আমি।[৪]
>
> স্তব্ধতাকে আমার ভীষণ ভয়, নৈঃশব্দ্যের ভার অ্যালার্জির মতো ছড়িয়ে পড়ে আমার শরীর ও মনে...[৫]
>
> প্রতি মুহূর্তেই বুঝতে পারি অতীতটাকে বিস্মৃত হওয়া মানে নিজেকেই বিস্মৃত হওয়া।[৬]
>
> কাজ নেই, নেই সম্পর্ক। সারাক্ষণ নিঃসঙ্গ।...ইচ্ছে করলে শরীর ছাড়া আর কিছুই খরচ করতে পারব না।[৭]
>
> মহীতোষ, তুমি কি আর একটু কাছে আসবে, মনে মনে বললাম, এই দূরত্ব আমি সহ্য করতে পারছি না।[৮]
>
> মহীতোষের সঙ্গ ছেড়ে কাকার বাড়িতে উঠে আসার পরও অনেকদিন পর্যন্ত নিয়ম করে সিঁথিতে সিঁদুর পরেছি আমি...[৯]

এরকম অসংখ্য ভাবনা ছড়িয়ে রয়েছে গোটা উপন্যাস জুড়ে, যা প্রতি মুহূর্তে প্রমাণ করে স্বামীর আশ্রয় ছেড়ে নমিতা কতখানি অসহায়, নিরাপত্তাহীন। তবে এই নিরাপত্তাহীনতার বোধ কিন্তু মোটেই অর্থকেন্দ্রিক নয়। মা-মরা মেয়ে নমিতা বাবার কাছে একেবারে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় বড়ো হয়েছে, পড়াশুনোও শিখেছে। ফলে একদিকে সে

যেমন জেদি, চটপটে, আবেগী, প্রতিবাদী তেমনি অন্যদিকে, পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধেও বিশ্বাসী। মহীতোষের ভিত্তিহীন সন্দেহ, মারধোর, কটূক্তিকে যেমন সে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়নি, জেদ দেখিয়েছে, ক্ষোভ-আক্রোশ প্রকাশ করে ফেলেছে, তেমনি মহীতোষকে ছেড়ে চলে আসার পর প্রতি মুহূর্তে অনুশোচনা করেছে নিজের কৃতকর্মের জন্য। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষকে শেখায়, পুরুষেরা হবে উত্তেজিত, বহির্মুখী, আক্রমণাত্মক, তবেই না তার পৌরুষ প্রকাশ পাবে। অন্যদিকে, মেয়েরা হবে শান্ত, মাটির মতো সহনশীল, অন্তর্মুখী। নমিতার শাশুড়িও তাকে সেই শিক্ষাই দিয়েছে—

> আগুন দিয়ে কি আগুন নেভানো যায়, বউমা!...পুরুষের রাগের সামনে জল হয়ে থাকাই ভালো। দেশলাই কাঠি, জ্বলে উঠেই নিভে যায় আবার। কক্ষনো ঘাঁটাতে যেয়ো না।[১০]

নমিতা যারপরনাই চেষ্টা করেছে আগুনের সামনে জল হয়ে থাকার কিন্তু শেষপর্যন্ত তার ভিতরকার শিক্ষার আগুনের টানাপোড়েনে সে কিছুতেই স্বামীর আনুগত্য পুরোপুরি স্বীকার করতে পারেনি। আবার পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকারও করতে পারেনি। সেই জায়গা থেকেই সে ডিভোর্সের পরও নিজের কুৎসিত অতীতটাকেই ফিরে পেতে চায়, বাইরের কাজের চেয়ে গৃহ-শ্রমিকের জীবনটাই তাকে টানে বেশি। সে নিজেকে সাজিয়ে তোলে পুরুষের পছন্দ মতো, কোনও যুবক তার শরীরের প্রতি লুব্ধ হলে তার মনে হয়—

> ...আমার প্রয়োজনীয়তা ফুরোয়নি। ইচ্ছে ও চেষ্টা থাকলে এখনও যে-কোনো দূরত্বকে ইশারায় টেনে আনতে পারি কাছে।[১১]

তাই প্রতি মুহূর্তে সে নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন এবং সেই সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে সে মাঝেমধ্যে পুরুষদের আকর্ষণ করতেও সচেষ্ট হয়। কোন পুরুষ তার শরীরের প্রশংসা করলে তার শিহরণ হয়। পরিতোষের মতো যে সব পুরুষ তাকে শারীরিকভাবে কামনা না করে শুধুই পাশে থাকার চেষ্টা করে, তাদেরকে সে পৌরুষহীন 'শিশু' বলে

মনে করে। আবার ডিভোর্সের পরও নিজের শরীরের ওপর নিজের সম্পূর্ণ অধিকার নমিতা মেনে নিতে পারেনি, মণীশের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের পর একদিকে সে পুলকিত হয়েছে, আবার অন্যদিকে নিজেকে ঘৃণা করেছে। এমনকি তার মনে হয়েছে এতদিনে সে মহীতোষের কথা মতো যথাযথ 'বিচ' হয়ে উঠতে পেরেছে। এই বিষয়টিকে খ্যাতনামা নারীবাদী লেখক এবং সমাজকর্মী কেট মিলেট (১৯৩৪-২০১৭) তাঁর মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ-রাজনীতির (Psychological sexual politics) তত্ত্ব দিয়ে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে—

> The large quantity of guilt attached to sexuality in patriarchy is overwhelmingly placed upon the female, who is, culturally speaking, held to be the culpable or the more culpable party in nearly any sexual liaison, whatever the extenuating circumstances. A tendency toward the reflection of the female makes her more often a sexual object than a person...The female is continually obliged to seek survival or advancement through the approval of males as those who hold power.[১২]

হাজার বছর ধরে চলে আসা নিকৃষ্ট অবস্থানকেই নমিতার মতো মেয়েরা মেনে নেয়। এরা নিজের অপরাধকে বাড়িয়ে দেখে, অনাবশ্যকভাবে ক্ষমা চায়, প্রতি মুহূর্তে তটস্থ হয়ে থাকে পুরুষের চোখে নিজেকে প্রমাণ করবার জন্য। এরকম নিরাপত্তাহীন মানসিকতা নিয়ে শেষপর্যন্ত এরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েও মানসিকভাবে স্ব-অধীন হয়ে উঠতে পারে না।

২

অনুভব (১৯৮৪) উপন্যাসের আত্রেয়ী দর্শন শাস্ত্রে এম.ফিল. করতে করতে পারিবারিক ইচ্ছেকে মূল্য দিয়ে, অনেক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে বিয়ে করে। বিয়ের পর সামাজিক

প্রথাকে মান্যতা দিয়ে সে স্বামীর সঙ্গে লন্ডনে চলে যায়। বিয়ের দেড় বছরের মধ্যেই বুঝতে পারে তার স্বামী অন্য মহিলার প্রতি আসক্ত। তীব্র অপমানবোধ নিয়ে সে কলকাতায় বাবা-মা, দাদা-বৌদির কাছে ফিরে আসে। বত্রিশ বছর বয়সের তিক্ত অভিজ্ঞতা, প্রতারণা, নিঃসঙ্গতা এবং অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি পেতে মরিয়া হয়ে ইউনেস্কোর প্রজেক্টে যোগ দেয়। এই প্রজেক্টের সূত্রেই সে পরিচিত হতে থাকে ভারতবর্ষের বেশ্যাপল্লী এবং কল গার্লদের জীবনের সঙ্গে। এদেরকে চিনতে-চিনতেই তার নিজস্ব অনুভবের বিকাশ হতে থাকে এবং চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে।

আত্রেয়ী বরঞ্চ নমিতার তুলনায় উন্নততর অবস্থানে রয়েছে। এখানে বলে নেওয়াটা জরুরি নমিতা ১৯৭০-৭১ সালের একটি চরিত্র, অন্যদিকে আত্রেয়ী তার প্রায় তেরো-চোদ্দ বছর পরের একটি চরিত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নারীদের ব্যাপক অবদানের পর ১৯১৭ সালে কানাডায়, ১৯১৮ সালে যুক্তরাজ্যে এবং ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করে। তারপর থেকেই বিশ্বব্যাপী নারীমুক্তি আন্দোলনের জের, নারী-সচেতনতা ক্রমশ বাড়তে থাকে, ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের প্রসার ঘটে আরও পরে। স্বাধীন ভারতবর্ষে সার্বিক বিবাহবিচ্ছেদ আইন প্রচলিত হয় 'দি হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট' (১৯৫৫) এবং 'দি স্পেশাল ম্যারেজ আক্ট' (১৯৫৪)–এর মাধ্যমে। শ্রীমতী মল্লিকা সেনগুপ্ত এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মতামত পোষণ করেছেন—

> বাঙালির মনে ডিভোর্স যে কী সাংঘাতিক আলোড়ন তুলেছিল তার ছাপ রয়ে গেছে ডিভোর্স অ্যাক্ট-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসগুলিতে। বাংলা উপন্যাসে বিবাহবিচ্ছিন্ন নারীর নির্মাণ ও উপস্থাপনার ধরন দেখলে বোঝা যায় সমাজে প্রসঙ্গটির সামাজিক অভিঘাত কত বেশি। বিবাহবিচ্ছেদ বাঙালিকে কাঁপিয়ে দিয়ে ক্রমশই পালটে দিয়েছে তার পারিবারিক, লিঙ্গভিত্তিক ও দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত আর পালটে দিয়েছে বাঙালি মেয়ের জীবন। বিবাহবিচ্ছেদের

সামাজিক অভিজ্ঞতা বাঙালি মেয়েদের প্রাথমিকভাবে কোণঠাসা করলেও ক্রমশ বন্ধনমুক্তির অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ ও স্বনির্ভরতার প্রত্যয়ে পৌঁছে দিয়েছে, বাংলা উপন্যাসের পাতায় পাতায় তার স্বাক্ষর আছে। উপন্যাসে বিবাহবিচ্ছিন্না মেয়েদের যে ছবি আঁকা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে মুক্ত মেয়েদের সম্বন্ধে বাঙালির মনোভাব ফুটে ওঠে। বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে দোটানাও বোঝা যায়।[১৩]

দিব্যেন্দু পালিত-সৃষ্ট উক্ত বিবাহবিচ্ছন্ন দুজন নারী নমিতা এবং আত্রেয়ী বিবাহবিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে কিন্তু ‘বন্ধনমুক্তির অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ’ কতখানি উপলব্ধি করতে পেরেছে, সেটাই আলোচ্য বিষয়। তেরো বছরের ব্যবধানে লেখা এই দুটো চরিত্রের সামাজিক অবস্থান আপাতভাবে এক হলেও সঙ্গত কারণেই এদের মানসিকতায় বিস্তর ফারাক রয়েছে। আত্রেয়ী নমিতার মতো অতীতকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চায় না। অতীতের তিক্ততা তার মনেও হানা দেয়, তবে সে সাংঘাতিক জোরের সঙ্গে সেই সব স্মৃতি দমন করবার চেষ্টা করে। সে সৌন্দর্যের তথাকথিত ধারণারও তোয়াক্কা করে না। তবে এরকম চারিত্রিক দৃঢ়তা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে নমিতার থেকে আত্রেয়ী অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধে পেয়েছে। প্রথমত, আত্রেয়ীর পরিবার তাকে ডিভোর্সের পর আঁকড়ে ধরে রেখেছে, তার দাদা তাকে বলেছে—

যেমন ছিলে তেমনিই ফিরে এসেছ তুমি। একবার ভাবো তো, এর মধ্যে যদি একটা বাচ্চাকাচ্চা হয়ে যেত, তাহলে আরও কত ঝামেলায় পড়তে![১৪]

এছাড়াও আত্রেয়ীর পরিবারের প্রত্যেকে নানাভাবে তার মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করে প্রতিনিয়ত। আর ঠিক সে কারণেই সে অনেক বেশি আত্মমুখিন হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, নমিতা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, তার তিন কুলে কেউ নেই। মানুষের অভাব, শব্দের অভাব তাকে এতটাই ভাবিয়ে তোলে যে, সে কখনোই নিজের মধ্যে একটা আশা-

ভরসা গড়ে তোলার সাহস যুগিয়ে উঠতে পারে না। নমিতার থেকে আত্রেয়ী বয়সে চার বছরের বড়ো, বেশি শিক্ষিত। তাছাড়া আত্রেয়ীর অ্যারেঞ্জড্ ম্যারেজের সময়কাল, মাত্র দেড় বছর যেখানে ভালবাসা গড়ে ওঠার আগেই ভেঙে গেছে। অন্যদিকে, মাত্র ২২ বছর বয়সে লাভ ম্যারেজ করে বিয়ে করা নমিতা ছ-বছর সংসার করে, টিকলুকে পেটে ধরার পর শ্বশুরবাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এমতাবস্থায় নমিতার পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো আত্রেয়ীর তুলনায় অনেক বেশি কষ্টকর। বাপ-মাহারা নমিতাকে তার আশেপাশের প্রায় সব পুরুষই সাহায্য করেছে, পাশাপাশি বিনিময়ে এক পরিতোষ ছাড়া বাকি সকলেই তাকে শারীরিকভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। কিন্তু আত্রেয়ীর আশেপাশের পুরুষেরা তাকে প্রায় নিঃস্বার্থভাবেই সাহায্য করেছে। আত্রেয়ীর কাজও তাকে অনেকাংশে স্বাবলম্বী হতে, আত্মমর্যাদা বুঝে নিতে সাহায্য করেছে। কাজের সূত্রে সে এমন কিছু মেয়ের সংস্পর্শে এসেছে যারা আত্রেয়ীর থেকেও বেশি ভয়াবহ অবস্থার শিকার এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করেই তারা বেঁচে আছে, তাদের কেউ কেউ সেই নারকীয় জীবন থেকে বেরিয়ে নতুন করে বাঁচার প্রায় অসম্ভব স্বপ্নও দেখে। এই সমস্ত বিষয় আত্রেয়ীকে পিছুটান ফেলে এগিয়ে যেতে, কেরিয়ারমুখিন হতে অনেক বেশি সাহায্য করে। তবে কিনা, ঘর পোড়া গোরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। আত্রেয়ীর হয়েছে সেই অবস্থা। তাই শেষপর্যন্ত সে এগিয়ে যেতে যেতেও পিছিয়ে আসে। তার বসের তার ওপর আশ্চর্যরকম পক্ষপাতকে সে ভয় পেতে শুরু করে। বস মিস্টার কল্পতরু দাশগুপ্ত কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার ভয় থেকে সে চাকরিতে ইস্তফা দেয়। নৈতিক অধঃপতনের এই ভয়টা কেট মিলেটের বক্তব্যকেই সমর্থন করে। অর্থাৎ, আত্রেয়ীও পিতৃতান্ত্রিকতা-মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী একটা মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মোটামুটি সব দেশেই নারী-শ্রমের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী-শ্রমের ব্যবহার গোড়া থেকেই ছিল, তবে তার ধরন কিছুটা পাল্টাতে থাকে, অন্তত বহিরাঙ্গিক দিক থেকে তো বটেই। যে-সব ভূমিকায় আগে ছেলেদের ছাড়া ভাবা যেত না, সেইসব ক্ষেত্রে আস্তে-আস্তে মেয়েরাও যোগদান করতে থাকে। আসলে এই ধরনের সামাজিক পরিবর্তন, চুক্তি সবটাই পুরুষদের নিজেদের মধ্যেকার সমঝোতা। গৃহ-শ্রমিকের ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি বাইরে, এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নারী কাজ করে পুরুষের ছায়াসঙ্গিনী হিসেবেই, পুরুষের প্রয়োজন মেটাতে। যেমন নমিতার স্বামী প্রথমে নমিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে ঘর থেকে টেনে বের করে সাজিয়ে-গুজিয়ে রমণীয়ভাবে পেশ করেছিল নিজের পুরুষ-বন্ধুদের সামনে। নমিতার জড়তাহীন, মাপা হাসি, পাঁচ মিনিটে যেকোনো আলাপকে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা—এই সব সামাজিক 'স্কিল', সর্বোপরি নমিতার যৌবনের লালিত্য-মাখা আবেদনময়ী উপস্থিতিকে সে নিজের ব্যবসার কাজে সুচারুভাবে ব্যবহার করত, যেমনটা পুঁজিবাদী সমাজের একজন সফল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ী সচরাচর করে থাকেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই জঘন্য ফাঁদটা কীভাবে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে অবিশ্বাসবিদ্ধ এবং কলুষিত করে তুলছে, তার একটা চমৎকার নমুনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) দিয়েছিলেন তাঁর 'যাকে ঘুস দিতে হয়' (১৩৫৩) গল্পে। এখানে দেখানো হয়েছে, মাখন এবং তার স্ত্রী সুশীলা টাকার নেশায় মত্ত হাতির মতো বিভোর, কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে উঠেছে। মালিককে ঘুস দিয়ে তুষ্ট করতে করতে শেষপর্যন্ত শ্রমিক মাখন নিজের বউকেই ঘুস হিসেবে পাঠিয়ে দেয় মালিক দাসসাহেবের কাছে। নারী-পুরুষের যৌথ দায়িত্বে গড়ে ওঠা পরিবার, রাষ্ট্র এবং সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক চরিত্রের এই ভয়ংকর অবক্ষয়ের দায় কিন্তু নারীকেই নিতে হয়। মালিকের জন্য শ্রমিক যাই করুক না কেন, মালিক শ্রমিকের দ্বারা

কোনোদিন সন্তুষ্ট হবে না, লাভের ভাগ নিজে নেবে আর ক্ষতির বোঝা শ্রমিকের ওপর চাপিয়ে দেবে। আর একটা পরিবারের মধ্যে পুরুষেরা সবসময়ই মালিক এবং নারীরা প্রলেতারিয়েত। সেই সমীকরণ অনুযায়ীই নমিতাও এতকিছুর পর স্বামীর কাছে দুশ্চরিত্র, ঘৃণ্য 'ব্লাডি পিগ' হিসেবে গৃহ-শ্রমিকের চাকরি থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

অনুভব উপন্যাসটি কেবল আত্রেয়ীর জীবন এবং তাকে ঘিরে তার নিজস্ব অনুভবের গল্প নয়, আত্রেয়ীর মতো হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া কিছু কিছু মেয়ের ছোটো-ছোটো গল্পের সমাহার। তবে আত্রেয়ীর সামাজিক অবস্থানের থেকে এদের সামাজিক অবস্থান একেবারেই ভিন্ন। সমাজ বা রাষ্ট্র এদেরকে নিরাপত্তা দেয়নি, পরিবারও এদের নানাভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা কেউ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার তাড়নায়, আবার কেউ কেউ জেনেশুনেই দেহোপজীবীনীর জীবন বেছে নিয়েছে। বৃত্তি এক হলেও এদের ধরন ভিন্ন, কেউ কেউ পতিতালয়েই থাকে সাধারণ পতিতা হিসেবে, কেউ আবার পতিতালয়ের প্রকাশ্য গণ্ডিতে না থেকে বিউটি পার্লার, বুটিক, এজেন্সি বা দালাল মারফত কাজ করে। এদের মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষিত বা উচ্চ-শিক্ষিত মেয়েও রয়েছে যাদেরকে 'কল গার্ল' নামক ইংরেজি উপাধিতে ভূষিত করে আলাদা সম্মান দেওয়া হয় যদিও কাজ সকলেরই এক, কোন পুরুষের রিরংসাকে অর্থের বিনিময়ে তুষ্ট করা। কল-গার্লদের ক্ষেত্রে অবশ্য পুরুষ বলতে আম আদমি নয়, বড়োসড়ো মন্ত্রী বা রাজা-গজা গোছের ক্ষমতাবান লোক। সুতরাং, তাদের সঙ্গের দামও সাধারণ বেশ্যাদের তুলনায় ঢের বেশি। সাত জন দেহোপজীবীনীর উল্লেখ রয়েছে এখানে।

প্রথম জন লছমী, কুড়ি বছরের নেপালী যুবতী। ছ-সাত বছর আগে টাকার বিনিময়ে তার বাবা নিজে তাকে দালালদের হাতে তুলে দেয়। নেপালে থাকাকালীন রাত-

দিন খেটেও ভরপেট খাওয়া জোটাতে না পেরে, মূলত খিদের তাড়নায় সে শরীর-বিক্রির পথে নামে।

দ্বিতীয় জন, বোম্বাইয়ের পতিতাপল্লীতে নির্যাতিত চোদ্দ বছরের ফুলের মতো নিষ্পাপ সুদর্শন এক কিশোরী, যে ধর্ষণের আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

তৃতীয় জন, বরানগর এলাকার ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের মায়া দাস। তার ডাক নাম বাবলি আর পেশাগত নাম সুইটি। ছেলেবেলায় মা-হারা এই মেয়েটি বাবা এবং সৎ মায়ের যাবতীয় স্নেহ থেকে বঞ্চিত। নিজের এবং নিজের ভাই-বোনেদের পেটের ভাতও আঠারো বছর বয়স থেকে নিজেই যোগায়। প্রথম দিকে টিউশানি পড়িয়েই কোনোক্রমে চলে যেত, পরে স্টুডেন্টের বাবার কল্যাণে বর্তমান লাইনের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং সেই সূত্রে টাকার মুখ দেখে।

চতুর্থ জন, চেতলা অঞ্চলের সাঁয়ত্রিশ বছরের শকুন্তলা। তার ডাক নাম খুকি আর কল নাম কুন্তী। গ্র্যাজুয়েশন পড়তে পড়তেবিয়ে হওয়া এই মেয়েটি রুচিবোধসম্পন্ন, ভদ্র, মার্জিত, পরিশীলিত, সর্বোপরি তার আত্মোপলব্ধি গভীর। শকুন্তলার দুর্ভাগ্যের সূচনা হয় অসুস্থ স্বামীর মৃত্যুর পর। বহু ব্যবহৃত ঐতিহাসিক পদ্ধতি, 'বিয়ে' নামক নিরাপত্তা দেওয়ার টোপ ফেলে শকুন্তলার দেওর তাকে কিছুদিন ব্যবহার করে। তারপর মায়ের সুপুত্তুরটি সেজে বিয়ে-থাওয়া করে শকুন্তলাকে দালালের কাছে বিক্রি করে দেয়।

পঞ্চম জন পামেলা ওরফে পমি। আঠাশ বছরের এই মেয়েটি চৌরঙ্গির একটি মাঝারি হোটেলের সঙ্গে যুক্ত। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বাবার দুরন্ত আর্থিক স্বচ্ছলতায় বেড়ে ওঠা উচ্চ-শিক্ষিত মেয়ে সে। বাবা-মায়ের সম্পর্কের ভয়ংকর তিক্ততা, সৎ মায়ের

স্বার্থপরতা, নিজের মায়ের অদ্ভুত আত্মসম্মানবোধ এবং ঔদাসীন্য, বাবার কাছ থেকে পাওয়া অবাধ স্বাধীনতা আর অপর্যাপ্ত টাকা—এই সব মিলিয়ে অল্প বয়স তাকে বিভ্রান্ত করে এবং সাংঘাতিক উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রেমিকের কাছেও কোনোরকম স্নেহের আশ্রয় সে পায়নি, শেষকালে এক বিদেশি স্মাগলারের পাল্লায় পড়ে এক হোটেলে ট্রাভেল এজেন্সির চাকরি নেয়। বাইরে থেকে পামেলা গেস্ট রিলেশনের চাকরি করে এবং ভেতরে-ভেতরে মোটা টাকার বিনিময়ে ফরেনার বা ডাকাবুকো গোছের বিশেষ অতিথিদের সেবা দান করে। তবে সে নিজেকে কল-গার্ল বলে মানতে নারাজ, তার মতে সে একজন স্বাধীনচেতা চাকুরিজীবী। কেন, কীভাবে, কী করছে সে জানে না, শুধু জানে সুযোগ পেলেই বিদেশে চলে যাবে।

ষষ্ঠ জন, এন্টালির বিশ বছরের রাজমী ওরফে রাজু। নেপালের গরিব কৃষকের মেয়ে রাজমী প্রতিবেশী এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার অপরাধে কাঠমাণ্ডুতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে নির্বাসিত হয়। ওই বাড়ির এক যুবক তাকে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করে ফেলে এবং গর্ভপাতের কাজে সহায়ক মহিলা ও তার সাগরেদের কাছে রাজমীকে বিক্রি করে দেয়। সাগরেদ লোকটি তাকে নিয়মিত ধর্ষণ করে কর্মোপযোগী করে তোলে এবং বর্তমানে সে যথাযথ 'কুত্তি' হয়ে উঠতে পেরেছে বলেই তার বিশ্বাস।

সপ্তম জন, ইংরেজিতে অনার্স গ্র্যাজুয়েট, বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ত্রিশ বছরের স্বপ্না। বোম্বাইতে বিয়ের পর জানতে পারে তার স্বামী অন্য মহিলার প্রতি অনুরক্ত। ডিভোর্স নিয়ে সে বাবা-মায়ের কাছে ফিরে আসে এবং অতীতকে ভুলে থাকতে আবার কর্মযজ্ঞে সামিল হয়। কিন্তু উচ্চাশা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে ক্রমাগত ব্যবহৃত হতে হতে

সে একসময় পরিত্যক্ত হয় এবং চাকরিও হারায়। আত্রেয়ী নিজের সঙ্গে এই মেয়েটির আশ্চর্য সাদৃশ্য অনুভব করে এবং আতঙ্কে সমগ্র রিপোর্টটা আর পড়ে না। তবু স্বপ্নার পরিণতি কী হতে পারে, তা আন্দাজ করা যায়।

এরা প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী কিন্তু, নিজেকে নিয়ে সুখী নয়। কারণ এই বৃত্তি তারা শখ করে বেছে নেয়নি। কেউ কেউ অভাবের তাড়নায়, কেউ কেউ ঘটনাচক্রে এই পেশায় জড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া এরা সবাই জানে, শুধুমাত্র উপভোগ্য বস্তু হিসেবে সমাজ এবং রাষ্ট্র তাদের অনুগ্রহ করে এই অসম্ভ্রমসূচক সামাজিক অবস্থান প্রদান করেছে। যদিও বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় প্রত্যেকটি মেয়েই তৈরি হয় কোনও না কোনও পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসেবে, তবু একবিবাহ প্রথা (The Monogamian Family) চালু হওয়ার পর মেয়েদের জন্য সবচেয়ে সম্মানজনক অবস্থান কোনও একজন পুরুষকে বিয়ে করে তার 'private property' হয়ে বেঁচে থাকা। তার পরিবর্তে অর্থের বিনিময়ে এদের একাধিক পুরুষকে দেহদান করতে হচ্ছে লুকিয়ে-চুরিয়ে নানারকম অসামাজিক পদ্ধতি অবলম্বন করে। তাই এদের অস্তিত্বের সঙ্গে নীতি-নৈতিকতা, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ইত্যাদি ভারি-ভারি শব্দ জড়িয়ে পড়ছে। বেশ্যাবৃত্তির উদ্ভব সম্পর্কে বলতে গিয়ে মর্গান 'হেতেরে প্রথা' (Hataerism)-র উল্লেখ করেছেন। এই প্রথা পুরুষ এবং অবিবাহিত নারীর মধ্যে অবাধ যৌন সংসর্গের সূচক। সভ্যতার সব কালে, সব যুগেই একবিবাহ প্রথার পাশাপাশি এই প্রথা চলে আসছে নানা রূপে, নানা আঙ্গিকে। দলগত বিবাহ (group marriage) ও ধর্মীয় উৎসবাদিতে নারীর আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে হেতেরে প্রথার উৎপত্তি। অর্থের বিনিময়ে দেহ সমর্পণ করা প্রথম দিকে ধর্মের অঙ্গ হিসেবেই গণ্য হতো এবং এর মাধ্যমে সতীত্বের অধিকারও বজায় থাকত। প্রণয় দেবতার মন্দিরেই এই কাজ সম্পন্ন হত, আর নারীর দেহ বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যেত, তা মন্দিরের তহবিলে জমা হত। আর্মেনিয়ার

আনাইতিস দেবতা, করিন্থের আফ্রোদিতে দেবতার মন্দিরের ক্রীতদাসীরা এবং ভারতীয় মন্দিরের দেবদাসী নর্তকীদেরই জগতের প্রথম বেশ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। বিয়ের আগে অবাধ যৌন সংসর্গের যে অধিকার নারীর ছিল, তার থেকেই 'হেতেরে প্রথার' উৎপত্তি। অর্থাৎ, এর মধ্যে দলগত বিবাহ প্রথার জেরই দেখা যায় অন্য পথ দিয়ে। সম্পত্তির অধিকারের অসাম্য দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু আগের বর্বর যুগের শেষ দিক (high level) থেকে চলে আসা শ্রম-বিক্রয় প্রথার পাশাপাশি আনুষঙ্গিকভাবে চলে আসে স্বাধীন পেশাদার বেশ্যাবৃত্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উত্তরাধিকার সূত্রে দলগত বিবাহ প্রথার কাছ থেকে সভ্যতা যা লাভ করেছে তা আসলে দু-মুখো। সভ্যতা জিনিসটা অবশ্য সব দিক থেকেই দু-মুখো, দ্ব্যর্থবোধক, পরস্পর-বিরোধী এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে ভরা। সভ্যতার সর্বোচ্চ রূপে দেখা গেল, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একদিকে রয়েছে একবিবাহ প্রথা, আর অন্যদিকে হেতেরে প্রথা যার চূড়ান্ত রূপ পতিতাবৃত্তি। এই বিষয়ে এঙ্গেল্‌সের সুস্পষ্ট মত—

> Hetaerism is as much a social institution as any other; it is a continuation of the old sexual freedom—in favour of the men. Although, in reality, it is not only tolerated but even practised with gusto, particularly by the ruling classes, it is condemned in words. In reality, however this condemntion by no means hits the men who indulge in it, it hits only the women: they are ostracised and cast out in order to proclaim once again the absolute domination of the male over the female sex as the fundamental law of society.[১৫]

অর্থাৎ, শাসক-শ্রেণির যাবতীয় সমর্থনসমেত পুরুষেরা আনন্দ-ফুর্তি করে আর নিন্দার ভাগীদার হয় নারীরা। তাদের ঘৃণ্য জীব হিসেবে সমাজচ্যুত করে আরও একবার সমাজের মূল নীতি হিসেবে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য সদর্পে ঘোষণা করা হয়। *অনুভব* উপন্যাসে উল্লিখিত এই সাতটি মেয়ে এই দলেরই প্রতিনিধি, যারা আর্থিকভাবে

স্বাবলম্বী কিন্তু সমাজ এদের প্রকাশ্যে ঠাঁই দেয়নি। কীভাবে শাসকশ্রেণি নিজের স্বার্থে গোপনে এদের শোষণ করে এবং প্রকাশ্যে নিন্দা করে তার কিছু নমুনা দেখে নেওয়া প্রয়োজন। লছমি বলেছে—

> আমি যদি পুরুষ হোতাম তাহলে পেট ভরানোর জন্যে মানুষ খুন করতাম, কিন্তু, নারী হিসেবে শরীর বিক্রি করেই পেটের জ্বালা মেটাচ্ছি।[১৬]

নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যৌনতা হচ্ছে একটি শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই হাতিয়ার চালনার জন্য রাজা-রাজড়ারা যেমন জায়গিরদার বা জমিদার রাখত, লাঠিয়াল পুষত, অনেকটা সেই ধরনে রাষ্ট্রশক্তি পরিবার-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। পরিবারের মূল ভূমিকা নারীকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করা, অবাধ্য নারীকে উচিত শিক্ষা দেওয়া। উৎপাদন-ব্যবস্থায় পুরুষেরা ঘরের বাইরে কাজ করবে এবং নারী ঘরে থেকে পুরুষের সেবা-যত্ন করবে, সন্তানের জন্ম দেবে এবং তাকে লালন-পালন করবে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধুমাত্র সম্পত্তিহীন দরিদ্র পরিবারগুলি, যেখানে আর্থিক প্রয়োজনে পুরুষ-নারী উভয়ই বাইরের কাজে যোগ দেয়। পেটের দায়ে লছমির মতো যে-সব মেয়েরা ঘরের বাইরে বের হয়, তাদের উৎপাদনশীল কাজে সরাসরি নিয়োগ করবার অন্যতম কারণ সস্তা শ্রম। কম মজুরি, অমানুষিক পরিশ্রম অথবা পুরুষের বাড়তি যৌন ক্ষুধার শিকার হওয়া ছাড়া এদের আর কোনও উপায় থাকে না। উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকেও এরা উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার মূল প্রচেষ্টার মধ্যে জায়গা পায় না, এমনকি সমাজেও এদের ঠাঁই হয় না, এদের একমাত্র পরিচয় এরা সমাজ থেকে পতিত, এককথায় পতিতা। গৃহকর্মে নিযুক্ত থেকে নারী যেমন অপ্রত্যক্ষভাবে পুঁজির বিকাশে সহায়তা করে, তেমনি লছমির মতো পতিতারা উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত পুরুষ শ্রমিকদের

বাড়তি কামকে প্রশমিত করে বলবর্ধক টনিক হিসেবে কাজ করে। *অনুভব* উপন্যাসেই শ্রীমতী তামজালির মুখে শোনা যায়—

> নাৎসি বর্বরতার জবাবে, প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে ১৯৪৫-এ সোভিয়েত সৈন্যরা ২০ লক্ষ জার্মান মহিলাকে ধর্ষণ করে।[১৭]

অর্থাৎ, সমাজের নিয়মেই পুরুষ খুন-জখম, যুদ্ধ ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কাজ করবে আর পাশাপাশি নারী-শরীর তৈরি হবে 'যুদ্ধক্ষেত্রে, যুদ্ধনীতি হিসেবে'। এইভাবেই পুরুষ-শ্রমিকের শারীরিক শক্তি এবং আগ্রাসী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে আর মহিলাদের 'বেশ্যা' বানিয়ে রাষ্ট্রশক্তি সুপরিকল্পিতভাবে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে দিব্যেন্দু পালিত নিজে জানিয়েছেন—

> 'অনুভবে' যেটা রয়েছে – How women are thrown into the flesh trade এটা করতে গিয়ে I traced the history of this thing, বুঝেছো তো? মানে যুদ্ধক্ষেত্রের যে ব্যাপারটা— মিসেস তামজালি যে বক্তৃতাটা করেছে, সে যুদ্ধের সময়ের কথাটা বলছে। যে, নাৎসীবাহিনী রাশিয়াতে যখন গেল তখন রাশিয়ার মেয়েদের rape করতে শুরু করলো। আবার যখন রাশিয়ান বাহিনী প্রত্যাঘাত হানলো, যখন ওরা ফিরে আসছে তখন কিন্তু মানে thousands and thousands women...হ্যারি ট্রুম্যান স্তালিনকে লিখেছিল যে, What is happening? মেয়েদের উপর অত্যাচার কেন? স্তালিন বলেছিলো, আমার সোলজারদের যদি জিততে হয় তাহলে এই লাইসেন্স তাদের দিতে হবে। তাদের যুদ্ধটা হচ্ছে কিন্তু অন্য জায়গায়, যুদ্ধের কারণও কিন্তু অন্য – Victim হচ্ছে মেয়েরা—[১৮]

ধর্ষণের প্রচণ্ডতা কতখানি, তা এই উপন্যাসের ১৪ বছরের নিষ্পাপ কিশোরীটির প্রসঙ্গে উঠে আসে। সে ধর্ষণের ভয়াবহতায় এমনিই কাতর যে মহিলা চিকিৎসককে দেখে পর্যন্ত গায়ের সেমিজ খুলে দাঁড়িয়ে পড়ছে। প্রসঙ্গত, সাদাত হুসেন মান্টোর (১৯১২-১৯৫৫) 'ঠান্ডা গোস্ত' (১৯৫০) গল্পের ১৭ বছরের সাকিনার কথা মনে করতেই হয়।

সাকিনা দাঙ্গার পটভূমিতে বারবার ধর্ষিত হওয়ার পর এমন এক মানসিক স্তরে চলে যায় যে পরে নিজের বাবা সিরাজুদ্দিনকে দেখেও পাজামার দড়ি খুলে দেয়। মানুষের প্রতি যাবতীয় বিশ্বাস হারিয়ে রাগ, ঘৃণাবাবদ সবরকম অনুভূতির প্রতি এরা মূক, তাই নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করতে এদের আর বাধে না।

মায়া আর শকুন্তলা উভয়ই আর্থিক এবং মানসিক নিরাপত্তার অভাব থেকে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় এমনিতেই মেয়েরা প্রতিনিয়ত নিরাপত্তার অভাব বোধ করে, তদুপরি বাবা-মায়ের বড়ো সন্তান হলে তো কথাই নেই। মায়া দিদি হিসেবে নিজের এবং ভাই-বোনেদের নিরাপত্তার জন্য গৃহ-শিক্ষিকা হিসেবে অর্থ-উপার্জন করবার সব চেষ্টাই করেছে, তবে শেষপর্যন্ত তাকে টাকার মুখ দেখিয়ে স্বচ্ছল জীবন দিয়েছে বেশ্যাবৃত্তি। এই নিয়ে তার কোনও অভিযোগও নেই—

> ...বাধ্য হয়েই সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এতে ভাল লাগা, মন্দ লাগার ব্যাপার নেই। তবে ক্লায়েন্টকে খুশি করার জন্যে ভাল লাগার অভিনয় করতে হয়। তাতে রফার বাইরে বাড়তি টাকা পাওয়া যায় অনেক সময়। টাকাটা কাজে লাগে।[১৯]

অন্যদিকে, শকুন্তলাকে ছোটো-ছোটো বোনেদের মুখ চেয়ে গ্র্যাজুয়েশন পড়তে পড়তেই একজন অসুস্থ লোককে বিয়ে করতে হয়। অসুস্থতার কারণে অল্প বয়সেই সে মারা যায় আর তারপরেই শকুন্তলার জীবনে প্রকৃত বিপর্যয়ের সূচনা হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে কেবল পুরুষেরাই যে পিতৃতান্ত্রিক তা নয়। পিতৃতান্ত্রিকতা এমন এক মানসিক অবস্থা যার শিকার সমাজে বসবাসকারী প্রায় প্রতিটি মহিলাই। শকুন্তলার শাশুড়ি এমনই এক পিতৃতান্ত্রিক মহিলা যিনি পরিবারের সব মন্দ ঘটনার দায় চাপিয়ে দেন শকুন্তলার ওপর এবং শকুন্তলাকে ঘর থেকে তাড়ানোর জন্য সমস্তরকম আয়োজন করা শুরু করে দেন। শকুন্তলার নিজের রোজগার নেই, সুতরাং গৃহচ্যুত হলে সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—

এইরকম একটা নিরাপত্তাবোধের অভাব থেকে সে তার দেওরের প্রলোভনে পা দেয়, ভাবে—

> ...এ বাড়িতে দেওরের দাপট আছে, রোজগারও সবচেয়ে বেশি—দেওর তাকে বিয়ে করলে হয়তো বদলে যাবে জীবন।[২০]

লক্ষণীয়, পুরো বিষয়টাই দাঁড়িয়ে রয়েছে সম্পত্তির মালিকানার ওপর। যার যত বেশি সম্পত্তি, তার পারিবারিক বা সামাজিক আস্ফালনও তত বেশি। শকুন্তলা উৎপাদন-ব্যবস্থার সহায়ক ছিল কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর সে কর্মচ্যুত হয়েছে, তাছাড়া একটি সন্তানের জন্ম দিয়েও তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি, ফলে ভবিষ্যতের শ্রমিক তৈরির কাজও তার হাতে নেই। এইরকম সর্বহারা অবস্থায় তার কাছে দুটো রাস্তাই খোলা ছিল, এক অন্য পুরুষকে বিয়ে করে নতুন ছত্রছায়া জুটিয়ে নেওয়া, দুই আদিম-বৃত্তি দেহদানের পথে রোজগার শুরু করা। তবে শকুন্তলা যেহেতু শিক্ষিত সে এই বৃত্তির মধ্যে দিয়ে পথ চলতে চলতেই তার নিজস্ব অবস্থান খুঁজে পেয়েছে। একসময় যে শকুন্তলা অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে লতানো গাছের মতো বেঁচে থাকতে চেয়েছিল, স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য পুরুষের স্পর্শে পাপবোধ করেছিল, কিংবা অঙ্কুর মাস্টারকে 'যমজ বাচ্চা' উপহার দিতে না পারার এবং অঙ্কুর মাস্টারের আত্মহননের জন্য নিজেকে দায়ী করেছিল, সেই শকুন্তলা ৩৭ বছর বয়সে এসে বলেছে—

> সে 'নীতি-ফিতির ধার' ধারে না। এসব ভাববেই বা কেন? তার শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর, দেওরের কোন নীতিবোধ কাজ করেছে, কিংবা তার বাবার? তার শরীরের দাম আছে, সেটাই সে বিক্রি করে।[২১]

এমনকি সে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেছে যাতে ব্যবসার উন্নতি হলে এই বৃত্তি থেকে মুক্ত হতে পারে। এই মেয়েটিকে বরঞ্চ নমিতা বা আত্রেয়ীর থেকে অনেক বেশি স্বাবলম্বী,

আত্মসচেতন এবং সাহসী বলে মনে হয়। শকুন্তলা আসলে প্রকৃত লড়াকু মনোভাবাপন্ন একজন মানুষ। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে সে প্রতিকূলতাকে এক হাতে নিয়েছে এবং এতকিছুর পরও সে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। সতীত্ব সম্পর্কে কুসংস্কারের জায়গা থেকে নয়, আত্মসম্মানবোধ থেকে সে বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে অন্যভাবে নিজের গুণকে কাজে লাগিয়ে বাঁচতে চায়, যেটা সত্যিই অভাবনীয়। শকুন্তলার মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে একমাত্র 'স্ত্রীর পত্র' (১৩২১)–র মৃণালের আত্মমর্যাদাবোধের তুলনা চলতে পারে যদিও দুজনের সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৩

মধ্যরাত (১৯৬৭) উপন্যাসে পাওয়া যায় আঠাশ-উনত্রিশ বছরের তপতীকে এবং তাকে ঘিরে থাকা তার কাছাকাছি বয়সের কয়েকজন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী মেয়েদেরকে। তপতীর বয়ানেই উপন্যাসের মূল-বিস্তার, তার চোখ দিয়েই দেখা যায় ষাটের দশকের মেয়েদের মেসবাড়ির জীবনযাত্রা। আশ্চর্যের বিষয়, ষাটের দশকের উত্তপ্ত, উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও সমাবেশই উপন্যাসে নেই, রয়েছে কেবল যুবতী কয়েকটি মেয়ের অত্যন্ত ব্যক্তিগত সমস্যা এবং নিঃসঙ্গতার কথা। আর্থিক স্বাবলম্বিতা সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকের জীবনেই ঢুঁ মারলে পাওয়া যাবে নিস্তরঙ্গ, দীর্ঘস্থায়ী মধ্যরাতের নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতা এবং গাঢ় অন্ধকারের অনিশ্চয়তা। এদের চরিত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রেও কোনও ওঠাপড়া নেই। প্রায় একইরকম নিস্তরঙ্গ, একঘেয়ে, অগভীর, অপরিণত চরিত্রের কয়েকটি মেয়ে উপন্যাসের মধ্যে আসে-যায় কিন্তু পাঠকের মনে কোনও জোরালো প্রভাব ফেলে না।

তপতী তার বাবা অবনীশকে প্রায় সাত বছর আগে হারিয়েছে। দু-বছর দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে তার মাও মারা গেছেন। সে তার বাবার বন্ধুস্থানীয়, অত্যন্ত স্নেহশীল সাধন কাকার আশ্রয়ে থেকেছে দীর্ঘদিন। তথাকথিত সৌন্দর্যের সংজ্ঞা মাথায় রাখলে সে রীতিমতো সুন্দর স্বাস্থ্য এবং রূপের অধিকারী। তদুপরি এম. এ. পাশ, ছ-বছর ধরে স্কুল-মাস্টারির চাকরি করেছে। তার দুঃখের একটাই কারণ, সে নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, অসহায় মনে করে যেহেতু এই বয়সেও তার বিয়ে হয়নি। সম্বন্ধ বেশ কিছু এসেছে, সাধন কাকাও তার জন্য কম চেষ্টা করেননি কিন্তু ত্রিশের দোরগোড়ায় এসেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। সাধন কাকার বিশেষ বন্ধু নীতীশের সুবাদে সুরমা দেবী গার্লস কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপিকা হিসেবে যোগদান করে তপতী। তারপর সাধন কাকার স্ত্রীর অর্থাৎ তপতীর কাকিমার, তার প্রতি আঠাশ-উনত্রিশ বছরের ধিঙ্গি আইবুড়ো মেয়ের অনাকাঙ্ক্ষিত অভিযোগকে মাথায় রেখে নতুন চাকরি নিয়ে 'নষ্টনীড়' নামের একটি মেয়েদের মেসে এসে ওঠে। মেসের মেয়েদের সাহচর্য, আন্তরিকতা কোনোকিছুই যেন তপতীকে গভীরভাবে স্পর্শ করেনি। মেসটিও তার নামের সার্থকতা বজায় রেখে বাসাসুলভ কোনও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেনি তপতীকে। মেস এবং তৎসংলগ্ন ঘটনার মধ্যে, এমনকি মেসের বাসিন্দাদের মধ্যেকার একটা নেতিবাচক আবহই উপন্যাসের গতিপথ নির্ধারণ করেছে। সাধন কাকার সূত্রে সে নীতীশকে পেয়েছে তার পরম উপকারী বন্ধু হিসেবে। শুধু কলেজের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে নয়, ছোটো-বড়ো আরও অনেক বিষয়ে ক্ষমতাবান নীতীশ বারবার তপতীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই বন্ধুত্বেও সহজতা ছিল না। আসলে জীবনের উনত্রিশ বছর পার করে ফেলেও প্রেম-ভালোবাসা, বিচ্ছেদ, যৌনতা সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা হয়নি তপতীর। বাবা-কাকার পর নীতীশই সে অর্থে তার জীবনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পুরুষ। অনভিজ্ঞতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই

নীতীশকে কেন্দ্র করে পরিণত বয়সে এসে তপতীর অবচেতন মনে দানা বাঁধে অপরিণত প্রেম। দীর্ঘদিনের অন্তর্মুখীনতাকে অতিক্রম করে তপতী কখনই নীতীশের অকপট বন্ধুত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি। নীতীশ তাকে নিজের বাড়িতে সরাসরি চিঠি দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে, তার মৃত্যু-শয্যায় থাকা মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, নানাভাবে আলাপ-আলোচনা জমানোর চেষ্টা করে গেছে, কিন্তু তপতী কখনই তার মাপা হাসি, চাপা কান্নার দীর্ঘ অভ্যেস থেকে মুক্ত হয়ে সহজ হয়ে উঠতে পারেনি। নীতীশ স্পষ্টত না হলেও আকারে-ইঙ্গিতে বেশ কয়েকবার জানিয়েছে, শুধু নিজেকে নিয়ে বাঁচা যায় না, কোথাও না কোথাও থিতু হতে হয়। তপতীরও নীতীশকে ঘিরে মানসিক উত্তেজনা, চিন্তা-ভাবনার অন্ত্য নেই কিন্তু বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে তার অদ্ভুত দীনতা, জড়তা এবং সংকোচ প্রমাণ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলেও মানসিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে গেলে যে পরিমাণ মানসিক শক্তি সঞ্চয় করতে হয়, তা তার নেই। সে প্রেম-ভালোবাসার যাবতীয় পদক্ষেপ চায় নীতীশের তরফ থেকে। নীতীশের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের ইতিহাস আগাগোড়াই গ্রহণের ইতিহাস। সে গ্রহণ কেবলমাত্র চাকরি ক্ষেত্রে বা সামাজিক কোনও সহায়তার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, অনুভূতি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও সে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ভীত, সংকুচিত। একজন শিক্ষিত, স্বাবলম্বী মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তপতী মনে করে সে দীন এবং অসহায়। নীতীশকে ঘিরে তার মধ্যে যে অনুভূতির উচ্ছ্বাস, আবেগের ঝড় তা কার্যক্ষেত্রে তপতীকে সুখদায়ক তৃপ্তি তো প্রদান করেইনি, বরঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছে তীব্র অস্বস্তির কারণ। আঠাশ-উনত্রিশ বছর বয়সে এসে হঠাৎ অচেনা আবেগের সম্মুখীন হয়ে সে নতুন অনুভূতির প্রাবল্যে বিভ্রান্ত হয়ে বারবার সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করেছে—

> বস্তুত, তপতী নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। যত সময় যাচ্ছে, বুকের ভেতর অসহায়তাবোধ ততই তীব্র হয়ে উঠছে। ভালো হতো যদি আজকের দিনটাও কোনোরকমে পার করে দেওয়া যেত।

> সেই চেষ্টাই করছিল। নীতীশ হয়তো কিছু ভাবত, ক্ষুণ্ণ হত, তার বেশি আর কী হত! কিন্তু, এই আসা, নীতীশের চলে যাওয়া, নিজের অস্বস্তি, অসহায়তা—অর্থহীন একটার-পর-একটা ঘটনা অসহ্য মনে হচ্ছিল তপতীর।[২২]

গোটা উপন্যাস জুড়ে তপতীর যে প্রবল নিঃসঙ্গতাবোধ, একাকিত্বের অসহায়তা, তা একসময় পুনরাবৃত্তিমূলক হয়ে দাঁড়ায়। কাঁচা বয়সে মা-বাবাকে হারানোর, অন্যের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে থাকার গভীর দুঃখবোধ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সাধন কাকার মতো মানুষের স্নেহধন্য হয়ে থাকা, নীতীশের মতো মানুষের সাহচর্যে অনায়াসে ক্ষমতার অতীত চাকরি লাভ করা, নীতীশের আন্তরিক বন্ধুত্ব লাভ করাও যে সৌভাগ্যের বিষয়, তা তপতীর কখনই মনে হয়নি। যদিও বা মনে হয়েছে, কিন্তু তার থেকে দশগুণ বড়ো হয়ে উঠেছে তার না পাওয়ার হাহাকার। তপতীর মধ্যে অদ্ভুত একধরনের নেতিবাচক অতীতচারণা, অন্তর্মুখিতা এবং জড়তা রয়েছে, যেটা পাঠকের সহানুভূতি আদায় করার পরিবর্তে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও লড়াই, কোনোরকমের চেষ্টা তার নেই। বস্তুত, সে সারাক্ষণ অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে নিরন্তর দুঃখের চর্চা করে এবং নিজের কাছে নিজেকে দুর্ভাগ্যের শিকার প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে। যেকোনো ঘটনা, যেকোনো পরিস্থিতির মধ্যে দুঃখ, একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা এবং অন্যান্য নেতিবাচক দিককে খুঁজে নিতে এবং সেই নেতিবাচকতার মাঝে আত্মমগ্ন হয়ে থাকাতেই সে অভ্যস্ত। দুঃখের প্রতি তার অভিযোগ রয়েছে, কিন্তু দুঃখকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই। সাধন কাকার ভাগ্যের সঙ্গে আপোস করে বাঁচা, অদৃষ্টের কাছে পরাজয় স্বীকার করে যা হচ্ছে তাকে মেনে নেওয়ার আচরণের মাঝে কোনও যুক্তি খুঁজে পায় না তপতী। সাধন কাকার এই 'ডিফিটিস্ট অ্যাটিচুড'-এর প্রতি তার প্রচ্ছন্ন

বিরক্তিই রয়েছে অথচ সে নিজে সবকিছুকে নিজের ভবিতব্য বলে ধরে নিয়েছে, নির্বিকারভাবে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে—

> রোদ ছিল না, ছায়া জড়ানো চতুর্দিকের নির্বিকার প্রশান্তির ভেতর নিঃসঙ্গ ঘুরতে ঘুরতে তপতীর মনে হচ্ছিল, এই তার জীবন, এই তার পরিণতি; তোমার ভবিতব্য, তুমি একা। যতই চাও, এই পরিণতি এড়ানো তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।[২৩]

সর্বত্র শূন্যতা খুঁজে নেওয়ার নিরন্তর অভ্যেস তপতীকে কোথাও যেন নিষ্ক্রিয় জড় বস্তুতে পরিণত করেছে। কোনোকিছুই তাকে উৎসাহিত, আনন্দিত, আবেগঘন করে তোলে না। সে ইতিহাসের অধ্যাপিকা, অথচ রুশ বিপ্লব নিয়ে একটি বই পড়তেও তার মধ্যে আগ্রহের অভাব দেখা যায়—

> হাতের মুঠোয় একটা বই ধরা ছিল। দৃষ্টি সরানোর জন্য পাতা উলটে দেখে নিল ভেতরে কিছু আছে কি না। রুশ বিপ্লবের ওপর লেখা এই বইটা আগের দিন নিয়ে গিয়েছিল নীতীশের কাছ থেকে। পুরো পড়া হয়নি। বস্তুত, পড়ার সময় তপতী কোনো উৎসাহ পাচ্ছিল না। আগাগোড়া থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ। অথচ নীতীশ পড়েছে প্রায় অক্ষর ধরে।[২৪]

নীতীশ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষমতাবান। সে হয়তো কিছুটা অগোছালো প্রকৃতির, সামাজিক আদব-কায়দাতেও বিশ্বাসী নয় কিন্তু জীবনের ব্যবহারিক দিককে সে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে ‘পেসিমিস্ট’দের মতো বাঁচা তার ধর্ম নয়, সে কাজ করে যাওয়ায় বিশ্বাসী। তপতীর প্রায় বিপরীতধর্মী এই মানুষটি তপতীর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং আবেগপ্রবণ। ব্যবহারিক জীবন যাপন করা, দুঃখকে জয় করে এগিয়ে যাওয়ায় বিশ্বাসী নীতীশও তপতীকে বিদায় জানানোর আগে নিজের শক্তিমান, ক্ষমতাবানের খোলসটি ছেড়ে আবেগঘন কোমলতায় সিক্ত অন্তরের রূপটি তপতীর সামনে উপস্থিত করে—

'আজ মনে হচ্ছে, আমি খুব দুর্বল হয়ে গেছি।' নীতীশ বলল, অনেকক্ষণ পরে, 'আগে কখনো এ-রকম হয়নি। আগে মা ছিলেন, তিনিই ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। আজকে দুপুরে হঠাৎ মনে হল, কী আশ্চর্য, এত চেনাজানার মধ্যে এমন কেউ কি নেই, আমি দূরে যাচ্ছি ভেবে সে কাতর হতে পারে?'

নীতীশের গলা ভারাক্রান্ত, কিছুটা আবেগ মেশানো।[২৫]

তপতী নীতীশের এই অভাবনীয় আত্মপ্রকাশের পরেও তার সামনে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারেনি। আসলে সে একা, কারণ দীর্ঘকালীন একাকিত্বের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকায় সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবেগের সততা নিয়ে স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করতেও সে ভয় পায়। তাছাড়া প্রেম বা নারী-পুরুষের সম্পর্কের মতো গভীর আবেগে জড়িয়ে পড়বার ক্ষেত্রেও একটা অব্যক্ত ভীতি কাজ করে তপতীর মধ্যে। আত্মবিশ্বাসও তার একেবারেই নেই। সে আসলে নিজের ক্ষুদ্রতা, দীনতা নিয়ে নিজের খোলসের মধ্যে থেকে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তাই বারবার নীতীশের আবেগময় স্বীকারোক্তির সামনে হয় সে নিশ্চুপ থেকেছে নতুবা প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে। নীতীশ যখন শেষপর্যন্ত বিদেশে পাড়ি দেয়, তারপর সে নীতীশের ব্যক্তিত্ব এবং আবেগের গুরুভার মুক্ত হয়ে স্বস্তিতে বুক ভরে শ্বাস নেয়। নির্ভার, নিষ্ক্রিয় দীনতার বৃত্তে প্রবেশ করে দুঃখ-বিলাস করার অভ্যাস তাকে নিশ্চিন্ত করে।

তপতীর পাশাপাশি আরও কিছু মেয়ের জীবনের আভাস পাওয়া যায় এই উপন্যাসে, যাদের মধ্যে অধিকাংশই অবিবাহিত কর্মরত যুবতী, কেউ বিধবা, কেউ বা বিবাহোন্মুখ। অগভীর ভাসমান এই চরিত্রগুলির কোনও পূর্ণাঙ্গ পরিণতি উপন্যাসে নেই। তারা প্রত্যেকেই যেন উপন্যাসের একঘেয়ে, মন্থর গতিসম্পন্ন অসহায়তার সুরটিকে জিইয়ে রাখার জন্য মাঝেমধ্যে আসে-যায় কিন্তু কোনও জোরালো প্রভাব ফেলে না। প্রথমে

তপতীর মেস ‘নষ্টনীড়ে’র অন্যান্য বাসিন্দাদের কথায় আসা যাক। সেখানে রয়েছে রত্না, অঞ্জলি, নীলা, সাবিত্রী, বাসন্তী, রিনা, মন্দিরার মতো কয়েকজন স্বাবলম্বী স্বাধীন মেয়ে।

রত্না তপতীর সমবয়সী এবং তার কলেজ জীবনের বন্ধু। তার সূত্রেই তপতী নষ্টনীড়ে আসে এবং রেণুবালা নামের একটি মেয়ের ছেড়ে যাওয়া সিটটা পায়। রত্না অত্যন্ত প্রগলভ, কথায় কথায় রসালাপ, ফোড়ন কাটা তার স্বভাব। তার এই স্বভাব কখনো-কখনো আসর মাতিয়ে রাখে, কখনও অন্যান্যদের অপ্রস্তুতে ফেলে দেয়। তপতীর মতো সব বিষয়ে বিষণ্নতা, ঔদাসীন্য তার স্বভাবে নেই। কিন্তু রত্নার এই উচ্ছ্বাস, যৌন রসালাপ, ইয়ার্কি-ঠাট্টার বাড়াবাড়ি সবটাই বাহ্যিক আবরণমাত্র। অন্তঃকরণে সে অত্যন্ত বিষণ্ন এবং জীবনের প্রতি আস্থাহীন। তপতীর সঙ্গে রত্নার কথোপকথন সূত্রে কয়েকবার জানা যায়, সে তার দাদা মিলনের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত কারণ রত্নার দাদা তার এবং তার মায়ের দায়দায়িত্ব মাথা থেকে ঝেড়ে নিজের সংসার নিয়ে আলাদা থাকে, অল্পবিস্তর মদ্য পানও করে। সেই সূত্রে এটাও বোঝা যায় যে মিলনের প্রতি তপতীর এককালে একটা আলগা দুর্বলতা কাজ করত। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির জন্য রত্নাকে একবার অন্তর থেকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখা গেলেও আবার অপূর্ণতার করুণ বৃত্তে ঢুকে পড়তে তার দেরি হয়নি। ত্রিশের কাছাকাছি বয়স হওয়া সত্ত্বেও সে যে এখনও পুরুষের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত, খুব সম্ভবত সেটাই তার অপূর্ণতার প্রধান কারণ। শীতের রাতে তপতীকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরা, কথায় কথায় যৌন রসালাপ ইত্যাদির মধ্যে রত্নার এই মানসিক দৈন্যটাই প্রকাশিত হয়। বয়সোচিত যৌন চাহিদাকেও সে গোপন রাখতে পারে না, তার নানা আচার-আচরণ এবং ঠাট্টা-তামাশার মধ্যে সে সব চাহিদা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। কলেজে পড়াকালীন রত্না একজনের প্রেমের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়, তা নিয়ে তার আফসোসের অন্ত্য নেই—

'সেদিন সিনেমা দেখতে গিয়ে দেখা হল।' রত্না দম নিল। 'যাকে বিয়ে করেছে সে আমার চেয়ে ঢের ভালো দেখতে। মেয়েটি অঞ্জলির পরিচিত।'...'বিশ্বনাথ আমাকে ভালোবেসেছিল। আমি ওকে অপমান করেছি, ওকে নিয়ে হাসাহাসি করেছি। এখন মনে হয় মস্ত বড়ো ভুল হয়ে গেছে। বিশ্বনাথ বিরাট চাকরি করছে। আমাকে দেখে চিনতে পারল না।'[২৬]

বিশ্বনাথকে রত্না কোনও এককালে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছে এবং তা নিয়ে পরবর্তীকালে তার মধ্যে গ্লানি তৈরি হয়েছে, সেটা একজন শুভবোধসম্পন্ন মানুষেরই লক্ষণ। কিন্তু বিশ্বনাথের খুব বড়ো চাকরি এবং তার স্ত্রী রত্নার চেয়ে বেশি সুন্দর এই দুটি ভাবনাকে ঘিরে রত্নার আফসোসের উদ্ভাবনা বুঝিয়ে দেয় চাকরি, স্বাধীন জীবন-যাপন রত্নাকে কেবল আর্থিক স্বাধীনতাটুকুই দিয়েছে। মানসিক দিক থেকে সে পিতৃতন্ত্রের ভারি শেকল বহন করে চলেছে বলেই অর্থ-উপার্জনের মানদণ্ড দিয়ে সে এখনও পুরুষের মূল্যায়ন করে এবং রূপ-সৌন্দর্যের মাপকাঠি দিয়ে ভালো মেয়ে-খারাপ মেয়ের মান নির্দিষ্ট করে। তাছাড়া বিবাহের সমাজ-নির্দিষ্ট বয়স অতিক্রম হয়ে যাওয়ার আক্ষেপ রত্না এবং তপতী দুজনেরই কথা-বার্তা, চিন্তায়-ভাবনার অন্যতম স্থির বিশেষত্ব। পরিচিত কারুর বিয়ে হলে নিজের বিয়ে না হওয়ার বিষণ্ণতা এবং বিয়ে করবার দুর্বার বাসনা যুগপৎ আরও প্রবলভাবে কাজ করে রত্নার মধ্যে—

...'বুঝলি তপু, সারা রাত ভেবে ঠিক করে ফেললাম।'

'কী?' রত্নার কথায় কৌতুকবোধ করল তপতী।

'কী আবার! বিয়ে! একদিন প্রত্যুষে চোখ খুলে প্রথম যাকে দেখবি তাকেই বিয়ে করবি।'[২৭]

কখনও ইয়ার্কির ছলে, কখনও দুঃখ করে বলা রত্নার এই কথাগুলি যে তপতী খুব সহানুভূতি নিয়ে শোনে তা নয়, পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তপতী বিরক্তিই প্রকাশ করে।

রত্না-তপতীর মধ্যেকার বন্ধুত্বের আদান-প্রদানটুকুও তাদের স্বভাবের মতো পলকা এবং অগভীর।

নষ্টনীড়ের আরেক ভাড়াটে অঞ্জলিকে উপন্যাসে প্রাথমিকভাবে হাসি-খুশি, প্রাণোচ্ছল একটি মেয়ে হিসেবে পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় তার জীবনে নেমে এসেছে গভীর দুর্যোগ। সে নীলার সঙ্গে একই ঘরে থাকত এবং তারা দুজনেই রত্না ও তপতীর থেকে বয়সে সামান্য ছোটো। একসঙ্গে একই কক্ষে থাকা এই দুটি মেয়ের জীবনের কক্ষপথ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে যায়। একদিকে শান্ত, ঘরোয়া, গোছানো স্বভাবের নীলা তার বাড়ি থেকে দেখা পাত্রকে বিয়ে করে টি-টেস্টারের গৃহিণী হিসেবে দিব্যি মানিয়ে-গুছিয়ে নেয়। যে নীলা মেসের সবার রান্না-বাড়া, বাজার-ঘাটের দায়িত্ব এক হাতে সামলাত, যে মেস ছেড়ে চলে যাওয়ার দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়ে, সেই নীলাই বিয়ে করার ক-দিন পর যখন মেসের পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে, তখন দেখা যায় নতুন জীবনের সুখে নীলা যেন আরও ভরন্ত হয়ে উঠেছে। যাদের ছাড়া নীলার একটি দিনও চলত না, বিয়ে হওয়ার মাত্র দিনকয়েক পরেই তাদেরকে তার জীবনে তো বটেই, তার বিয়ের অ্যালবামে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেও আর দেখা যায় না। নীলা আসলে সামাজিক মাপে গড়া তথাকথিত ‘লক্ষ্মী মেয়ে’ এবং সেইজন্যই যেকোনো সংসারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তার খুব বেশি সময় লাগে না।

অন্যদিকে, অঞ্জলি একজন প্রতারকের পাল্লায় পড়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। সেই প্রতারক প্রেমিকের হদিস না পেয়ে অসামাজিক উপায়ে বাচ্চা নিকেশ করতে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। শুধু নিজের আর্থিক জোর আছে বলেই সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া অঞ্জলির মতো সাধারণ মেয়ের পক্ষে একা বাচ্চার জন্ম দেওয়া এবং তাকে মানুষ করা ষাটের দশকে

সম্ভব ছিল না বললেই চলে। হয়তো অঞ্জলি বাঁচতে চেয়েছিল, ফিরে পেতে চেয়েছিল জীবনের বিচিত্র স্বাদগুলোকে কিন্তু পিতৃতন্ত্রের নিয়ম মেনে একজন পুরুষের অন্যায়ের দায়ভার নিয়ে তাকে জীবন থেকে চিরতরে নির্বাসিত হতে হয়। আশ্চর্যের বিষয়, মেসের এক বাসিন্দা নার্স সাবিত্রী অঞ্জলিকে অসামাজিক উপায়ে বাচ্চা নিকেশ করার রাস্তা দেখিয়েছিল বলে রত্না থেকে শুরু করে মেসের অন্যান্য বাসিন্দারা সাবিত্রীর ওপর আক্রোশ দেখাল, পুলিশও তাকে জেলের ঘানি টানাল, অথচ কেউ একটি বারের জন্যও অঞ্জলির প্রতারক প্রেমিককে সামাজিক কীট হিসেবে চিহ্নিত করল না। সে-ই যে আসল কালপ্রিট এবং সাবিত্রীর পরিবর্তে তাকেই যে গারদে ভরা উচিত সে কথা কারোর একবারের জন্যও মনে হল না।

সাবিত্রীকে মেসের কেউই সুনজরে দেখত না। তাকে মেসে নিয়ে এসেছে মেসের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য বাসন্তী এবং সেই সাবিত্রীর সঙ্গে যা কথা বলার বলত। সাবিত্রীর প্রতি বাসন্তীর প্রচ্ছন্ন স্নেহও ছিল বলে আন্দাজ করা যায়। সাবিত্রী কাউকে কিছু না বলে মেস ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, সাবিত্রীর অভব্যতা নিয়ে যখন সবাই প্রশ্ন তোলে, বাসন্তী স্পষ্টতই সাবিত্রীর পক্ষ নিয়ে জানায়, সে মেসে ঝি-চাকরের মতো থাকে। তার সঙ্গে কোনোরকম সংযোগ রাখা দূরের কথা, তাকে বাকিরা কেউ কোনোদিন পাত্তা দেয়নি এবং এই দুর্ব্যবহারের জন্য তার পক্ষে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সাবিত্রীর চরিত্র আগাগোড় রহস্যাবৃত, এমনকি তার সরাসরি কোনও উপস্থিতিও উপন্যাসে নেই। মেসের অন্যান্যদের কথাবার্তার সূত্রে জানা যায়, সে সম্ভবত নার্সের ডিউটি করে এবং সেইজন্য তার কাজের বাঁধাধরা কোনও সময় নেই। আগে সে হাসপাতালে কাজ করত, সেটা ছেড়ে ভাড়াটে নার্স হিসেবে কাজ করার দরুন মাসের অর্ধেক দিন তার কাজ থাকত না। সে প্রায়ই রাতে বাড়িতে থাকত না, ভোরবেলা তাকে

গাড়ি করে কেউ মেসের সামনে নামিয়ে দিয়ে যেত। তবে সকলেরই স্থির বিশ্বাস ছিল, সে নার্সের ডিউটির নামে কোনও অবৈধ, অশালীন কাজের সঙ্গে যুক্ত। তার খাটের পাশে সিগারেটের টুকরো পাওয়া যায় এবং প্রমাণিত হয় সে ঘরে ছেলে ঢোকায়। হয়তো সাবিত্রী তথাকথিত ভদ্র মেয়ের দলে পড়ে না এবং সেই কারণে তাকে অপছন্দ করার মধ্যে কোনও সমস্যা নেই। সেক্ষেত্রে তাকে পরিষ্কারভাবে মেস ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলা যেতে পারত কিন্তু তা না করে কারণে-অকারণে তাকে নিয়ে মেসের অন্যান্যদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাশা, বিদ্রূপ করার প্রবণতা, তার প্রতি প্রকাশ্যে অবহেলা, ঘৃণার প্রকাশের মধ্যেও শালীনতার অভাব চোখে পড়ে।

বাসন্তী মেসের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য। বারো বছর আগে বিয়ের মাত্র তিন বছর কাটিয়ে ছেলে কোলে বিধবা হয় সে। তার ছেলে মামাবাড়িতে থেকে পড়াশুনো করে এবং তার সঙ্গে দেখা করতে সে মাঝেসাঝে সেখানে যায়। বৈধব্যের পর তার ছেলের আর্থিক দায় তার বাপের বাড়ির লোকজন নিলেও বাসন্তীর দায়দায়িত্ব তার শ্বশুরবাড়ি বা বাপের বাড়ির কেউই নেয়নি। সম্ভবত সেইজন্যই বাসন্তীর এই মেস-যাপনের বন্দোবস্ত। অল্প বয়সের আকস্মিক আঘাত, সমাজ-কর্তৃক রূঢ় প্রত্যাখ্যান বাসন্তীর চরিত্রে নানা ধরনের অসঙ্গতি তৈরি করেছে। দীর্ঘদিন একা কাটিয়ে মাঝ-বয়সে পৌঁছে সে যে মধ্য-বয়সের সংকটে ভুগছে, তা তার আচরণে সুস্পষ্ট। সে কখনও মেসবাসী কোনও যুবতীর নাইটি চুরি করে সে সব পরে দেখে, পরে নিজেই ফেরত দেয়, কখনও নিজের দুঃখের কাহিনি বারবার অন্যদের শুনিয়ে, অতীতের প্রসঙ্গ টেনে হেসে-কেঁদে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে, কখনও অল্প বয়সী মেয়েগুলোকে শাসন করতে গিয়ে অপ্রয়োজনীয়, অশালীন মন্তব্য করে বসে। সমাজের রূঢ়তার ভার কাঁধে নিয়ে মাঝ-বয়সে উপনীত হয়ে তার অনেক রকম পরিবর্তনই হতে পারত, সে আরও উদার, আরও স্নেহশীল, আরও উদাসীন হয়ে উঠতে

পারত কিন্তু বাসন্তীর ক্ষেত্রে ঘটেছে তার বিপরীত। পিতৃতন্ত্রের ঝাঁঝে সিক্ত হয়ে সে আরও পিতৃতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। সে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে যে ধরনের বশ্যতা, শ্রদ্ধা মেসের অন্যান্যদের কাছ থেকে চায়, তা তো পায়ই না, উপর্যুপরি একটা বিরক্তি এবং অবজ্ঞা করার মনোভাব নিয়ে সকলে তার সঙ্গে দিন কাটায়। 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' মনোভাব থেকে সে 'অবজেকশনেবল' কথা বলে বসে—

> 'এতো জায়গা থাকতে এখানে কেন এলি বাপু? দেখছিস তো ধিঙ্গি মেয়েগুলোকে, একটারও বিয়ে হয় না। হবেও না কোনো কালে।'[২৮]

কেবলমাত্র সাবিত্রীর প্রতি সে খানিকটা দুর্বল তবে, সেটা সম্ভবত সাবিত্রীকে সে নিজে মেসে নিয়ে এসে যে গোল বাঁধিয়েছে, সেই অসঙ্গতি ঢাকবার প্রচেষ্টা।

মেসের আরও দুজন সদস্য, রিনা এবং মন্দিরা প্রায় সমবয়সী। সুন্দরী হিসেবে খ্যাত বলে রিনার অহংকার এবং মেজাজ দুটোই অন্যান্যদের তুলনায় বেশি। রেগে গেলে তার লঘু-গুরু, স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান থাকে না। ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনো করার ফলে সে বেশ স্মার্টনেস নিয়ে ইংরেজি শব্দবহুল চোখা-চোখা মন্তব্য করে থাকে। তপতীর চোখে সে স্বচ্ছ এবং স্পষ্টবাদী, তাই যখন যা ভাবে তাই বলে বসে। কিন্তু স্পষ্টবাদী হওয়া এক জিনিস, আর অন্যকে আঘাত করে কথা বলা আরেক জিনিস, সে খেয়াল রিনার প্রায়ই থাকে না। বরং বলা যেতে পারে, রিনা খুবই চঞ্চল এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশি প্রতিক্রিয়াশীল। মন্দিরা প্রায় সময়ই রিনার তালে তাল মেলায়। তারা সমভাবাপন্ন, তাছাড়া মন্দিরার চরিত্রের আর কোনও বিশেষত্ব চোখে পড়ে না। এরা প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে কিন্তু মানসিকভাবে সম্পূর্ণরূপে পিতৃতন্ত্রের অধীন। অবিবাহিত অথবা বিধবা মেয়েগুলি বিশ্বাস করে, পুরুষবিহীন তাদের এই জীবন নিরর্থক। তাদের জীবন

‘নষ্টনীড়’র মধ্যে স্থবির হয়ে ক্রমশ পচনের দিকে যাচ্ছে। কোনও কাজই এখানে সুষ্ঠুভাবে হওয়ার জো নেই, এই আক্ষেপ রয়েছে প্রায় সকলের মধ্যে। নষ্ট হয়ে যাওয়া এই নীড়টির ছত্রছায়া থেকে কোনোক্রমে বেরিয়ে ভালো ঘরে বিয়ে হবে অথবা ভালো বর পাবে, এমনটাই যেন সকলের গোপন বাসনা।

এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রগুলির বিশেষত্বহীন একঘেয়েমির বাইরে একটি মাত্র চরিত্র, তপতীর কলেজের সহকর্মী অধ্যাপিকা দেবিকা সমকালীন ভাবধারার থেকে অনেকটা এগিয়ে একটু অন্যরকম, নিজস্ব ভাবনা-চিন্তায় উজ্জ্বল। সে তপতীর প্রতি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট কমলাদির প্রকাশ্য অপমানজনক আচরণের প্রতিবাদ করে এবং যেকোনো বিষয়ে সৎভাবে নিজের বক্তব্য পেশ করতে ভয় পায় না, কুণ্ঠাবোধ করে না। *মধ্যরাত* উপন্যাসের সমস্ত মহিলা একদিকে, আর দেবিকা আরেকদিকে, সেটা পুরুষ বিষয়ে তার চিন্তা-চেতনার নমুনা তুলে ধরলেই বোঝা যাবে—

> ‘পুরুষমানুষ না হলে আমাদের চলে না, বুঝলি’, রত্না বলল, ঈষৎ আচ্ছন্ন ওর গলার স্বর, ‘মাঝে মাঝে এত হেল্পলেস মনে হয়!’
>
> ‘হঠাৎ!’
>
> ‘হঠাৎ নয়। ভেবে দেখ, আমরা কটি মেয়ে এখানে আছি তো, কোয়াইট অ্যাডাল্ট। কিন্তু দরকারের সময় কিছুই করার নেই, বসে থাকো হাত-পা গুটিয়ে। একজন পুরুষমানুষ থাকলে এতক্ষণে ছুটোছুটি করতে পারত, অন্তত একটা উপায় খুঁজে বার করত।’
>
> তপতী উত্তর দিল না। রত্না নতুন কিছু বলেনি। ভয়াবহ এই অসহায়তা; শুধু আজ বলে নয়, দীর্ঘদিন ধরে তপতী তা অনুভব করেছে, করছে।
>
> কলেজে একদিন এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। ‘তোমরা যাই বল’, দেবিকা বলেছিল, ‘সেক্স ছাড়া ওদের সঙ্গে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যান্য ব্যাপারে এখন আমরা নিজেদের ওপর

> ডিপেন্ড করতে পারি।' মীরাদি শুনে হেসেছিলেন। 'তুমি এখনও কচি আছো, দেবিকা। আরও বয়স বাড়ুক, ব্যাপারটা টের পাবে। আমাকে দ্যাখো, তিন ছেলের মা—সেক্স-টেক্স তোমাদের ওসব মর্ডান ব্যাপারের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। চাকরি করি, শরীরও ভালো, কিন্তু নিজের ওপর ডিপেন্ড করার কথা এখনো আমি ভাবতে পারি না।'[২৯]

দেবিকার কথা উপন্যাসে প্রায় নেই বললেই চলে। তাই তার কার্যকলাপ বিচার করে তার ভাবনা-চিন্তার জোর কতখানি তা বলা মুশকিল। কিন্তু স্বল্প পরিসরে সে বুঝিয়ে দিয়েছে, আর পাঁচটা মেয়ের থেকে সে আলাদা, সাহস এবং স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তপতীর কলেজের সহকর্মীদের এবং তপতীর মেসের প্রায় প্রত্যেকের আচরণেই আত্মকন্দ্রিকতা এবং লঘুতা ছাড়া আর বেশি কিছু চোখে পড়ে না। এমনকি, *মধ্যরাত* উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র তপতী হলেও তার তুলনায় দেবিকা পাঠককে অনেক বেশি আকর্ষণ করবার ক্ষমতা রাখে।

৪

মেয়েদের মেসবাড়ির গল্প পাওয়া যায় দিব্যেন্দু পালিতের আরও একটি উপন্যাসে—*স্বপ্নের ভিতর* (১৯৮৮)। *মধ্যরাত*-এর পর বিশ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রম করে লেখা এই উপন্যাসের মূল বিষয় *মধ্যরাত* উপন্যাসের থেকে খুব আলাদা কিছু নয়, এমনকি মুখ্য চরিত্রগুলির অবস্থান, পেশা, অতীত ইতিহাসেও রয়েছে আশ্চর্য মিল। কিন্তু বিশ বছরের রাজনৈতিক-সামাজিক পালাবদলকে আত্মস্থ করে বদলে গেছে চরিত্র-ধর্ম। চরিত্র-অঙ্কনের ক্ষেত্রেও লেখক অনেক পরিণত হয়ে উঠেছেন। এই উপন্যাসেও সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সরাসরি উল্লেখ বা চর্চা নেই। রাজনীতি থেকে বহু দূরবর্তী সাধারণ, স্বাধীন কয়েকটি মেস বাড়িতে থাকা মেয়ের গল্প *স্বপ্নের ভিতর* উপন্যাসে পাওয়া যায়। *মধ্যরাত* উপন্যাস হিসেবে যে পরিণতির দিকে এগোতে পারত, কিন্তু পারেনি, তা পেরেছে *স্বপ্নের ভিতর*। স্বপ্ন দিয়ে উপন্যাসের শুরু, স্বপ্নের আচ্ছন্নতায় উপন্যাসের শেষ। গোটা

উপন্যাসটাই যেন স্বপ্নের মতো অসংলগ্ন, খাপছাড়া প্রবাহ নিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেছে এবং পরিণতি পেয়েছে দুঃস্বপ্নের আচ্ছন্নতায়, গভীর শোকের রেশটুকু সঙ্গী করে। উপন্যাসটি পড়ার পর পাঠকের মধ্যেও তৈরি হয় বিষণ্ণ স্বপ্নের আচ্ছন্নতা এবং সেই ভাবটুকু সম্বল করেই উপন্যাসের যাত্রা ও নামকরণ। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রে উপন্যাসটি বিষয়ে বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯২৬-২০১৩) বক্তব্য স্মরণ করতেই হয়—

> সময়ের অভিঘাত নয়। সময়ের প্রবর্তিত জীবনের নতুন ছাঁদ, নতুন প্রেক্ষাপট ও পটবিধৃত চরিত্র ও তাদের সঙ্কট এ উপন্যাসে প্রধান কথা। দুটি কর্মরত জীবন জীবিকার সূত্রে নিবদ্ধ দুটি নারীর উচ্চাবচ অস্তিত্বের আবর্ত এখানে প্রধান কথা। সন্দেহ নেই এও এক বিপন্ন সীমান্তেরই কথা।[৩০]

উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র বিশাখা এবং অর্পিতা। বিশাখা বসু, বত্রিশ বছর বয়সি মা-বাপহারা, আত্মীয়হীন, নির্বান্ধব ইতিহাসের অধ্যাপিকা এবং একজন গবেষক। আপাতভাবে *মধ্যরাত* –এর তপতীর সঙ্গে তার সব বিষয়টাই মিলে যায়। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে সেও তপতীর মতো 'ওয়ার্কিং উইমেনস্ রেসিডেনসিয়াল হোম' দক্ষিণীতে বাসা বেঁধেছে তিন বছর ধরে। তপতীর সঙ্গে নীতীশের সম্পর্ক জমাট বাঁধবার আগেই নীতীশ বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য বিশাখার একজন প্রেমিক রয়েছে, সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন সময় থেকে তার ঘনিষ্ঠতা। বেশ কয়েক বছর প্রেম করবার পর উচ্চশিক্ষার জন্য সিদ্ধার্থ বিদেশে চলে যায় এবং বর্তমানে চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যমেই তাদের সম্পর্ক অভিমানের ভার জমাতে জমাতে মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশাখার মধ্যেও তপতীর মতো পুরুষমুখাপেক্ষিতা রয়েছে। তার বাবা মারা যাওয়ার পর বিষাদাচ্ছন্ন আলগা অনুভূতি নিয়ে সে মনে করেছিল, মেয়ে হয়ে জন্মানোর

আলাদা অর্থ রয়েছে। সে বিশ্বাস করে তার বাবা বেঁচে থাকলে তার জীবনটা আরও নিরাপদ হত—

> ...বাবা, বিশেষত মেয়েদের জীবনে, একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। এই যে একসঙ্গে আছে তারা—অর্পিতাকেও জড়িয়ে নিয়ে ভাবা যায়, যদি আমাদের বাবা বেঁচে থাকত, তা হলে কী হত! সম্ভবত তাদের দেখা হতো না কখনও। একটা ছাদ থাকত মাথার ওপরে, থাকত আশ্রয়, স্নেহ, দুটি সতর্ক চোখের পাহারা, নিরাপত্তা।[৩১]

বিশাখার ভাবনার ভাষায় তার মা খুব বেশি জায়গা পায়নি। কেবল সিদ্ধার্থর, অর্থাৎ তার জীবনের দ্বিতীয় পুরুষের আগমনবার্তা জানান দিতে যেটুকু লাগে, সেটুকুই, নেফ্রাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মা মারা যাওয়ার পর মাথা গোঁজবার একটা বুকের সন্ধানই তাকে ঠেলে দিয়েছিল সিদ্ধার্থর দিকে। তার থেকে মাত্র দু-তিন বছরের বড়ো সিদ্ধার্থর বুকেই সে পেয়েছিল অভিভাবকের নিরাপদ আশ্রয়, আড়াল। সিদ্ধার্থ বিদেশে চলে যাওয়ার পর একটু-একটু করে শারীরিক দূরত্বের দাপট গ্রাস করতে থাকে তাদের সম্পর্ককে। বিভিন্ন দেশের নতুন মানুষজনের সঙ্গে আলাপ, বন্ধুতা, নতুন নতুন জায়গায় ঘোরার অভিজ্ঞতা সিদ্ধার্থকে যে আনন্দ, উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা দিয়েছে, তা বিশাখার জীবনে অনুপস্থিত। সকালে ঘুম থেকে উঠে, তৈরি হয়ে কলেজে যাওয়া, কলেজের সহকর্মীদের সঙ্গে প্রয়োজনমাফিক একটু-আধটু আলাপ, সময় পেলে লাইব্রেরি যাওয়া অথবা অর্পিতার সঙ্গে সিনেমা বা চাইনিজ আস্বাদন—এই তো তার দৈনন্দিন জীবন। রোজকার এই যাপনের মধ্যে আরেকটি মানসিক অভ্যাস লেগে থাকে সবসময়, সিদ্ধার্থর দেশে প্রত্যাবর্তনের আশা নিয়ে অনন্ত অপেক্ষা। একই জায়গা, একই মানুষের ঘেরাটোপে থাকার কারণে যে ব্যাপ্তি, যে উদারতা সে অর্জন করতে পারত, যে আনন্দঘন মুক্তির আস্বাদ পেতে পারত, তা সে পায়নি। তাই সামান্য বাইরে খেতে যাওয়া নিয়েও তার মনে হয়—

এখানে সকালের জলখাবার আর রাতের খাবার কমপালসারি, না খেলেও টাকা নেবে। দুপুরে খেলে অর্ডার দিতে হয় আগে। এক দিক থেকে অবস্থাটা ভাল, ছাইপাঁশ যা-ই দিক, নিয়ম আছে বলেই গিলতে হয়। না হলে অপছন্দ থেকে খাবার জন্যে রাতবিরেতে ছুটতে হতো বাইরে। ওটা পুরুষরা পারে।[৩২]

সিদ্ধার্থ যখন চিঠি মারফত জন্মদিনের শুভেচ্ছা পাঠিয়েই দায়িত্ব সেরে ফেলেছে, নতুন বন্ধু, নতুন জায়গা আবিষ্কারের ঘোরে দেশে আর কোনোদিন না ফেরার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তখন নিঃসঙ্গতা আর মানসিক দৈন্য বুকে চেপে জন্মদিনের দীর্ঘতম রাত উপোস করে কাটিয়ে দিয়েছে বিশাখা। সিদ্ধার্থ যে আর তার একান্ত ব্যক্তিগত ভরসাস্থল নেই, সে যে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে—এই চিন্তায় ডুবে থাকতে থাকতে সে আবিষ্কার করে, তিন বছরের চিঠি চালাচালির সম্পর্কে সেও ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে আবেগের উত্তাপ—

যাকে ভালোবাসে, যার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ক্রমশ বুড়িয়ে যাচ্ছে সে, কেন তার জন্যে কিছু আবেগ, কিছু উত্তাপ শব্দ হয়ে ফুটে উঠছে না মনে![৩৩]

সিদ্ধার্থ এবং বিশাখার চিন্তা-চেতনাতেও দেখা দিয়েছে দুস্তর ব্যবধান। ঈশ্বরের প্রতি তেমন ভাব-ভক্তি না থাকলেও বিশাখা সিদ্ধার্থর জন্মদিনে কালীঘাটে গিয়ে সিদ্ধার্থর নামে পুজো দিয়ে এসেছে। অন্যদিকে, সিদ্ধার্থ বিশাখার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বন্ধু-বান্ধবদের পার্টি দিয়েছে। নতুনত্বের স্বাদে তৃপ্ত সিদ্ধার্থ নিজে ভালো আছে বলে ধরেই নিয়েছে, শিক্ষিত, স্বাধীন বিশাখাও ভালোই থাকবে—

তুমি কেমন আছ লেখোনি কিছু। ধরে নিচ্ছি ভালই আছ। থাকবে না কেন! তুমি তো পায়ে বেড়ি-পরানো অধিকাংশ বাঙালি মেয়ের মতো নও। তুমি স্বাধীন।

রিসার্চের প্রোগ্রেস কি?[৩৪]

আসলে শিক্ষা-দীক্ষা বিশাখাকে যে কেবল আর্থিক স্বাধীনতাটুকুই দিয়েছে, মানসিক মুক্তি দিতে পারেনি, তা সিদ্ধার্থ বোঝেনি। তাছাড়া সিদ্ধার্থ মানসিকভাবে বিশাখার ওপর নির্ভরশীল নয়, তাই বিশাখার অভিমান ভরা কথাবার্তা নিয়ে সে এত তলিয়ে ভাবেনি। বিশাখা যে তার ওপর মানসিকভাবে নির্ভর করে, তাকেই পরম-আশ্রয় ভেবে বসে আছে, সেটুকুও নিজের সাফল্যমণ্ডিত আত্মসর্বস্বতায় মত্ত সিদ্ধার্থর চোখে ধরা পড়েনি। যত দ্রুত সম্ভব কাজ সেরে সিদ্ধার্থ দেশে ফিরবে এবং বিশাখার সঙ্গে বিয়েটা সেরে নেবে, এটাই বিশাখার একমাত্র স্বপ্ন। সেই অপেক্ষাতেই সে দিন গোনে। ভাবাবেগের উত্তেজনা, ভালোবাসার রস ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে তার নিজের মধ্যেও। গভীর অভিমানের কারণেই হোক বা যথাযথ আশাব্যঞ্জক প্রতিদান সিদ্ধার্থর কাছ থেকে না পাওয়ার কারণেই হোক, সে নিজেও যে ভালোবাসার ভাষা হারাচ্ছে, সেটুকু টের পাওয়ার পরেও সে সিদ্ধার্থর মতো জীবন সম্পর্কে নতুন কোনও সিদ্ধান্ত নিতে নারাজ। বিশাখা বুঝতে পারে, তার সহকর্মী তমাল ব্যানার্জীর তার প্রতি দীর্ঘদিনের মুগ্ধতা এবং আবেগ কাজ করে। সেও তমালকে শ্রদ্ধা করে, কিছুটা পছন্দও হয়তো করে। অথচ তমাল ব্যানার্জীর মতো বুদ্ধিমান, মোটামুটি সুদর্শন, পড়াশুনোয় তুখোড় এবং খ্যাতনামা অধ্যাপকের সুস্পষ্ট দুর্বলতাকেও সে পাশ কাটিয়ে যায়। মেয়ে হিসেবে রক্তাক্ত বুক নিয়ে ধৈর্য ধরে একজন পুরুষের জন্য অপেক্ষা করাই যে তার একমাত্র ভবিতব্য, এবং আর্থিকভাবে সুদৃঢ় জায়গা করে নেওয়ার পরও সনাতনী পদ্ধতিতে লাভ করা অদৃশ্য বেড়ি মনে বেঁধে রাখতে হবে, এই তার বিশ্বাস। তাই সনাতন বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সিদ্ধার্থ যে নতুনত্বের অভিজ্ঞতার কথা বিশাখাকে জানায়, তাতে বিশাখা আরও বেশি করে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে—

> ‘ওরা ফেলে দিতে অভ্যস্ত’, কত স্বচ্ছন্দে লিখেছে কথাগুলো! তুমিই কি আমেরিকান হয়ে গেলে সিদ্ধার্থ, পুরনো মায়া ভুলতে নিজেকেও রেনোভেট করে ফেলেছ! নাকি পোলিশ, গ্রিক, কিউবান,

কোরিয়ানদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছ নিজেকেও! পাকা কলা আর শুয়োরের মাংসের সঙ্গে নুডলস্ চিবোতে চিবোতে কেমন সুন্দর ভাবে আমার পায়ের বেড়ি খুলে স্বাধীন করে দিলে আমাকে! ভুলে গেছ কি কোনও দিন ঠোঁটের স্বাদ নিতে নিতে কী বলেছিলে তুমি! জোর করা ইচ্ছে থেকে বুকে মুখ রেখেও সরিয়ে নিয়েছিলে নিজেকে; আমার লজ্জা, ভয় আড়াল করতে করতে বলেছিলে, 'তোমার চেয়ে বেশি ভয় তো আমিই পাচ্ছি—মনে হচ্ছে বিশাখাও নও, নারী নও, তুমি এক অচেনা মহাদেশ, খুঁজতে গেলে হারিয়ে ফেলব নিজেকে!' কী হল, কোথায় হারিয়ে গেল তোমার সেই মহাদেশ! মন থাকলে বুঝতে বেড়িটা ঠিক কোথায়, কেন কেউ সেটা খুলতে চায় না, দাগে দাগে রক্ত ও জ্বালা দগদগে হয়ে উঠলেও না![৩৫]

যে মানসিক মুক্তি বিশাখাকে সিদ্ধার্থর প্রতি প্রেম দিতে পারেনি, তা দিয়েছে অর্পিতার সঙ্গে বন্ধুত্ব। এখানেই তপতীর থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়ায় বিশাখা। অর্পিতা এবং তার আদরের 'বিশু মাস্টার' একে অপরের প্রতি বন্ধুত্বের গভীরতায় ডুব দিয়ে মানসিক উত্তরণের পথ খুঁজে পায়। তপতীর সঙ্গে তার কলেজ জীবনের বন্ধু এবং রুমমেট রত্নার সেরকম গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হওয়ার অবকাশ ছিল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ রত্না অর্পিতার মতো উন্মুক্তমনা, দৃঢ় মনের মেয়ে নয়।

অর্পিতা মজুমদার, বয়সে বিশাখার চেয়ে এক-আধ বছরের ছোটো, দুরন্ত স্মার্ট, যৌবনের লালিত্যে ভরপুর আকর্ষণীয় এই মেয়েটি স্টুয়ার্ট মর্গান নামের একটি বাণিজ্যিক সংস্থায় কনফিডেন্সিয়াল সেক্রেটারির কাজ করে। সে যে কেবল যৌবনের আশীর্বাদ-প্রাপ্ত তা নয়, যৌবন সম্পর্কে রীতিমতো সচেতন। স্বাস্থ্য ধরে রাখার জন্য সে নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করে, ইংরেজি বিদ্যায় শান দেওয়ার জন্য নিয়মিত স্টেট্স্‌ম্যান পড়ে, ফেমিনা ঘাঁটে। আয়ান ফ্লেমিং এবং জেমস হেডলি চেজের মতো লেখকদের রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসের নিয়মিত পাঠিকা এই মেয়েটি নারী-স্বাধীনতা নিয়ে রীতিমতো ভাবনা-চিন্তা করে। একটি বিলিতি ম্যাগাজিনে সিমন্‌সের লেখা একটি প্রবন্ধে সে পড়ে, ঈশ্বর মেয়েদের

তৈরি করেছে একটি বন্ধ ঘরের তালার মতো করে, আর চাবি দিয়েছে পুরুষদের হাতে। ঘরের মধ্যে কী আছে তা মেয়েরাও জানে, অনুভব করে কিন্তু তা পরিতৃপ্তির পূর্ণতা লাভ করে ঘর খুলে দেখানোর পর। এই বিষয়টা তাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে কারণ, এই বিষয়টি এক অন্যরকম তাৎপর্য পায় তার ব্যক্তিগত জীবনে। অর্পিতা যেমন আর্থিকভাবে কারুর উপর নির্ভরশীল নয়, তেমনি মানসিকভাবেও কারও মুখাপেক্ষী নয়। শরীর বিষয়েও তার কোনও ছুঁতমার্গ নেই। শরীর, মন, চিন্তা-চেতনা সমস্ত বিষয়েই সে সম্পূর্ণভাবে স্ব-অধীন। আত্মসচেতন এবং আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন এই মেয়েটির প্রতি বিশাখার একটা প্রচ্ছন্ন মুগ্ধতা রয়েছে—

> বিশাখা অর্পিতাকে দেখছিল। এটাই ওর ধরন; যেন সব সময়েই দাঁড়িয়ে আছে স্টেজে। এক একদিন নাইটি পরে শোয় ও, তখন একরকম লাগে, আজ আর একরকম লাগছে। মাপা স্বাস্থ্য। লম্বা, টান টান চেহারায় যৌবন যেমন, তেমনি ওর ঈষৎ লম্বাটে মুখ, বড়ো পাতার চোখ, ওপর-তোলা নাক ও পুরু ঠোঁটদুটিতে এমন এক আকর্ষণ আছে যার সঙ্গে শরীরের সম্পর্কই বেশি। তেমনি উচ্ছ্বলও। কখনও সখনও একটু মুডি হয়ে পড়ে, এই যা।...খসখসে গলা, কথায় কথায় ইংরিজি বলে, বলার ব্যাপারে লুকোছাপি নেই, একটু বা ঠোঁটকাটা। তবে, বিশাখা যেটুকু বোঝে, মনটা সাচ্চা, স্বাধীন।[৩৬]

ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে সাতাশ বছর বয়সে অর্পিতা যে কারণে নিজের দায়িত্ব নিজে নিয়ে মেসে এসে উঠেছিল, সেই কারণটিও তার প্রতি সমীহ জাগায়। সাতাশ বছর বয়স হওয়ার পর অর্পিতার বাড়ির লোকজন তার বিয়ের জন্য দেখাশুনো শুরু করে, বেশ কিছু সম্বন্ধও আসতে থাকে। কিন্তু অর্পিতার তখনও মনে হতো, মনের মতো মানুষ না পেলে যাকে-তাকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। শেষমেশ তার বৌদির এক দূর-সম্পর্কের মামাতো ভাই চিরজিৎ বিশ্বাসের খবর আসে। তার বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ,

তবে বিবাহযোগ্য পাত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির বিচার করতে বসলে তাকে সমাজ বেশ চটকদার লোভনীয় পাত্র হিসেবেই গণ্য করবে। কারণ সে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া, বিলেত-ফেরত লোক, তাছাড়া পার্টনারশিপে কন্সালটেন্সি ফার্ম চালায়। নিউ আলিপুরে বাড়ি, থাকার মধ্যে বুড়ো বাপ আর একটি মাত্র বোন ছাড়া তার আর কেউ নেই। বয়স যথেষ্ট বেশি, তাছাড়া চেহারায় চটক ছিল না, তবে পুরুষালি ভাব ছিল আর তার চেয়েও বেশি যেটা ছিল, সেটা হল 'সিকিউরিটি'। বয়সজনিত পরিণতমনস্কতা আর নিরাপত্তার কথা ভেবেই দোমনাভাবে বিয়েতে রাজি হয়ে যায় অর্পিতা। বিয়ের কার্ড পর্যন্ত ছাপা হয়ে যায় কিন্তু বিয়ের মাত্র পঁচিশ দিন আগে বিয়েটা ভেঙে বেরিয়ে আসে অর্পিতা। বিয়ের আগে একবার একান্তে সাক্ষাৎ করে একে-অপরকে খানিক জেনে নেওয়ার অছিলায় চিরজিৎ অর্পিতাকে 'দা ডিপ' নামের একটা ইংরেজি ছবি দেখাতে নিয়ে যায় এবং হলের অন্ধকারে তার সঙ্গে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা তৈরি করার চেষ্টা করে। রাস্তায় ঘুরে বা রেস্তোরাঁয় মুখোমুখি বসে গল্পগাছা করে একে-অপরকে জানার চেষ্টা করতে পারত চিরজিৎ। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা রচনার মাধ্যম হিসেবে মনের জায়গায় শরীরকে বেছে নেওয়ার আকস্মিকতায় অর্পিতা ঘৃণায় নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আত্মসম্মানবোধ যে তার কতখানি প্রখর, তা তার বিয়ে বিষয়ক সিদ্ধান্ত অনেকটাই প্রমাণ করে। নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার সাময়িক লোভ তাকে পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়ার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বাধীন মন সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরম প্রিয় একমাত্র দাদার সঙ্গে মন কষাকষির পরও অর্পিতা হার মানেনি। তার অবস্থান ছিল দৃঢ় এবং অনড়—

> বিয়েটা ভেঙে যায়। বিয়ে ভাঙলেও অর্পিতা ভাঙেনি।
>
> ধাতস্থ হওয়ার পর ক্রমশ এক ধরনের জোর এসে গিয়েছিল মনে। দাদা ও বৌদির অস্বস্তিকর প্রশ্ন ও রাগারাগির মধ্যে দাঁড়িয়ে শুধু একটিই কথা বলেছিল সে, 'কারণ বলতে হবে কেন!

ডিসিসনটা আমার। লাইফ, ফিউচার—এগুলোও। এর সঙ্গে তোমাদের মান-সম্মানের কী সম্পর্ক!'

দাদা বলেছিল, 'কার্ড ছাপানো হয়ে গেছে! অনেককেই জানানো হয়ে গেছে!'

'এগুলোই তোমার মান-সম্মান!'

উপযুক্ত জবাবের অভাবে খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল দাদা। অবশ্যই ক্ষুব্ধ। পরে বলেছিল, 'তা হলে কি কেরিয়ার গার্ল হয়েই থাকবে!'

'দরকার হলে থাকব।'

'তা হলে আমাদের সঙ্গে নয়—'[৩৭]

দাদার পিতৃতান্ত্রিক অহমিকাবোধ এবং আগ্রাসনের কাছে হার স্বীকার করেনি অর্পিতা। অফিসের সহকর্মী মিতা মল্লিকের মাধ্যমে কর্মরত মহিলাদের থাকার বোর্ডিং দক্ষিণীর খোঁজ পায় এবং সত্বর দাদা-বৌদি ও কোণঠাসা হয়ে যাওয়া অসহায় মাকে ফেলে দক্ষিণীতে গিয়ে ওঠে।

জীবনের প্রাথমিক বিপাক কাটিয়ে উঠে দক্ষিণীতে শুরু হয় তার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। বাড়ির সঙ্গে কোনরকমে ক্ষীণ যোগাযোগ রেখে স্বেচ্ছায় বেছে নেয় স্বাধীন জীবন, কিছু সংসার-বিচ্ছিন্ন স্বাবলম্বী নারীর সঙ্গ, আর ভালোবাসার মানুষ। অর্পিতা প্রেমে পড়ে তার অফিসের বস বিবাহিত অনুপ রায়ের। কিন্তু এক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়ে থাকে, কর্মক্ষেত্রে সহজে সাফল্য লাভ করার জন্য উচ্চপদস্থের সঙ্গে প্রেম বা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার প্রবণতার মতো রুচিহীন প্রবৃত্তির সঙ্গে অর্পিতার অনুভূতিকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। সে রীতিমতো অনুপ রায়ের কর্মদক্ষতা, বুদ্ধির ধার, সব মিলিয়ে চাবুক ব্যক্তিত্বের প্রতি মুগ্ধ এবং শ্রদ্ধাশীল। পাঁচ দিনের জন্য অনুপের সঙ্গে হায়দ্রাবাদে ট্যুরে

গিয়ে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও গভীর হয়। মিতভাষী, ব্যক্তিত্ববান, গম্ভীর প্রকৃতির মধ্যবয়স্ক অনুপও একটু আলাদা নজরে দেখেছিল অর্পিতাকে। অর্পিতার প্রতি গভীর দুর্বলতা অনুভব করেই অর্পিতার সঙ্গে সম্পর্কে এগিয়েছিল সে এবং এই কারণেই সে সততার সঙ্গে নিজের স্ত্রী চন্দ্রার কাছে নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করে। চন্দ্রা অর্পিতাকে জানায়—

> 'আমি জানি আমি হেরে গেছি। আমি সব জানি। তোমাদের সম্পর্ক—তোমরা কতটা এগিয়েছ—। ও বলেছে। যেটা বলেনি সেটা ওর মুখ দেখেও বুঝতে পারি—'[৩৮]

আসলে ফাঁপা আবেগের জোয়ারে নেমে জল-কাদা ঘাঁটার মেয়ে অর্পিতা নয়। সে ভাবাবেগের গভীরতা চেনে, অপেক্ষা করতে জানে। সমাজের নীতি-নৈতিকতার চোখ দিয়ে দেখলে, ভুল সে করেছে একজন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। কিন্তু অর্পিতা তো সামাজিক চোখরাঙানির ধার ধারে না, সামাজিক নীতি-নিয়মের তোয়াক্কা করে না। সে বেপরোয়া, স্বাধীন কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল নয়। সে প্রেমে পড়ে কিশোরীর মতো উচ্ছল, চঞ্চল হয়ে ওঠে, নতুন ভাবাবেগের তোড়ে আপ্লুত হয়ে তরুণীর মতো তার বিশু মাস্টারকে (বিশাখাকে) 'আই লাভ ইউ' লেখা পোস্টকার্ড পাঠায়, আরও আদুরে হয়ে ওঠে। তবে শেষপর্যন্ত অনুপের স্ত্রী যখন 'স্ত্রীর অধিকার' চেয়ে বসে তখন সে অন্তঃসত্ত্বা হওয়া সত্ত্বেও তাকে ফিরিয়ে দেয় 'স্ত্রীর অধিকার'। কারণ সে নিজের আখের গোছানোর জন্য ভবিষ্যৎ-হীন শরীরখেলায় মাতেনি, সে ভালোবেসেছে। কিন্তু অনুপের স্ত্রী হিসেবে চন্দ্রার অসহায় আবেদন এবং আত্মমর্যাদাবোধের কাছে হার মানে অনুপের প্রতি তার ভালোবাসা। নিজের শরীরে সদ্যোজাত অনুপের বীজকে উপড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় সে। বাচ্চা নিকেশ করার সময়ও তার প্রাণ জুড়ে কঁকিয়ে ওঠে একটি প্রশ্ন—

> ...বাচ্চাটা তো আমার! ও তো কারও অধিকারে হাত বসায়নি! ওকে কেন মেরে ফেলবে! [৩৯]

কিন্তু অর্পিতা পারেনি। অন্য আরও অনেক একার লড়াই লড়তে-লড়তে একটি শিশুকে একার দায়িত্বে পৃথিবীতে আনার লড়াই সে শুরু করতে পারেনি। আশি-নব্বইয়ের দশকে অবিবাহিত একটি মেয়ের মা হওয়ার লড়াই এখনকার থেকে বহু গুণ বেশি কঠিন ছিল। তাছাড়া পারিবারিক কোনোরকম কোনও সাহায্য সে এ বিষয়ে পেত না। তাই নতুন করে ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার হিসেবে আরেকটি নতুন নিষ্পাপ প্রাণের দায়িত্ব নেওয়ার লড়াইতে নেমে পড়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। একবার পরিবার, দ্বিতীয়বার প্রেম এবং প্রেমের বীজটুকু হারানোর চূড়ান্ত গ্লানির মাঝেও অর্পিতা কিন্তু শক্ত পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল কারণ বিশাখার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব এবং সুলেখার সাহচর্য তাকে নতুন করে চলার শক্তি দিয়েছিল। পিতৃতন্ত্র সুচতুরভাবে মেয়েদের বোঝায়, একটি মেয়ে কখনও আরেকটি মেয়ের ভালো বন্ধু হতে পারে না। ঠুনকো হিংসে-দ্বেষের বেড়াজাল ভেঙে মহিলারা একত্রিত হলে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে তৈরি হবে বিদ্রোহ। তার চেয়ে বরং পুরুষকে জীবনের পরমতম প্রাপ্তি ভেবে নিয়ে মহিলারা যদি একে-অপরের মধ্যে সংঘর্ষ চালিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে পুরুষের মালিকানা জারি রাখতে সুবিধে হয়। অর্পিতাও তার অফিসের মহিলা সহকর্মীদের আচার-ব্যবহার দেখে, নিবেদিতার মতো সহকর্মীর উস্কানিমূলক মন্তব্যে জেরবার হয়ে নিবেদিতাকে বিপুল সংশয় নিয়ে প্রশ্ন করে—

> ‘মেয়েরা কি মেয়েদের সঙ্গই পছন্দ করে!’[৪০]

নিবেদিতা উত্তর দেয়নি। কিন্তু অর্পিতা পরবর্তীকালে বিশাখা এবং সুলেখার কাছ থেকে এর জবাব পেয়েছে। জীবনের সর্বোচ্চ সংকটের মাঝে পড়ে বিশাখার কোলে মুখ গুঁজেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিল অর্পিতা। বিশাখাও তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল, বুঝিয়েছিল, পরম যত্নে আগলে রেখেছিল।

এই উপন্যাসে সুলেখার উপস্থিতি সামান্য হলেও অত্যন্ত জোরালো। সুলেখা নার্সিং-এর কাজ করে এবং ডিউটির কারণে রাতে প্রায়শই বাড়ি ফেরে না বলে তাকে সুযোগ পেলেই অপমান করতে, হেনস্থা করতে কেউ ছাড়েনি। সেই সুলেখাই শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছিল ধাত্রী। তার সাহায্য নিয়ে বিশাখা অর্পিতাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সুলেখা তাদের সঙ্গে যায়নি, আলাদা করে বাসে গেছে। কারণ তাদের সঙ্গে গিয়ে তাদেরকে নিজের বদনামের অংশীদার করতে চায়নি সে। নিজের মধ্যেকার ভালোবাসার বীজকে উপড়ে ফেলে দেওয়ার চরমতম গ্লানির মাঝে অর্পিতা যখন অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে বিশাখার কাছে, বিশাখারও প্রাণ কেঁপে উঠেছে, সেও অসহায়বোধ করেছে, কিন্তু সে প্রাজ্ঞ অভিভাবকের মতো নিজের ভয়, অসহায়তা, যন্ত্রণাকে এতটুকু প্রকাশ করেনি অর্পিতার সামনে। পরম মমতায় তাকে প্রতিনিয়ত আগলে রেখেছে। একটি মেয়ের সঙ্গে আরেকটি মেয়ের সম্পর্কের এই গভীরতা, স্বার্থহীন বন্ধুত্ব, বিপদে-আপদে একে অপরের জন্য লড়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও যে ঘটে, সেইটে নিবিড়ভাবে উঠে আসে এই উপন্যাসে—

> চলমান ট্যাক্সির আলো-আঁধারিতে মুখ দেখা যায় না ভাল করে। একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল বিশাখা। অর্পিতার হাতটা আরও একটু শক্ত করে চেপে ধরল শুধু। ওষুধ-এসেন্স-পাউডারে জড়ানো একটা গন্ধ পাচ্ছে, হয়তো অর্পিতার শরীরের। তবু মনে হল, যে আসেইনি এবং যে এসেও চলে গেল, সেই অনাঘ্রাত দুই স্বপ্নের ঘ্রাণ লাগছে তার নাকে। নিঃশ্বাসের অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ছে গোটা শরীরে। হাতটা কি কাঁপতে শুরু করেছে?
>
> চকিত বিভ্রম থেকে জোর করেই নিজেকে নিরস্ত করল বিশাখা। জানে, বড়ো সংক্রামক এই কম্পন—যে-হাতে সে ধরে আছে অর্পিতাকে তাতে সংক্রামিত হলে অর্পিতাও কাঁপবে। তা সে হতে দেবে না।[৪১]

তাছাড়া চন্দ্রার অসহায় আবেদন, স্ত্রীর আর্তিটুকুর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েই কিন্তু অর্পিতার এই আত্মত্যাগ। অনুপকে কেন্দ্র করে অর্পিতা ও চন্দ্রার মধ্যে সেই বহুলদৃষ্ট টানাপোড়েন তৈরি হতে পারত কিন্তু অর্পিতা স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ করেছে, সে চন্দ্রাকে তার কাঙ্ক্ষিত গৌরব (স্ত্রীর গৌরব) ফিরিয়ে দিয়েছে, একটি মেয়ে হিসেবে সে চন্দ্রার পাশে দাঁড়িয়েছে। *স্বপ্নের ভিতর* উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দিব্যেন্দু পালিত স্বয়ং জানিয়েছেন—

> আমরা male female relationshipটা আলোচনা করছিলাম। কিন্তু female female একটা relationship আছে। 'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসে একটি মেয়ে সেক্রেটারির কাজ করে, বসের সঙ্গে তার একটা ভালোবাসা হয়েছে, এবং she became pregnant; এদিকে বসের স্ত্রী সে খবরটা পায়। সে মেয়েটিকে বলছে একদিন ফোন করে যে আমি অমুকের স্ত্রী। মেয়েটা বলছে, আপনি আমাকে কেন ফোন করছেন? স্ত্রী তখন বলছে, "আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইছি এবং সেটা তোমাকে দিতে হবে।" "বলুন কী?" স্ত্রী বলছে "দেখো, আমি জানি, আমার স্বামীর আমার প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। এবং তোমার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমি তো দেখতে ভালো নই – আমার স্বাস্থ্য নেই, রূপ নেই, কিচ্ছুটি নেই। আমার একটাই জিনিস আছ; কারো স্ত্রী হয়ে বেঁচে থাকার গৌরব। এই গৌরবটা তুমি কেড়ে নিও না, আমি তোমার পায়ে পড়ছি।" এই মেয়েটি কিন্তু অনুরোধটা রাখলো, এখানেই কিন্তু মেয়েটির মহত্ত্বের একটা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এবং বাচ্চাটা অ্যাবরশন করালো। ভ্রূণ হত্যার পরে মেয়েটা ট্যাক্সিতে আসতে আসতে ভাবছে, তার অন্তর্বর্তী যে সন্তান তাকে কিন্তু সে ভালোবেসে ফেলেছিল, খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু যা ঘটার তা তো ঘটেই গেছে। যখন ট্যাক্সি থেকে নামছে তখন বিশাখা ওকে বলছে, তুমি একা যেওনা আমি ধরছি। ও তখন বললো, থাক্ আমি একাই যেতে পারবো। এখানেই লেখাটা শেষ হচ্ছে। তার মানে, এতৎসত্ত্বেও এরা এগিয়ে যায়। রাস্তা দিয়ে যখন কেউ যায় তখন কিন্তু তাকালে বুঝতে পারবে না কোথায় কী দুর্যোগ ঘটছে। এই মেয়েটার জীবনে কী ঘটনা ঘটছে! আমি বলছি না যে পুরুষদের জীবনে এধরনের ঘটনা ঘটে না, কিন্তু

মেয়েদের জীবনে শেড অনেক বেশি, আলো ছায়া অনেক বেশি। এবং আমি এবার যেটার কথা বলছি, যে একটা লেখাকে Creative Success এর দিকে নিয়ে যেতে হলে মেয়েরা কিন্তু পুরুষদের চেয়ে আমার কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।[৪২]

বিশাখা এবং অর্পিতা ছাড়াও উপন্যাসে আরও কিছু বিবাহিত, অবিবাহিত কর্মজীবী মহিলার প্রসঙ্গ এসেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রা, ছন্দা দত্ত, শুক্লা, সুলেখা ভদ্র, কমলা দাশ, মমতাদি, রমা ঘোষ এবং নিবেদিতা।

চন্দ্রার এক এবং একমাত্র পরিচয় সে অনুপ রায়ের স্ত্রী চন্দ্রা রায়। পিতৃতন্ত্রের মন্ত্রে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত চন্দ্রার ধারণা, সে একে রূপ-যৌবনহীন, তার ওপর একটা সন্তান পর্যন্ত উপহার দিতে পারেনি তার স্বামীকে। তাই অপ্রাপ্তির অবসাদ থেকে মুক্ত হতে অনুপ ছুটে গেছে সুন্দরী অর্পিতার কাছে। তাই সে অর্পিতাকে ফোন করে জানিয়েছে—

‘পুরুষ মানুষের তৃপ্তি ওদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। আমি পারিনি—পারবও না। শুকনো গাছের মতো এই শরীর নিয়ে তো মেয়েমানুষ হওয়া যায় না! কী দিতে পারলাম ওকে! কিছুই না। তুমিই দিয়েছ—’[৪৩]

‘পুরুষ মানুষ’ আর ‘মেয়ে মানুষের’ সামাজিক ছাঁচের বাইরে বেরিয়ে চন্দ্রা অন্যকিছু ভাবতেই পারে না। তাই সে বিশ্বাস করে, তার মতো রূপ-যৌবনহীন মেয়ে অনুপ রায়ের মতো সফল পুরুষকে স্বামী হিসেবে পেয়েছে, এই তার একমাত্র গৌরব। সেই গৌরবটুকু হারানোর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকা চন্দ্রা মানুষ হিসেবে তার যে একটা আত্মসম্মান রয়েছে, নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে, সেটা ভুলে গিয়ে অর্পিতাকে বারবার ফোন করে এবং তার স্বামীকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অর্পিতার কাছে ভিক্ষে চায়। অর্পিতা প্রাথমিকভাবে চন্দ্রার আচরণে অত্যন্ত বিরক্তবোধ করে কিন্তু শেষপর্যন্ত তার অধিকার ফিরিয়েই দেয়। চন্দ্রা বোঝে না,

অর্পিতা অধিকার ছেড়ে দিলেই যে সে তার স্বামীকে ফিরে পাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। কারণ অর্পিতা তার স্বামীকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি। অনুপ রায় একজন শিক্ষিত, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। সে স্বেচ্ছায় অর্পিতার কাছে এসেছে। অথচ চন্দ্রা অর্পিতার কাছে অনুপকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুনয় করেছে। কারণ তার আজন্মলালিত পিতৃতান্ত্রিকবোধ, অর্পিতাকে 'ছেলে-ধরা মেয়ে' বানিয়ে অনুপের পুরুষসুলভ স্বেচ্ছাচারিতাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে।

প্রায় নির্মেদ, লম্বা ধাঁচের, কুড়ি-বাইশ বছরের ছন্দা দত্ত রিসার্চ অ্যাসিস্টান্টের অস্থায়ী চাকরি নিয়ে দক্ষিণীতে আসে। উপন্যাসে তার শেষ-উপস্থিতিটুকু বেশ অপ্রীতিকর। রাতবিরেতে আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের কোনও এক ফ্ল্যাট বাড়িতে ক-জন মত্ত পুরুষের সঙ্গে 'আনলাইসেন্সড বেশ্যা' হিসেবে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার খবর দিয়ে উপন্যাসে ছন্দার উপস্থিতির ইতি ঘটেছে। মাঝে দু-একবার তাকে নিয়ে মেসে গোল বাঁধে। সে একবার ঘুমের ঘোরে 'শুক্লা ফায়ার' বলে তার রুমমেট শুক্লার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, একবার দু-মাস ধরে মেসের টাকা না দিয়ে মেসের ইনচার্জ কমলা দাশের রোষের মুখে পড়ে। তাকে নিয়ে মিটিং ডাকা হয় এবং বিশাখা ঠিক করে তারা সবাই মিলে অল্প অল্প চাঁদা দিয়ে ছন্দার এক মাসের মেস ভাড়া মিটিয়ে দেবে। টাকাটা ছন্দাকে দিতে গিয়ে জানতে পারে, শুক্লা ইতোমধ্যে তার টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং একটি কাজের ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। কাজটি যে আসলে কী ধরনের তা পরবর্তীকালে ছন্দার পরিণতি দেখেই বোঝা যায়। ছন্দার স্নায়বিক আচার-আচরণ, ঘুমের মধ্যে উত্তেজিত অবস্থায় অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, হীনমন্যতা-বোধ, আত্মবিশ্বাসের অভাব প্রমাণ করে তার বড়ো হয়ে ওঠার মধ্যে খুব সম্ভবত ভয়াবহ কোনও দুর্ঘটনার সংযোগ রয়েছে। তার ইতিহাসের ভয়াবহতার উল্লেখ উপন্যাসে নেই কিন্তু পরিণতির ভয়াবহতা পাঠকের মনে করুণ রসের

সঞ্চার করবেই। কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে দলে-দলে আসা তরুণ প্রাণগুলির শহুরে দাপটের সামনে অসহায়, আত্মবিশ্বাসহীন, সহায়সম্বলহীন উপস্থিতি এবং গ্রামীণ অসহায়তার উপর শহরের ভয়াবহ আগ্রাসনের সাক্ষ্য বহন করছে ছন্দার ঘটনাটি।

সুলেখা ভদ্রর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সে নার্সিংহোমে কাজ করে, দক্ষিণীর নীচের তলায় থাকে। ছন্দা দত্ত যেহেতু তারই ঘরের বাসিন্দা ছিল, তাই ছন্দার ঘটনার পর পুলিশ সবার আগে তাকে থানায় তুলে নিয়ে যায় এবং তার পেশাকে কেন্দ্র করে পুলিশ তাকে যাচ্ছেতাইভাবে হেনস্থা করে। রাগে-অপমানে সুলেখা প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা করার কথা ভাবে, পরে বিশাখার সঙ্গে কথা বলে কিছুটা শান্ত হয়। সুলেখার প্রবল আত্মাভিমানের কারণ সে নিজেই কথার তোড়ে বিশাখার কাছে প্রকাশ করে—

> ‘কী কপাল! পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেল। আঠারোয় বিধবা হয়েছি, তারপর কাজ শিখে নার্স হলাম। এই সাতাশ আঠ্‌ঠাস বছরে কত প্রলোভন! কোনও পুরুষকে ঘেঁষতে দিই নাই কাছে। আমার তো জীবন নাই! আছে কি? শরীরটা আছে। সেটা খেতে চায়। এই কাজ না করলে খাব কী! আমি তো লেখাপড়া শিখি নাই!’[৪৪]

চির অবহেলার পাত্রী, অশিক্ষিত এই মেয়েটিই অর্পিতার বিপদকালে ত্রাতা হয়ে উঠেছিল। সুলেখার আদলে *মধ্যরাত* উপন্যাসের সাবিত্রীকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তবে অঞ্জলিকে বাঁচাতে না পেরে সাবিত্রী যাবতীয় দোষের ভাগীদার হয়েছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য অর্পিতা বেঁচে ফিরেছে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে গেছে। তাই সাবিত্রীর দুর্ভোগ সুলেখার কপালে জোটেনি।

দক্ষিণীর বাসিন্দা শুক্লা দেমাকি, অধৈর্য এবং উত্তেজিত স্বভাবের মেয়ে। স্বভাবের উগ্রতার কারণে মেসের সুপারিনটেন্ডেন্ট কমলা দাশের সঙ্গে তার প্রায়ই ঝামেলা বাঁধে। সদর স্ট্রিট বা থিয়েটার রোডের কোনও এক হোটেলে সে রিসেপশনিস্টের কাজ করে।

অর্পিতার বক্তব্য থেকে জানা যায়, শুক্লা যে হোটেলে কাজ করে, সেখানে স্মাগলিং থেকে শুরু করে অন্য অনেক ধরনের বিপজ্জনক, অনৈতিক কাজ-কারবার হয়ে থাকে। একজন সাধারণ রিসেপশনিস্ট হিসেবে শুক্লার আকস্মিকভাবে ভাড়া বাড়িয়ে একা একটা ঘর জুড়ে থাকবার সিদ্ধান্ত, ছন্দা দত্তের প্রতি অযাচিত অনুগ্রহের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও তার কর্ম-জগতের সেই অন্ধকার দিকটিই নির্দেশ করে।

দক্ষিণী কর্মজীবী মহিলা আবাসনের সুপারিনটেন্ডেন্ট কমলা দাশ বিধবা। কাঁচা-পাকা পাতলা চুলের নীচে ছোটো, সাদা কপাল এবং নাকের ওপর আলগাভাবে বসানো সরু ফ্রেমের চশমা মিসেস দাশের মুখে অভিজ্ঞতার ছাপ আরও নিবিড় করে তোলে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বুকে এতগুলো কর্মজীবী স্বাধীন মেয়েকে একত্রে সামলানো সহজ ব্যাপার নয়। চুল পাকাতে পাকাতে সে বুঝে গেছে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান লোকজনের সঙ্গে আঁতাত করে চললে তার চাকরি যাবে না। কংগ্রেসের একজন হোমরা-চোমরা নেতার খুঁটি ধরে সে দক্ষিণীতে আসে এবং বর্তমানে স্থানীয় কম্যুনিস্ট এম. এল. এ. বীরেশ্বর মিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করে সে মেসের ওপর নিজের কর্তৃত্ব সুরক্ষিত করে রেখেছে। কমলা দাশ অভিজ্ঞ মানুষ, তাই টাকা-পয়সার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া আর কোনও ক্ষেত্রে তাকে মেসের মধ্যে ঝামেলা বাঁধাতে দেখা যায়নি। সে ওপরে ওপরে পেশাসুলভ কড়া ভাব বজায় রাখলেও অন্তরে ভীতু প্রকৃতির মানুষ। তাই সে সচরাচর রাগারাগি না করে ঠান্ডা মাথায় কাজের চাপ সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং পেশাদারিত্ব বজায় রাখে। ছন্দা দত্তকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনাটিও মিসেস দাশ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সামাল দেয়।

দক্ষিণীর দোতলার একটি ঘরে থাকে মমতা। সে বিবাহিত, সংসার-পরিত্যক্ত, চুপচাপ ধরনের মানুষ। যথেষ্ট বয়স হয়েছে, তাই সে বিশাখা-অর্পিতার মমতাদি। অর্পিতা প্রথম দিকে তার ঘরের সদস্য ছিল। কর্পোরেশনে চাকুরিরত এই মানুষটি কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা নিয়ে কেন চার-পাঁচ বছর ধরে দক্ষিণীতে পড়ে আছে, সে ইতিহাস অজানাই থাকে। একদিন বিশাখাকে একলা পেয়ে সে বলেছিল—

> 'লেখাপড়া শেখাটাই আসল। তাই না!'[৪৫]

পরবর্তীকালে তার এই কথার তাৎপর্য বোঝা যায়। ঘটনাক্রমে জানা যায়, তার একমাত্র ছেলে চন্দন মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করেছে। যার নিরাপত্তা-প্রার্থনা করতে করতে মমতা রোজ ভোর-রাতে মা কালীর ছবির দিকে তাকিয়ে পরম ভক্তিভরে হাত মাথায় ঠেকাত, যার জন্য তার এত লড়াই, তার সাফল্যে আনন্দাশ্রু ফেলে মমতা। ছেলের স্কুলের মাস্টারমশাই ধীরেনবাবু সম্ভবত মমতার সংগ্রামের ইতিহাস জানেন, তাই তিনি বলেন—

> 'আমি জানি এই কান্নার অর্থ। ওঁর জীবনের সমস্ত বঞ্চনা, সমস্ত কষ্টের অবসান হল আজ। চন্দন আরও বড়ো হবে। অমন মায়ের সন্তান পিছিয়ে থাকে না—'[৪৬]

মমতার পাশের খাটে শোয় রমা ঘোষ। বছর চল্লিশ বয়স হলেও পেটানো, আঁটোসাঁটো স্বাস্থ্যের কালো, পালিশ করা মুখের অধিকারী সে। হাবড়ার দিকে হেলথ ভিজিটরের চাকরি করে রমা। সরকারি চাকরি করে, নাকি গ্রামের ভেতরে গিয়ে মেয়ে-বউদের পরিবার পরিকল্পনা এবং বংশ-বৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া তার কাজ, সে বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

নিবেদিতা অর্পিতার অফিসের সহকর্মী। পদোন্নতির পর থেকে এক নিবেদিতা ছাড়া অন্যান্য সব সহকর্মীই অর্পিতাকে এড়িয়ে চলে। সামনাসামনি চেহারায় আহ্লাদ এনে

সমীহের ভাব দেখালেও, অর্পিতা জানে সেটা পুরোটাই সাজানো। নিবেদিতা বরঞ্চ কখনো-কখনো অর্পিতার টেবিলের সামনে এসে গল্পগাছা করে যায়। সে ডিভোর্সি, একা মেয়েকে নিয়ে থাকে। অর্পিতাকে নিয়ে যেমন অফিসে নানান গুজব রয়েছে, তেমনি নিবেদিতাকে নিয়েও কানাঘুষো চলে। পিতৃতন্ত্রের দাঁত-নখের প্রতি ভীতি থেকে নিবেদিতা ডিভোর্সের পরও বাঁ-দিক ঘেঁষে সিঁদুর পরে। তার মতে—

> 'এই চিহ্নটার একটা দাম আছে—', অর্পিতা কৌতূহল দেখানোয় বলেছিল একদিন, 'ইউ ফিল সেফ্। না হলে অনেক পুরুষই ভেবে নেয় ভাড়া বাড়ি, টু-লেট—।'[৪৭]

সিঁদুরের চিহ্ন আপাতভাবে সামাজিক একটা খুঁটি দিলেও নিবেদিতার আচরণ আসলে আত্ম-প্রতারণার নামান্তর। সিঁদুর পরলেই যদি বিকৃত কামনা থেকে মুক্তি পাওয়া যেত, তাহলে বিবাহিত মেয়েদের ধর্ষণের শিকার হতে হতো না।

স্বল্প পরিসরের মধ্যে আসা-যাওয়া করা এই মহিলা চরিত্রগুলি বিশাখা এবং অর্পিতার চরিত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে বিপুল সহায়তা করেছে। *মধ্যরাত* এবং *স্বপ্নের ভিতর* শীতের প্রেক্ষাপটে প্রায় একই বিষয়বস্তু নিয়ে শুরু হলেও উপন্যাস হিসেবে *স্বপ্নের ভিতর* অনেক বেশি সার্থক এবং চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রেও অনেক বেশি পরিণতমনস্কতার পরিচয় দেয়।

৫

জীবন-শিল্পের সংঘাতময়তাকে কেন্দ্র করে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস *সংঘাত* (১৯৯২)। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র ঋতুপর্ণা চৌধুরী নব্বইয়ের দশকের মেয়ে কিন্তু আজকালকার নাট্যকর্মীরা তার গল্পকে 'ওসব আগেকার দিনে হতো' বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। মাঝে তিন দশক কেটে গেছে কিন্তু বেশি কিছু বদল ঘটেনি। সিনেমার গ্ল্যামার গায়ে

মাখার আগে হালকা মেক আপের টাচ বোলানোর মতো নাটকে দুদিন তালিম নিতে আসা অভিনেতাদের কথা অবশ্য এখানে হচ্ছে না, বা চলতি রাজনীতির রঙে সময়-সুযোগ মতো নিজেকে যারা সাজিয়ে নিতে পারেন, সেইসব নাট্যকর্মীরাও ঋতুপর্ণা চৌধুরীর সঙ্গে একাত্মবোধ করবেন না। তবে সাধারণ সংগ্রামরত নাট্যকর্মীরা হয়তো ঋতুপর্ণাতে ডুব দিলে এগিয়ে চলার ভরসা পেতে পারেন। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চির সুশ্রী, সুঠাম, শালীন এই মেয়েটি একটি স্কুলের পার্টটাইম শিক্ষিকা এবং নাট্যাভিনেত্রী। শিক্ষিকার জীবন তাকে বাধ্যত বহন করতে হয় কারণ কেবলমাত্র নাটক করে জীবন নির্বাহ করা মুশকিল। সামাজিক নিয়ম মেনে জীবন যথাযথ ফলবতী হওয়ার আগেই দুর্ভাগ্য তাকে গ্রাস করেছে। একুশ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল দীপকের সঙ্গে। মাত্র ছয় মাসের জন্য সে টের পেয়েছিল জীবনের আহ্লাদ, চিনেছিল শরীরের খাঁজে খাঁজে জমে থাকা উত্তাপ। একদিন হঠাৎ বাথরুমের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যায় দীপক। ছ-মাস ধরে জীবন তাকে যা যা দিয়েছিল, সেই সমস্ত কিছু আরও দশগুণ প্রাবল্য নিয়ে তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়, সঙ্গে পদবীটিও। হঠাৎ-বৈধব্য ঋতুপর্ণাকে যতটা কঠিন করে তোলে, তার চেয়ে আরও অনেক বেশি কাঠিন্য প্রদান করে তার পরবর্তী সংঘাতপ্রবণ জীবন। ত্রিশ বছর বয়সে প্রিয়তম মানুষ বাবা বাসুদেব চৌধুরীকে হারিয়ে সহায়-সম্বলহীন মা ভারতী এবং সদ্য যৌবনে পা রাখা বোন সুপর্ণার ভার কাঁধে নিয়ে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের এই মেয়েটি হয়ে ওঠে আরও বেশি স্থির, গভীর, চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ, উদ্দেশ্যে অটল। তার স্থির স্বপ্ন সে নাটকের অভিনেত্রী হবে। বেঁচে থেকে লড়াই করবে, অভিনয়ের মুনশিয়ানা দিয়ে নিজে তৃপ্ত হবে এবং দর্শকদের তৃপ্ত করবে। জীবনের প্রবলতম আঘাত, মা-বোনের অসহযোগিতা, অপমান, বীরকেষ্ট দাঁর মতো কিছু শিল্প-ব্যবসায়ীর অযৌক্তিক দাবিদাওয়া তাকে বারবার ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে, কিন্তু ঋতুপর্ণা সেই টুকরোগুলোকে

জড়ো করে আবার নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে তার স্থির স্বপ্নের দিকে চেয়ে। শান্ত চোখে একজন যথার্থ শিল্পীর মতো লক্ষ করেছে জীবনের প্রতিটি রূপের বদল, পাওয়া এবং হারানোর মধ্যেকার শূন্যতার স্পন্দন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করে ঢেলে দিয়েছে তার শিল্পসত্তার মধ্যে। জীবন-মৃত্যুর সুনিপুণ শিল্প তার চেতনায় বিকীর্ণ হয়েছে।

ঋতুপর্ণার বাবা বাসুদেব চৌধুরী, দীর্ঘদিন ফুসফুসে ক্যান্সার লালন করতে করতে একদিন বিদায় নেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর নামে 'ভারতী স্টোর্স' বলে একটি ছোটো স্টেশনারি দোকান চালাতেন। অর্ধেক জিনিস না থাকার দরুন নিজেই খদ্দেরদের পাঠিয়ে দিতেন রাজলক্ষ্মী স্টোর্সের মতো অন্য বড়ো দোকানে। শান্ত, সহনশীল, ক্ষয়া চেহারার এই মানুষটি ঋতুপর্ণাকে শেষ একটি সুন্দর সকাল উপহার দেন, তারপর চিরতরে চলে যান। ঋতুপর্ণা ভেবেছিল, সে তার বাবাকে কলকাতায় ভালো ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবে কিন্তু সেই সুযোগ আর হয়ে ওঠে না। সে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী ঠিকই, কিন্তু তার অবলম্বন কতটুকুই বা! একটি স্কুলে পার্টটাইম করে সে শ-সাতেক টাকা পায় আর থিয়েটারে খেপ খেটে কোনও মাসে হাজার, কোনও মাসে দেড়-দুহাজার টাকা পায়। বাবার মৃত্যুর পর তাকে অচিরেই 'ভারতী স্টোর্স' স্বল্প দামে বেচে দিতে হয়। মধ্যমগ্রামের দু-ঘরের নিচু একতলা বাড়িতে থাকা, লোকাল ট্রেনের নিত্য-যাত্রী, অফিস-ক্লাবের খেপ খাটা নাট্যাভিনেত্রীর বাবার শেষ স্মৃতিকে আগলে রাখার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও উপায় ছিল না।

এমতাবস্থায় বৃদ্ধ, সহায়সম্বলহীন মা ভারতী, সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত উঠতি কলেজের ছাত্রী বোন সুপর্ণাকে নিয়ে এক অদ্ভুত ত্রিকোণ সম্পর্কের মাঝে পড়ে ঋতুপর্ণা। তারা তিনজন তিন প্রজন্মের মানুষ। কেউ কারুর অবস্থান বোঝাতে পারে না, সম্পর্কে খিঁচ ধরে যায়। ঋতুপর্ণার মা ভারতী পুরোনো দিনের মানুষ। তিনি বিশ্বাস করেন, পুরুষবিহীন

সংসার মানে অভিভাবকহীন সংসার। পুরোনো কিছু বিকৃত ধ্যান-ধারণার জাঁতাকলে পড়ে তিনি নিজে ভালো থাকেননি, ঋতুপর্ণাকেও থাকতে দেননি। মা হিসেবে তার পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে যখন-তখন তার ওপর অহেতুক আঘাত হেনেছেন। তাঁর মানসিক সংকীর্ণতাপ্রসূত ধারণা ঋতুপর্ণা বেহিসাবি জীবন যাপন করে কারণ সে বিধবা হয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে, মুখে রঙ মেখে ছেলেদের সঙ্গে অভিনয় করে, প্রকাশ্যে ছেলেদের সঙ্গে বাক্যালাপও করে। এতৎসত্ত্বেও ঋতুপর্ণাকে সরাসরি আক্রমণ করার সাহস ভারতীর নেই কারণ পেট-প্রতিপালনের জন্য ঋতুপর্ণার অর্জিত অর্থটুকু তার প্রয়োজন। তাই তিনি চান, লোকজনকে ধরে-করে হলেও ঋতুপর্ণা যেন তার পার্টটাইম স্কুলের চাকরিটা ফুলটাইম করে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। তাতে নাটক-অভিনয় ইত্যাদির ভূতও মেয়ের ঘাড় থেকে নামে, তাছাড়া রাত করে বাড়ি ফেরা, পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা, সর্বোপরি লোকনিন্দার ফাঁড়াটুকু কেটে যায়। আশ্চর্যের বিষয়, ঋতুপর্ণার লড়াই, তার স্বপ্ন, অল্প বয়সে বৈধব্য লাভের তীব্র যন্ত্রণাটা তাঁর চোখে পড়ল না, নিজে বৈধব্য লাভের পরেও নয়। বরঞ্চ তারপরে স্বার্থপরতা আরও ঘনীভূত হয়ে বড়ো করে তুলল লোকনিন্দা আর সমাজ-সংস্কারকে। বাসুদেব মারা যাওয়ার সময় বিষাদমগ্ন ঋতুপর্ণা যখন জ্যেষ্ঠ কন্যা হিসেবে বাবার মুখাগ্নি করার দায় গ্রহণ করতে গিয়েছিল, ভারতী তখনও ঋতুপর্ণার অবস্থান, তার বৈধব্যকে স্মরণ করাতে ভোলেননি—

> তখন, অতো শোকের মধ্যেও আশেপাশের সকলকে স্তম্ভিত করে বলে উঠল ভারতী, 'না, না। ও নয়, ওর গোত্র আলাদা—। যা করার সুপুই করবে।'[৪৮]

মাতৃত্বের তথাকথিত কোমল ছবিকে লেখক বারবার ব্যঙ্গ করেছেন এই উপন্যাসে। ভারতীর ছোটো সন্তান সুপর্ণার প্রতি অদ্ভুত একচোখোমি, ঋতুপর্ণার প্রতি অনর্থক নিষ্ঠুরতা স্তব্ধ করে দেয় পাঠককে। দিদি হিসেবে সুপর্ণার লাগামছাড়া হাবভাব, প্রসাধনের উগ্রতা

নিয়ে বকাঝকা করতে গিয়ে সুপর্ণার থেকেও কম ঘা খায়নি ঋতুপর্ণা। এ বিষয়ে সুপর্ণার সটান জবাব ছিল—

> 'বিধবা হয়েও তুমি সাজতে পারো, আমি পারি না কেন!'[৪৯]

ভারতী উপরে উপরে সুপর্ণাকে শাসন করলেও ঋতুপর্ণাকে একান্তে জানিয়ে রাখেন, দোষ তাঁর ছোটো মেয়ের নয়, সে যা দেখছে, তা-ই শিখছে। আজন্মলালিত সংস্কারের বশে ঋতুপর্ণার শিল্পীসত্তার থেকে ভারতীর কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে তার অকপট স্বাবলম্বী জীবনযাত্রা। ঋতুপর্ণার যে অভিনয় সকলকে বিমুগ্ধ করে, তাবড়-তাবড় গুণীজনেদের সম্মোহিত করে, সেই অভিনয় দেখে ভারতীর অভিব্যক্তি এবং মন্তব্য অবিশ্বাস্যরকমের পীড়াদায়ক—

> বলতে পারল না নাটক ভালো লেগেছে না মন্দ। কী যেন ভাবছে। শুধু বলল, 'অতো লোকের সামনে একটা পরপুরুষের বুকে ওইভাবে মাথা মুখ ঠেকালি। হ্যাঁ রে, একটুও লজ্জা করল না তোর!'
>
> ভারতীর কথা শুনে থালায় হাত থেমে গেল ঋতুর।
>
> হাসিতে কুটিকুটি হয়ে সুপর্ণা বলল, 'ওটা তো নাটক, মা! সত্যি-সত্যিই কিছু ঘটছে নাকি!'
>
> 'আমি কি ভুল দেখলাম তবে!'
>
> ভারতী তিরস্কার করল না। শুধু বলল, 'রোজ যদি একই নাটক হয়, রোজই তো তাহলে শাঁখা ভাঙতে হয়, লোহা খুলতে হয় তোকে! খারাপ লাগে না!'[৫০]

অনুভব উপন্যাসের আত্রেয়ী যে পারিবারিক সাহচর্য, আশা-ভরসা লাভ করে নিজের মেরুদণ্ড খাড়া করে রেখেছিল, ঋতুপর্ণা তা পায়নি। একার লড়াই লড়তে গিয়ে সে আর্থিক

দিকটির পাশাপাশি মানসিকভাবেও হয়ে উঠেছিল স্বাবলম্বী। তাই আত্রেয়ী যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়ের কুয়াশার কারণে নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে স্পষ্ট বুঝতে পারত না, সাহস করে এগিয়ে যেতে পারত না, তা ঋতুপর্ণা অনায়াসেই পেরেছে। অপরিসীম ব্যথা সঞ্চয় করেও ঋতুপর্ণা সমস্ত সংঘাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, স্বপ্ন দেখা থামায়নি। তার গ্লানিময় জীবনটুকু নাটকের রিহার্সাল রুমেই সপ্রতিভ মুক্তি লাভ করেছে।

ঋতুপর্ণার বাবা বাসুদেব অপরাধীর গ্লানি নিয়ে মারা যাওয়ার আগে তাকে বলেছিল—

> ‘তুই শুধু আমার দুর্ভাগ্যটাই পেয়েছিস মা। আর কিছু পাসনি।’[৫১]

সেই দুর্ভাগ্যের দান মাথায় নিয়েই সে রোজগার করেছে রক্ত জল করা শ্রম দিয়ে। সুশ্রী চেহারার চটক দেখিয়ে সহজ উপার্জনের সুযোগ পেয়েছে ঋতুপর্ণা কিন্তু লড়াইয়ের পথটাই সে বেছে নিয়েছে বারবার। বাবার মৃত্যুর পর সে তার অল্প-বিস্তর রোজগার দিয়ে স্বার্থপরের মতো কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা করে নিতে পারত। তাতে অন্তত মধ্যমগ্রাম থেকে লোকাল ট্রেনে ঝুলে রোজ রোজ যাতায়াত করার ঝক্কি থাকত না। সেক্ষেত্রে অভিনেত্রীসুলভ স্বাচ্ছন্দ্য, আয়াসটুকুও সে পেত, স্কুলের চাকরির বাড়তি শ্রমটা এড়িয়ে নিজের স্বপ্ন এবং প্যাশন নিয়ে আরও দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে পারত কিন্তু দায়িত্ববোধ থেকে সে একচুলও নড়েনি। শিল্পীরা অনেক সময়ই শিল্পের দোহাই দিয়ে পারিবারিক দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখান কিন্তু ঋতুপর্ণা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

ভারতী ঋতুপর্ণার অভিনেত্রী জীবনকে খাটো চোখে দেখলেও অভিনয় করে রোজগার করা উপার্জনের খবর নিতে ভোলেননি। ভারতীর নির্লজ্জ বস্তুবাদী আচরণ দেখে সে নিজেকে আরও সংকুচিত, আরও গভীর করে তুলেছে, জীবনের প্রতি তার অমোঘ প্রশ্ন উঠে এসেছে—

> সংস্কার যাকে দূরে সরিয়ে দেয়, দায়িত্ব নেবার জন্যে তাকে কাছে টানা হয় কেন![৫২]

যন্ত্রণার এই তীব্রতাই ঋতুপর্ণার মেরুদণ্ডকে দৃঢ়তা দান করেছে। সে দৃঢ় কণ্ঠে তার সবচেয়ে বড়ো সমালোচক তার মায়ের কাছে নিজের গাঢ়তম আবেগসিঞ্চিত স্বপ্নের কথা ঘোষণা করেছে—

> যে যা বলে বলুক, থিয়েটার আমি ছাড়ব না। বাবা চলে গেল, তুমিও চলে যাবে একদিন। বিয়ে হয়ে যাবে সুপুর। আমি কী নিয়ে থাকব বলতে পারো? তোমার মনে হয় না, আমিও একটা মানুষ—![৫৩]

সংসার জীবন নয়, সন্তান সন্ততি নয়, শুধু নিজের শিল্পসত্তাকে একমাত্র প্যাশন হিসেবে মান্যতা দিয়ে নব্বইয়ের দশকের একটি একাকী মেয়ে হাজারটা বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে নিজের মেরুদণ্ড দৃঢ় রেখে নিজের তথাকথিত অর্থহীন জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলেছে, এখানেই ঋতুপর্ণার অনন্যতা। সে শখের অভিনেত্রী নয়, অভিনয় তার মর্মস্থল থেকে ঘনীভূত হয়। অফিস, ক্লাব, থিয়েটারে বছরে এক-দুবার অভিনয় করে যে সস্তার হাততালি কুড়োনো যায়, শুধু সেটুকুই তার শিল্পসত্তাকে পুষ্ট করে না। সে চায় গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করতে, একজন খাঁটি অভিনেত্রীর জীবন, পুরোদস্তুর শিল্পীর জীবন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো সবসময় উপায় থাকে না। গ্রুপ থিয়েটারে টাকার বিষয়টি যে অনিশ্চিত। অফিস-ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের জন্য দৈনন্দিন রিহার্সালের চল্লিশ টাকা, যাতায়াতের দশ টাকাটা হেলায় হারিয়ে গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করার স্বপ্ন পূরণটুকু হয়তো হবে কিন্তু ঋতুপর্ণার রোজগারের মুখাপেক্ষী পরিবারটি নস্যাৎ হয়ে যাবে। গ্রুপ থিয়েটারের সমষ্টিগত প্রয়াসের প্রতি যার এত ভালোবাসা সেই ঋতুপর্ণার পক্ষে কেবল নিজের স্বার্থের কথা ভেবে পরিবারকে ঝেড়ে ফেলা সম্ভব ছিল না। তাই চাইলেই সে লোকাল ট্রেনের প্যাচপ্যাচে গুমোট আবহাওয়াকে অস্বীকার করে গঙ্গার ঘাটে বা ময়দানের উদাত্ততায় নিজের প্রাণকে

মেলে ধরতে পারত না। কিন্তু জীবন যাকে স্বপ্ন দেখায়, সে স্বপ্ন পূরণের আকস্মিক সুযোগ পেলে জীবনের সেই দানকে অস্বীকার করতে পারে না। ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে ঋতুপর্ণার নূরজাহান চরিত্রে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন 'রঙ্গনামা' গ্রুপের পরিচালক অরিজিৎ মিত্র, ঋতুপর্ণার ছ-বছরের সাধনার পালে বাতাস লাগে। অফিস, ক্লাবের বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকর অভিনয়ের একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে 'রঙ্গনামা'য় *সংঘাত* নাটকের মুখ্য চরিত্র সীতার ভূমিকায় অভিনয় করে সে রাতারাতি নাম করে ফেলে। তিন স্তরে তিন অঙ্কে বিন্যস্ত *সংঘাত* নাটক ১৯৪৭ সালের প্রেক্ষাপটে নিম্ন-মধ্যবিত্ত যুবতী সীতার পঞ্চাশ বছরের যে সংগ্রামকে তুলে ধরে, তাতে অভিনয় করতে করতে সীতার জীবনের প্রতিটি পট-পরিবর্তনের সঙ্গে ঋতুপর্ণা মিশিয়ে দেয় তার নিজের জীবনের রঙ, রস, খুলে দেয় অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। অভিনয় তার ধ্যান-জ্ঞান। শোক এবং শূন্যতার গভীরে বিরাজ করেও বাসুদেবের মৃত্যুর পর তার মনে প্রশ্ন জাগে—

> ...জীবনের এই দৃশ্যে নাটক এলে কীভাবে অভিনয় করত সে? প্রতিক্রিয়ার তিনটি আলাদা ধরনের মধ্যে কোনটিকে বেছে নিত? কিংবা, কীভাবে ফোটাতো সেই অভিজ্ঞতাকে—[৫৪]

ঋতুপর্ণার নাটকীয় জীবন-সংগ্রাম এবং নাটকের সীতার সংগ্রামের মেলবন্ধন ঘটিয়ে লেখক উপন্যাসের নামকরণ করেছেন ঋতুপর্ণা অভিনীত নাটকের নামে— *সংঘাত*। এই সংঘাতময়তা যত সহজে নাটককারের কল্পনায় নিজের প্রেক্ষিত খুঁজে পায়, সম্মোহিত দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি লাভ করে, তত সহজে জীবনের প্রেক্ষিত খুঁজে পায় না। মেক আপ, সংলাপ, আচরণ, চরিত্রের উত্থান-পতন মঞ্চেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। অভিনেতার জীবনের বিচিত্র রসে টইটম্বুর হয়ে সমবেত হাততালি চেনে কিন্তু অভিনেতার কঙ্কালটুকু ভরাট করে না। তার উত্থান-পতন আমৃত্যু লেগেই থাকে, ঘটনাচক্রে ভরাট হলেও জীবন ফের থাবা বসায়, খুবলে নেয় রূপ-রস। অথচ জীবনের এই নিষ্ঠুর খেলাই তৈরি করে

ঋতুপর্ণার মতো একজন প্রকৃত শিল্পীকে। প্রসঙ্গত, চিত্র-পরিচালক আন্দ্রে তারকভস্তির শিল্পীদের সম্বন্ধে বলা কথাটিকে আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া যেতে পারে—

> An artist never works under ideal conditions. If they existed, his work wouldn't exist, for the artist doesn't live in a vacuum. Some sort of pressure must exist: the artist exists because the world is not perfect. Art would be useless if the world were perfect, as man wouldn't look for harmony but would simply live in it. Art is born out of an ill-designed world.[৫৫]

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, আনন্দস্রোতে গা ভাসালে, তৃপ্তির আমেজে মজে থাকলে কেন কেউ শিল্প নির্মাণ করতে পারবে না? কিন্তু শিল্পীর সাধের শিল্পকে খানিক দূরে সরিয়ে যদি শিল্পীর দিকে মনোনিবেশ করা যায়, তখন সততই চোখে পড়বে একজন শিল্পীও আর পাঁচটা মানুষের মতো সুখে শিহরিত হয়, দুঃখে দগ্ধ হয় কিন্তু মর্মস্থলের গভীরে লুকোনো রাশি-রাশি বিষণ্ণতাকে কখনোই নিজের সত্তা থেকে পৃথক করতে পারে না। মানব-মনের অন্তর্নিহিত একাকিত্বের বোধ, গভীর বিষণ্ণতার চিরস্থায়িত্ব বাহ্যিক সুখের জোয়ারে কিংবা দুঃখের আকস্মিকতায় হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু শিল্পীর ক্ষেত্রে তা হয় না। অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশের বেদনার চোরাস্রোতটুকু যিনি বহু যত্নে আত্মস্থ করতে পারেন, তিনিই হয়ে ওঠেন খাঁটি শিল্পী। সেরকমই এক শিল্পীর জীবনের গল্প দিব্যেন্দু পালিত *সংঘাত* উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে ঋতুপর্ণার পরিচয় নারী হিসেবে নয়, একজন প্রকৃত শিল্পী হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

অকাল-বৈধব্য গ্রহণ করে, প্রিয়তম মানুষ নিজের বাবাকে হারিয়ে, সংসারের জোয়াল টেনে কোনোরকমে সাফল্যের মুখ দেখতে না দেখতেই ঋতুপর্ণার জীবনে ঘটে যায় আরেক বিপর্যয়। ডিসেম্বরের কোনও এক রাতে অভিনয় সেরে বাড়ি ফেরার পথে ভয়ঙ্কর পথ-দুর্ঘটনায় তার বাঁ পা অচল হয়ে যায়। মাত্র একুশ বছর বয়সে বৈধব্য লাভের

পর ঋতুপর্ণার মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে সামাল দিয়েছিল নাটকের প্রতি তার নিঃশর্ত ভালোবাসা। শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ঋতুপর্ণার লড়াইয়ের বিস্তার উপন্যাসে পাওয়া যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায়, সীতার ভূমিকায় ঋতুপর্ণাকে বাদ দেওয়ার জন্য অরিজিৎ মিত্রের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা করে ‘রঙ্গনামা’ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে *সংঘাত* নাটকের রচয়িতা মৃণাল, ঋতুপর্ণার সুহৃদ শান্তনুসহ, দেবযানী, রফিকুল, বাপ্পাদিত্যের মতো আরও অনেকে। তারা প্রসেনিয়াম ছেড়ে স্ট্রিট থিয়েটার করবে, তারা ঋতুপর্ণার সুস্থতার জন্য অপেক্ষারত। অভিনেত্রী ঋতুপর্ণাকে একান্তই যদি ফিরে না পাওয়া যায়, তবে তারা নাট্য-পরিচালক হিসেবে ঋতুপর্ণাকে চায়। ঋতুপর্ণা আবার বেঁচে থাকার রসদ পেয়ে যায়। নাট্যপ্রেমের ঘোরে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার আনন্দে ডুবে যায়—

> শিরায় শিরায় ছটফট করছে তার উঠে দাঁড়ানোর পুরনো সঙ্কল্প। সংলাপে স্ফুরিত হতে চাইছে ঠোঁটদুটো। ‘সংঘাত’ –এর শেষ দৃশ্য। আলো এসে পড়েছে মুখে। সীতা নয়, সে—সূর্যের বাদামি আলোয় পালটে যাচ্ছে তার মুখের মানচিত্র। মঞ্চ থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে সে। তাকে ঘিরে চেনা অচেনা অসংখ্য মানুষ। আরো অনেক মানুষ জড়ো হচ্ছে তাদের পিছনে। ভাগ্যের শাসন ভেঙে যে একবার বেরিয়ে আসতে শিখেছে, সে আবার পারবে না কেন![৫৬]

গ্রুপ থিয়েটার ভেঙে যাওয়ার ইতিহাসের মাঝে বিলুপ্ত হয়ে যায় এমন অনেক ঋতুপর্ণার কথা, যাদের জীবনের একমাত্র নিয়ন্ত্রণ শক্তি নাটকের প্রতি ভালোবাসা। ভাগ্যের অসহযোগিতাকে একহাতে নিয়ে তারা বারবার হেসে-খেলে বাজি মাত করে। ভাগ্য এইসব শিল্পীদের যত দুর্বিপাকে ফেলে, এরা যেন ততই ভাগ্যের চাকায় পিষ্ট হয়ে নিজের ভেতর থেকে বের করে আনে আশ্চর্য প্রতিভাধর রসের ভাণ্ডার।

ঋতুপর্ণার বাবা-মা এবং তাদের দুই বোনের পারিবারিক চতুষ্কোণ ভেঙে যায় বাসুদেব মারা যাওয়ার পরই। এই তিন নারীর ত্রিভুজটা কোনোদিনই জুতসইভাবে গড়ে

ওঠেনি। সুতরাং মা-বোনের সমান্তরালে থেকেই লড়াই চালিয়ে যায় ঋতুপর্ণা। রক্তের সম্পর্ক সবসময় নির্ভরতা দেয় না। অনেক সময় কেবল কাছাকাছি বেঁধে রাখে। অদৃশ্য সেই বাঁধুনির গতানুগতিকতায় বয়ে চলে রক্তের ধারাবাহিকতা। সেই ধারাবাহিকতা সস্নেহে কাছে টেনে নেয় না, অথচ চাপিয়ে দেয় দায়দায়িত্বের দুর্বিষহ ভার। ঋতুপর্ণার ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছে, তবে শুভাকাঙ্ক্ষীর অভাব তার কখনই ঘটেনি। নাট্যজগৎ তাকে স্বপ্ন পূরণ করবার সুযোগ যেমন দিয়েছে, পাশাপাশি দিয়েছে বঙ্গবাসী কলেজের বাংলার অধ্যাপক প্রবীর ঘোষ, তরুণ অভিনেতা শান্তনু, *সংঘাত* নাটকের লেখক মৃণালের মতো সুহৃদদের।

শান্তনুর ঋতুপর্ণার প্রতি প্রেম নাকি আনুগত্য রয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় না। তবে ঋতুপর্ণার শিল্পসত্তার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং আস্থার কারণে সে সময়ে-অসময়ে তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। 'রঙ্গনামা'য় নতুন অভিনেত্রীর খোঁজ চলছে — সে খবরও প্রথম সে-ই দেয়।

প্রবীর ঘোষ ঋতুপর্ণার প্রতিবেশী। তার বিয়ে হওয়ার কয়েক মাস পরেই প্রবীরের বিয়ে হয়। নাটক-পাগল এই লোকটি ঋতুপর্ণাকে সবিশেষ স্নেহ করে, তার সমস্ত খবরাখবর রাখে, আপদে-বিপদে পাশে দাঁড়ায়, ঋতুপর্ণা না ডাকলেও চুপিসারে সস্ত্রীক তার নাটক দেখে আসে। শিল্পী ঋতুপর্ণার উৎকর্ষতায় আপ্লুত এই মানুষটির প্রতি ঋতুপর্ণারও বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। দীর্ঘ বৈধব্য-যাপনের পর কখনও অসতর্ক মুহূর্তে মনে মনে সে প্রবীরকে শারীরিকভাবে কামনা করে বসেছে কিন্তু বিনম্র শ্রদ্ধাবোধ থেকে সস্নেহ দূরত্ব বজায় রেখেছে। তার মতো বিধবা যুবতীর প্রবীর ঘোষের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার, আলাপচারিতা নিয়ে পাড়াপড়শি, ঋতুপর্ণার মা অসন্তোষ দেখিয়েছে কিন্তু

সেসব কুৎসিত আঘাত, লোকনিন্দার ভয়ে প্রবীরের সঙ্গে আত্মীয়তায় ছেদ টানেনি ঋতুপর্ণা।

নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে ঋতুপর্ণা সন্তোষ তরফদারের মতো অপটু নির্দেশক এবং অরিজিৎ মিত্রের মতো তুখোড় পরিচালকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সন্তোষ তরফদার অপটু হলেও সুযোগ পেলেই তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে, কাজের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। অরিজিৎ মিত্র ঋতুপর্ণার প্রতিভার স্ফুরণে সহায়তা করেছে কিন্তু তাকে শারীরিকভাবে ব্যবহার করতে কসুর করেনি। দীর্ঘকালীন অবসাদের অবসর যাপনের পর অথবা কৃতজ্ঞতাবশত ঋতুপর্ণাও তাকে বাধা দেয়নি। তবে ঋতুপর্ণার পায়ের অ্যাকসিডেন্টের পর তাকে প্রাথমিকভাবে আশ্বাস দিলেও অরিজিৎ মিত্র শেষাবধি তার পাশে থাকেনি। নতুন অভিনেত্রী নিয়ে নতুন করে নাটক সাজানোর পরিকল্পনা করেছে। আসলে অরিজিৎ মিত্র সীতারূপী ঋতুপর্ণায় মুগ্ধ হয়েছিল, নিম্ন-মধ্যবিত্ত বিধবা ঋতুপর্ণায় নয়। সে ঋতুপর্ণার প্রতিভা চিনেছে এবং তাকে কাজে লাগিয়েছে। তাছাড়া ঠুনকো লাস্যময়তার প্রতি আগ্রহ কাটিয়ে পেশাদারিত্বে ফিরে আসতে অরিজিৎ মিত্রের বেশি সময় লাগেনি। তাই সে তার ধর্মমতে শিল্পীকে ফেলে শিল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু *সংঘাত* নাটকের রচয়িতা মৃণাল অরিজিতের মতো বস্তুবাদী হয়ে উঠতে পারেনি। সে বিশ্বাস করে *সংঘাত* যেমন তার নাটক, তেমনি সীতা ঋতুপর্ণার চরিত্র। শান্তনুও এ বিষয়ে ঋতুপর্ণাকে আশ্বস্ত করে—

> ‘এটাই ভালো হলো ঋতুদি। মৃণালদা আপনাকে খুবই ভালোবাসেন। বলছিলেন, ঋতুকে দেখেছি—ও অরিজিতের চেয়ে কিছু কম বোঝে না নাটক। ও থিয়েটার করার জন্যেই জন্মেছে, থিয়েটারেই থাকবে। দরকারে ডিরেকশন দেবে। মৃণালদা হয়তো আজকালের মধ্যেই দেখা করবেন আপনার সঙ্গে।’[৫৭]

রক্তের দাবিতে নিঃসম্পর্কিত এই মানুষগুলোর ভালোবাসা, সাহচর্য, আত্মীয়তা ছাড়া ঋতুপর্ণার একার লড়াই ধোপে টিকত না।

২০২৩ সালে দাঁড়িয়ে অহরহ শোনা যায়, গ্রুপ থিয়েটারের বিলুপ্তি আসন্ন। কোনোক্রমে ভাড়া করা সৈন্য জোগাড় করে দলগুলি টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। তার মাঝে ঋতুপর্ণার মতো একটি মেয়ের গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করার জন্য এই অনমনীয় লড়াইয়ের গল্প পাঠকদের বিস্মিত করে। চারপাশে বৃত্তায়িত জলরেখার ভেতর অসহায় পিঁপড়ের মতো এইটুকু জীবনে, যে জীবন অপমানে, অসহায়তায়, নিঃসঙ্গতায় নিরন্তর ক্ষয়ে যাচ্ছে, তাতে অভিনয়ের সার্থকতা কতটুকু? তাও আবার প্রায় বিনা পয়সায় শিল্প-সাধনায়? সে প্রশ্নের জবাবই ঋতুপর্ণা এই উপন্যাসে দেয়। শিল্প যার জীবনের মুখ্য অবলম্বন, তার পরিচয় নারী-পুরুষের স্থূল বিভাজনে আটকে থাকে না, সে কেবল শিল্পী। প্রকৃত শিল্পীর কোনও মানসিক অবলম্বন লাগে না, শিল্পের আঙিনাতেই তার মানসিক মুক্তি ঘটে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনে সক্ষম হলেই তাকে স্বাবলম্বী বলা যায় না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে একজন নারীকে সর্বৈবভাবে স্বাবলম্বী হতে গেলে শিক্ষা-দীক্ষার পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসিত এবং সক্রিয় হতে হবে। সম্ভোগের সামগ্রী হওয়ার বিরুদ্ধে নিজেকে সচেতন হতে হবে। পুরুষেরা যুক্তিবাদী আর নারীরা আবেগপ্রবণ—এই ধারণার আসলে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বিজ্ঞান বলছে, মস্তিষ্ক একটি ‘nuro-plastic organ’ যার ছাঁচ অভ্যাস-অনুশীলনের মাধ্যমে পরিবর্তন করা সম্ভব। ড. নরমান ডয়েজ এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> Neuro is for “neuron”, the nerve cells in our brain and nervous systems. Plastic is for “changeable, malleable, modifiable”. At first many of the scientists didn’t dare use the word “neuroplasticity” in their publications, and their peers belittled them for promoting a fanciful notion. Yet they persisted, slowly overturning the doctrine

> of the unchanging brain. They showed that children are not always stuck with the mental abilities they are born with; that the damaged brain can often reorganize itself so that when one part fails, another can often substitute; that if brain cells die, they can at times be replaced; that many "circuits" and even basic reflexes that we think are hardwired are not. One of these scientists even showed that thinking, learning, and acting can turn our genes on or off, thus shaping our brain anatomy and our behavior—surely one of the most extraordinary discoveries of the twentieth century.[৫৮]

আবেগ-অনুভূতি, শৈল্পিক বোধ, সৃজনশীলতা ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক মানুষের মস্তিষ্কের রাইট হেমিস্ফিয়ার, অন্যদিকে যাবতীয় বৌদ্ধিক এবং যুক্তিসঙ্গত চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের লেফ্‌ট হেমিস্ফিয়ার। সমাজের রীতি অনুযায়ী রাইট হেমিস্ফিয়ারের দীর্ঘমেয়াদী অনুশীলনের ফলে মেয়েদের আবেগ, স্বজ্ঞা (intuition) ইত্যাদি যতটা সক্রিয় হয়ে উঠেছে, যুক্তি-বুদ্ধি বা গাণিতিক চর্চার দিকটা ততটা হয়ে উঠতে পারেনি। লেফ্‌ট হেমিস্ফিয়ারের কাজের সক্রিয়তা অনুশীলনের অভাবে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ অত্যন্ত সচেতনভাবে মেয়েদেরকে বৌদ্ধিক চর্চার দিক থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যার মূল কারণ ক্ষমতার রাজনীতি। মেয়েরা যদি যুক্তি-বুদ্ধির চর্চা করে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে উন্নত হয়ে ওঠে, তাহলে খাদ্য-উৎপাদন ব্যবস্থাকেও তারাই নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করবে, ফলে সম্পত্তির মালিকানাও তাদের হাতে চলে যাবে। তাই সুচারু পরিকল্পনামাফিক মেয়েদের লেফ্‌ট হেমিস্ফিয়ারের কাজ হয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, নতুবা প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা গোড়া থেকে বিনষ্ট হলে, তবেই মেয়েরা প্রকৃত স্বাবলম্বন বা আত্ম-নির্ভরতার স্বাদ পাবে। এইজন্য পুরুষের সাহায্য, নারীর আত্ম-সচেতনতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মেয়ে হয়ে মেয়েদের পাশে থাকা এবং স্বাবলম্বী নারী নয়, স্বাবলম্বী মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করা।

তথ্যসূত্র:

১। Frederick Engles, *The Origin of the Family, Private Property, and the State,* Resistance Books 2004, Australia, ISBN 1876646357

২। দিব্যেন্দু পালিত, 'প্রণয়চিহ্ন', *প্রথম পাঁচটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০০২, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৭০

৩। তদেব, পৃ. ৩৬০

৪। তদেব, পৃ. ৩৬৭

৫। তদেব, পৃ. ৩৭১

৬। তদেব, পৃ. ৩৮৫

৭। তদেব, পৃ. ৩৯৮

৮। তদেব, পৃ. ৪১০

৯। তদেব, পৃ. ৩৭৩

১০। তদেব, পৃ. ৩৮৯

১১। তদেব, পৃ. ৩৯৬

১২। Kate Millet, *Sexual Politics,* University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 4th edition, 2000, ISBN 978-0-252-06889-8, P. 54

১৩। মল্লিকা সেনগুপ্ত, *গদ্যসমগ্র,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ২০১৬, পৃ. ৭১১

১৪। দিব্যেন্দু পালিত, *অনুভব*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪, পৃ. ১৪

১৫। Frederick Engles, *The Origin of the Family, Private Property, and the State*, Resistance Books 2004, Australia, ISBN 1876646357, P. 74

১৬। দিব্যেন্দু পালিত, *অনুভব*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪, পৃ. ৭৬

১৭। তদেব, পৃ. ৭৭

১৮। অনুলিখন: শ্রাবন্তী বসু, 'দিব্যেন্দু – নবনীতা আলাপচারিতা', *প্রিয়দর্শিনী*, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১৯৬

১৯। দিব্যেন্দু পালিত, *অনুভব*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪, পৃ. ৮৮

২০। তদেব, পৃ. ৯৬

২১। তদেব, পৃ. ৯৯

২২। দিব্যেন্দু পালিত, 'মধ্যরাত', *প্রথম পাঁচটি উপন্যাস*, প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০০২, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৫২

২৩। তদেব, পৃ. ৩৫৩

২৪। তদেব, পৃ. ২৯৩

২৫। তদেব, পৃ. ৩৫৫

২৬। তদেব, পৃ. ২৪৪

২৭। তদেব, পৃ. ৩০৯

২৮। তদেব, পৃ. ২৩৭

২৯। তদেব, পৃ. ৩৩৫

৩০। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩৫০

৩১। দিব্যেন্দু পালিত, 'স্বপ্নের ভিতর', *দশটি উপন্যাস* ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩৮৮

৩২। তদেব, পৃ. ৩৭৯

৩৩। তদেব, পৃ. ৪১৮

৩৪। তদেব, পৃ. ৪১৯

৩৫। তদেব, পৃ. ৪২০

৩৬। তদেব, পৃ. ৩৮২

৩৭। তদেব, পৃ. ৪১১

৩৮। তদেব, পৃ. ৪৪৪

৩৯। তদেব, পৃ. ৪৪৬

৪০। তদেব, পৃ. ৪০৬

৪১। তদেব, পৃ. ৪৪৬

৪২। অনুলিখন: শ্রাবন্তী বসু, 'দিব্যেন্দু – নবনীতা আলাপচারিতা', *প্রিয়দর্শিনী*, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ২০০

৪৩। দিব্যেন্দু পালিত, 'স্বপ্নের ভিতর', *দশটি উপন্যাস* ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৪৪৪

৪৪। তদেব, পৃ. ৪৩৪

৪৫। তদেব, পৃ. ৩৯০

৪৬। তদেব, পৃ. ৪৪১

৪৭। তদেব, পৃ. ৩৯৬

৪৮। দিব্যেন্দু পালিত, *সংঘাত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৬৩

৪৯। তদেব, পৃ. ৫২

৫০। তদেব, পৃ. ১২৩

৫১। তদেব, পৃ. ৫৭

৫২। তদেব, পৃ. ৬৪

৫৩। তদেব, পৃ. ৭৩

৫৪। তদেব, পৃ. ৬৩

৫৫। *Andrei Tarkovsky: A Poet in the Cinema*, dir: Donatella Baglivo, 1983

৫৬। দিব্যেন্দু পালিত, *সংঘাত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১২৮

৫৭। তদেব, পৃ. ১২৮

৫৮। Norman Doidge, *THE BRAIN THAT CHANGES ITSELF*, Penguin, UK, 2008, P. XIX (Preface)

(তৃতীয় অধ্যায়)

নগরজীবনে নিঃসঙ্গ-বিভ্রান্ত পুরুষ

ছাঁটাই-শ্রমিকের দল, তাদের অসহায়, বেকার, নিরন্ন জীবন সচরাচর কর্তৃপক্ষের রোদ-ঝলসানো চোখের সামনে এবং তাদের ব্যবসায়িক কুনীতির ধারে কুপোকাত হয়। মিছিল, প্রতিরোধ, অনশন বা অন্তরের আগুন-চাপা করুণ প্রার্থনা এইসব ধনকুবের মহারথীদের সামনে ধোপে টেকে না। লক-আউট হওয়া কারখানার সামনে দুর্বল ছাউনি বিছিয়ে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে থাকা মানুষগুলোর সাধ্য আসলে কতদূর, তা তাদের মালিকদের আগে থেকেই জানা। শ্রমিক–মালিক যুদ্ধে দাবার চালে বরাবর জিতে যাওয়া মালিক শ্রেণির জীবন আসলে কীরকম? তারা কি জিতে যাওয়ার অভিমান নিয়ে সুখ-মসৃণ পুরু গদিতে শান্তির রাত-যাপন করতে পারে নাকি বারবার জিততে চাওয়ার গুরুভার, ভূত-চাপার মতো তাদের কাঁধে চেপে বসে জীবন ছারখার করে দেয়, তার নিখুঁত চালচিত্র উঠে এসেছে দিব্যেন্দু পালিতের বিবিধ উপন্যাসে। দিব্যেন্দু পালিত নিজে দীর্ঘদিন বিজ্ঞাপন জগতে কাজ করেছেন। প্রথমে অ্যাডার্টস্ অ্যাডভার্টাইজিং এবং পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ধরে ক্ল্যারিয়ন–ম্যাকান, আনন্দবাজার এবং দ্য স্টেট্‌স্‌ম্যান সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কর্পোরেট জগৎ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় *সম্পর্ক* (১৯৭২), *বিনিদ্র* (১৯৭৬), *ঢেউ* (১৯৮৭)–এর মতো উপন্যাসগুলিতে। বিজ্ঞাপনের জগৎকে কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাস দিব্যেন্দু পালিতের হাত ধরেই প্রথম বাংলা সাহিত্যের জগতে পদার্পণ করে। উচ্চবিত্তদের নিয়ে বিপুল কৌতূহল অধস্তন দুই শ্রেণিরই, যার নমুনা হিসেবে তুলে ধরা যায় বিভিন্ন শ্রেণির টিভি চ্যানেল নির্বাচনকে। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের মধ্যে টিভি

সিরিয়ালে মুখ গুঁজে বসে থাকার প্রবণতা যত বেশি, উচ্চবিত্তদের ততটা নয়। কারণ সিরিয়াল সাধারণত তুলে ধরে উচ্চবিত্ত পরিবারের কূটকচালকে। তার মধ্যে যদি দেখানো হয় কোনও নিম্নবিত্ত গ্রামের ছেলে বা মেয়ের কাছে উচ্চবিত্তের নাকানি–চোবানি খাওয়ার গল্প তবে টি. আর. পি হুড়হুড় করে বেড়ে যায়। কারণ সিরিয়াল রূপকথার মতো নিম্নবিত্তের আকাঙ্ক্ষা পূরণের গল্প বলে, উচ্চবিত্তদের ব্যক্তি-জীবন কীরকম হয় সেই নিয়ে নিম্নবিত্তের কৌতূহল নিরসন করে। তবে এক্ষেত্রে উচ্চবিত্তের জীবন কতোটা দেখানো হবে, তা নির্ধারণ করে উচ্চবিত্তেরাই। তাই এই দেখানোর অধিকাংশটাই ফাঁকি। একটা মেকি বাস্তবের গল্প দিয়ে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের বুঁদ করে রেখে নিজেদের পকেট ভর্তি করার গূঢ় কৌশল।

১

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস পাঠকদের এইসব মেকি গালগল্প বলে না। তা কঠোর, বাস্তব। একটানা বৃষ্টি পড়ার মতো ঘ্যানঘ্যানে, অসহনীয়, মাথায় চেপে বসা দীর্ঘকালীন নাছোড়বান্দা বিষাদময়তা এই উপন্যাসগুলির মূল সুর। হাজার হাজার ফুট বিস্তৃত শব্দ-নিরোধক ঘরে ছিমছাম কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিরাবেগ-শূন্যতা, একাকিত্ব বিচ্ছিন্নতাবোধকে ঘনীভূত করে। এ জগতের সর্বময় কর্তাদের শরীর জুড়ে আরাম কিন্তু মাথা জুড়ে বিশৃঙ্খলা—

> মাথার মধ্যে চক্রাকারে ঘোরে একটি মাত্র শব্দ—ক্যাম্পেন, ক্যাম্পেন, ক্যাম্পেন। তিনটি সপ্তাহ যেন তিনটি দিন। আর দিনগুলিও তেমনি—মুহূর্ত দিয়ে গড়া; ঘন্টা, মিনিটের সমবায় নেই কোনো। পরিশ্রম অমানুষিক। কিন্তু সেটাও হয়ে ওঠে সহনীয়, যখন কাজ করতে করতেই আবিষ্কারের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মন। আরও নতুন কিছু তথ্য, ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রলুব্ধ করার মতো অভিনব কোনো উপায় হানা দেয় মাথায়। তারপর একটা সময় আসে যখন ব্যবসার

প্রয়োজনটাও হয়ে দাঁড়ায় গৌণ; ভুলে যেতে হয় একই লক্ষ্যে ছুটে যাচ্ছে প্রতিযোগীরাও—একজনের সাফল্য নির্ভর করছে আর একজনের মুখ থুবড়ে পড়ার ওপর।[১]

মধ্যবিত্ত জীবনের অ্যালিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতাবোধ নিয়ে 'প্রাক্‌কথন' অংশে আলোচনা করা হয়েছিল। এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হবে, উচ্চবিত্ত জীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধ গাঢ়তর। কারণ উচ্চবিত্ত জীবনে সমষ্টির কোনও জায়গা নেই। এখানে সবাই একক, সর্বময় কর্তা হওয়ার দৌড়ে নেমেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমে *সম্পর্ক* (১৯৭২) এবং *বিনিদ্র* (১৯৭৬) এই দুটি উপন্যাসকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করা হবে। *সম্পর্ক* উপন্যাসের গতি প্রবহমান হয়েছে রামতনু সোমের চিন্তা-ভাবনাকে ঘিরে। রামতনু সোম কলকাতা শহরের একটি অন্যতম বড়ো ফার্ম 'স্টারলেট হিউম'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, ধীশক্তি এবং অসামান্য আত্মবিশ্বাসের জন্য তিনি তাঁর কর্মস্থলে খ্যাতিমান। প্রতিযোগী এজেন্সির লোকজনেরা শুধু তাঁকে সম্মান করে না, ভয়ও পায়। রামতনু সোমের অসামান্য কর্মদক্ষতা, আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল জয়যাত্রার সাক্ষ্য বহন করে স্টারলেট হিউমের গত কুড়ি বছরের ইতিহাস। উপন্যাসের পটভূমি সেই কুড়ি বছর পরের। নিরলস পরিশ্রম ও ব্যস্ততার মধ্যে গোপনে রামতনুর বয়স বেড়ে গেছে। তিনি এখন পঞ্চান্ন বছরের প্রৌঢ়। তাঁর পারিবারিক জীবনে রয়েছেন স্ত্রী মৃদুলা, পুত্র সুবীর এবং পুত্রবধূ নিভা। মেয়ে শ্যামলী থাকে শ্বশুরবাড়িতে। আপাতভাবে দেখলে সন্তান-সন্ততি, গৃহসুখ, অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি, এক জীবনে মানুষ যা যা চায়, তার কোনোকিছুর কোনও অভাব ঘটেনি রামতনুর জীবনে। স্ত্রী মৃদুলার সঙ্গে তাঁর ত্রিশ বছরের সম্পর্ক। এককালে তাঁর পৃথিবী ছিল মৃদুলাময়, এখন আর তাকে তিনি আলাদা করে খুঁজে পান না। মৃদুলা মিশে গেছেন রামতনুর প্রতিদিনকার অভ্যাসের মধ্যে, তাই হয়তো আলাদা করে জানান দেন না, তিনি আছেন। হঠাৎ করে পঞ্চান্ন বছর বয়সে এসে নীরা নামক এক যুবতীর

প্রতি আকর্ষণবোধ করেন তিনি এবং তাকে ঘিরে পারিবারিক অশান্তি তৈরি হয়। পরিজনদের বিরাগভাজন হয়ে এক অসুস্থ কলুষময়তার দিকে যায় সম্পূর্ণ পরিস্থিতি। কর্মব্যস্ত রামতনুর এখন প্রধান সমস্যা সময় কাটানো। অবসাদের আচ্ছন্নতায় তিনি দুপুরবেলা মদ্যপান করেন যাতে ভুলে থাকতে পারেন নিজের অপরিণামদর্শিতাকে, নিজে হাতে নিজের জট পাকানো জীবনকে।

অন্যদিকে, *বিনিদ্র* উপন্যাস আবর্তিত হয়েছে দীপ্তর চিন্তা-চেতনার সূত্র ধরে। *সম্পর্ক* উপন্যাসের রামতনু সোম এবং স্টারলেট হিউমের প্রসঙ্গ বেশ কয়েকবার এই উপন্যাসে এসেছে। স্টারলেট হিউমের অন্যতম প্রতিযোগী হিন্দুস্থান ফস্টারের মার্কেটিং এর হর্তা-কর্তা-বিধাতা দীপ্ত রায়। বিজ্ঞাপন জগতে দীপ্তর হাতেখড়ি হয়েছিল স্টারলেট হিউমেই। সেখানে তিন বছর থাকার পর সে হিন্দুস্থান ফস্টারের সঙ্গে যুক্ত হয়। তবে সে হিন্দুস্থান ফস্টারের অনেকখানি হলেও তাকে নিয়েই হিন্দুস্থান ফস্টার নয়। তাকে কথায় কথায় ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। দীপ্ত এগোতে চায় রামতনু সোমের পদাঙ্কচিহ্নিত পথ ধরেই, হয়ে উঠতে চায় দ্বিতীয় রামতনু সোম। একই পটভূমিতে লেখা বিজ্ঞাপন জগতের দুজন মহারথীর ব্যক্তিজীবন নিবিড়ভাবে তুলে ধরেছেন দিব্যেন্দু পালিত এই দু-খানি উপন্যাসে। তাই উপন্যাস দুটি পাশাপাশি রেখে পড়াই ভাল।

রামতনু এবং দীপ্তর মতো ব্যক্তিত্বকে বুঝতে হলে পলহাস এবং উইলিয়ামস্ (২০০২) রচিত *The Dark Triad of Personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy* গবেষণামূলক গ্রন্থ থেকে ‘machiavellianism’–এর বিষয়টি নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করা প্রয়োজন।

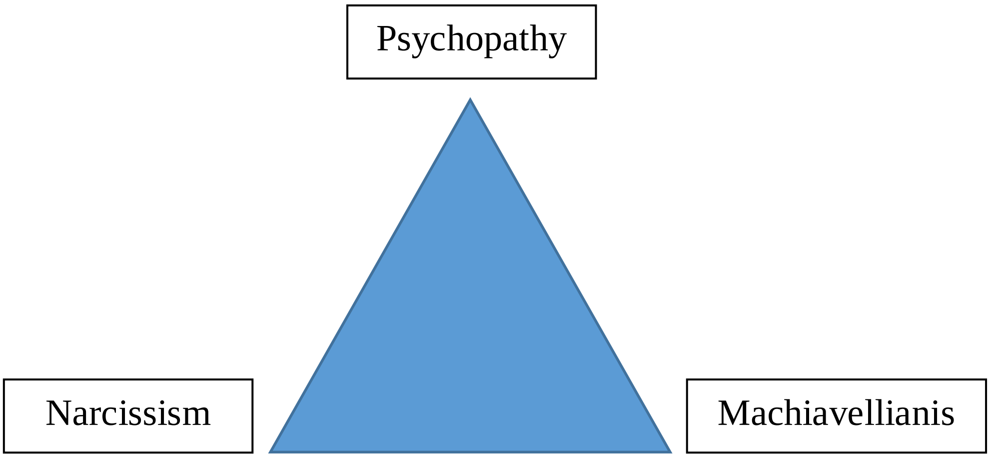

ছক ১ : Correlations among narcissism, machiavellianism, and psychopathy

ম্যাকিয়াভেলিয়ানিজম (Machiavellianism) : এই ছকটির[২] মধ্যে মূল আলোচ্য বিষয় Machiavellianism। 'The Dark Triad of Personality' নাম শুনেই বোঝা যায় ব্যক্তিত্বের নেতিবাচক দিকগুলিকেই চিহ্নিত করে এই ছক। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্যসূচক, তবু মনোবিদেরা মানুষের চিন্তাধারা, অনুভূতি, চালচলন, ব্যবহার, বিভিন্ন ঘটনার নিরিখে তাদের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে মোটা দাগে মানুষের ব্যক্তিত্বের ধরনকে কিছু বর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর মধ্যে নেতিবাচক ব্যক্তিত্বচিহ্নিত ছকটিকে বেছে নেওয়ার কারণ উক্ত দুটি উপন্যাসের দুই নায়ক রামতনু সোম এবং দীপ্ত রে— এঁদের কার্যকলাপে আত্মপরায়ণতা, আত্মসর্বস্বতা, স্বার্থপরতা, অন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অহংকার, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি নেতিবাচকতার প্রকাশই বেশি। রামতনু সোম যদিও দীপ্তর থেকে অনেক বেশি বিবেকবান, যেকোনো অন্যায়ের পথ বেছে নেওয়ার পর, সর্বগ্রাসী নিষ্ঠুর আচরণের পর বিবেকের সঙ্গে তাঁর নিরন্তর লড়াই চলে, তবু শেষপর্যন্ত তিনি নেতিবাচকতার দিকেই ধাবমান হন।

প্রথমে Machiavellianism আসলে কী, সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। ষোড়শ শতকের শুরুর দিকে ইটলির ফ্লোরেন্সে নিকোলো মেকিয়াভেলি (Niccolo Machiavelli) নামের একজন অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক উপদেশদাতা ছিলেন। ১৫১৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি *The Prince* বইটি লেখেন, যাতে তিনি বলেন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-সম্বলিত একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের যেকোনো মূল্যে ক্ষমতা হাসিল করাই হল মূল কথা। তার জন্য তিনি যেকোনো কূটপন্থা, মিথ্যাচারিতা, অনৈতিক কৌশল, চাটুকারিতার আশ্রয় নিতে পারেন কারণ, 'the end justifies the means'। চারশো বছর পর মনোবিদ রিচার্ড ক্রিস্টি (Richard Christie) লক্ষ করেন, মেকিয়াভেলির রাজনৈতিক আদর্শ এবং পদ্ধতির সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক আচার-ব্যবহার, চালচলনের তুল্যমূল্য বিচার করা যায়। ক্রিস্টি এবং তাঁর সহকর্মীরা কোলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে নিকোলো মেকিয়াভেলির নামেই ব্যক্তিত্বের এই ধারণাটির নামকরণ করেন। এই ব্যক্তিত্বের অধিকারীরা সাধারণত অতি-বাস্তববাদী নৈতিকতায় বিশ্বাসী। এরা বিবেকের তোয়াক্কা না করে নিষ্ঠুরভাবে নিজের কার্যসিদ্ধি করাকেই সঠিক কার্যপদ্ধতি বলে মনে করে। এই প্রসঙ্গে *The Tragedy of Macbeth* নাটকের লেডি ম্যাকবেথের কথা স্মরণ করা যেতে পারে, যিনি ক্ষমতা কায়েম করার জন্য স্তন্যপানরত হাস্যময় কোলের শিশুর মাথা আছড়ে থেঁতলে দিতে পারেন বলে শপথ করছেন—

I have given suck; and know
How tender 'tis, to love the babe that milks me:
I would, while it was smiling in my face,
Have pluck'd my nipple from his boneless gums,
And dash'd the brains out,— had I so sworn

As you have done, to this.[৩]

লেডি ম্যাকবেথের এই শপথ মাতৃত্বের যাবতীয় কোমল, পবিত্র ছবিকে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

ম্যাকিয়াভেলিয়ানদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য:

১) ১৯৯২ সালে মনোবিদ ফার (Fehr) এবং তাঁর সহকর্মীরা জানিয়েছেন, চূড়ান্ত স্বার্থপরতা, ঠান্ডা মাথায় নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে কাজ হাসিল করায় এরা বিশ্বাসী। এরা স্বভাবতই বিপথগামী। ক্ষমতার উদ্‌যাপনের জন্য নানারকম সামাজিক কৌশলের ব্যবহার, যৌনতার ব্যবহার করা এদের সহজাত প্রবৃত্তি।[৪]

সম্পর্ক উপন্যাসে দেখা যায় 'ফিডার লিমিটেড' বেবি ফুড (বনিবেব্) তৈরির একটি বিলিতি সূত্র আমদানি করেছে, ভারতবর্ষে যার প্রচারের জন্য প্রচুর বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন। ফিডার লিমিটেড এবং রামতনু সোমের কোম্পানি স্টারলেট হিউমের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক হওয়া সত্ত্বেও বনিবেব্-এর এই অ্যাকাউন্টটি ইউরেকা কোম্পানির হাতে চলে যাচ্ছিল। এই অ্যাকাউন্টটি পাওয়ার জন্য রামতনু এবং তাঁর খাস লোক বুধি নায়ার চেষ্টা-চরিত্রের অন্ত্য রাখেনি। তবু সোজা পথে বুদ্ধি বা অভিব্যক্তি দিয়ে কোনোমতেই ফিডার লিমিটেডের মার্কেটিং ডিরেক্টর হুইটনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উঠতে পারছিলেন না রামতনু। তখন রামতনুর চোখ পড়ে সুন্দরী, প্রাণোচ্ছল, বুদ্ধিমতী নীরার প্রতি। যদিও নীরাকে দিয়ে কাজ হাসিল করার পদ্ধতিতে রামতনু বিবেকের সঙ্গে বিস্তর লড়াই করেছেন, কারণ সুনীতি এবং সততাকেই তিনি নিজের প্রধান অস্ত্র বলে মনে করেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের জগতে রামতনু সোমের ব্যর্থতা এড়ানোর দায় বিবেকের দায়ের চেয়ে অনেক বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি ব্যর্থতা ভবিষ্যতে আরও অনেক ব্যর্থতাকে ডেকে আনতে পারে এই ভয়

রামতনুকে স্বার্থপরতার দিকেই চালিত করেছে। নীরার প্রতি রামতনুর দুর্বোধ্য আকর্ষণ যতই প্রবল হোক, যতই সর্বগ্রাসী হোক না কেন, প্রথমাবস্থায় নীরার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ছিল নিতান্তই ব্যবসায়িক প্রয়োজন—

> সেই সাক্ষাতে চাতুরী ছিল, বৈশিষ্ট্য ছিল না। নিতান্তই স্বার্থের জন্যে, প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে রামতনুর হঠাৎ মনে হয়েছিল নীরাকে তাঁর দরকার।[৫]

বিনিদ্র উপন্যাসের দীপ্ত রে অল্প-বয়সেই সাফল্যের প্রায় শীর্ষে এসে পৌঁছেছে। দীপ্ত কেবল আত্মবিশ্বাস মাখা প্রাণবান পুরুষ নয়, নিষ্ঠুরতা, রূঢ়তা, এমনকি শঠতাতেও সে রামতনুর থেকে এগিয়ে। 'মধু ও অলিভের সুষম ব্যবহারে' উজ্জ্বল, দীপ্তিমান দামি মডেলের মতো তার স্ত্রী জয়িতাকে সে শো-পিসের মতো ব্যবহার করে। সিনহার কাছ থেকে ব্যবসা আদায় করার জন্য সে অবলীলায় জয়িতাকে লেলিয়ে দেয় মদ্যপ সিনহার পিছনে—

> ...দীপ্তর সন্দেহ জয়িতা ক্ষুব্ধ অন্য কোনো কারণে। হয়তো একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছে সিন্‌হা। কিন্তু, সেই মুহূর্তে জয়িতার অস্বস্তির চেয়েও বড়ো ব্যাপার ছিল। হাসিতে গাম্ভীর্য মিশিয়ে বলল, 'দাঁত না মাজুক, দশ লাখ টাকার বিজনেস দিতে পারে। জয়ি, ইউ মাস্ট হেল্‌প্ মি!'[৬]

জয়িতা দিনের পর দিন দীপ্তর ইশারায় নাচার পর যতই ক্লান্তিবোধ করুক, শেষপর্যন্ত সেও টাকার লোভ, স্বচ্ছলতার আরামকে অস্বীকার করতে পারে না। সেও পিতৃতন্ত্রের কাছে মাথা নুইয়ে মুখে হালকা পাফ বুলিয়ে আবার রঙিন নেশায় মেতে ওঠে। জয়িতা যদি দীপ্তর প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করত বা অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাত, তাহলে হয়তো দীপ্ত ক্ষুব্ধ হতো, কিন্তু জয়িতার তথাকথিত মেয়েলি ওজোর-আপত্তি দীপ্তর ভালই লাগে। কারণ সেই তথাকথিত

মেয়েলিপনা দীপ্তর পৌরুষকে, পৌরুষজনিত 'ইগো'কে চরিতার্থ করে। দীপ্তর মতো ম্যাকিয়াভেলিয়ানরা জীবনসঙ্গী হিসেবে জয়িতার মতো পোষ-মানা দামি মডেলদেরই বেছে নেয়, কারণ এক্ষেত্রে জীবনে চলার পথে সঙ্গী হওয়াটা বড়ো কথা নয়। আসল কথা হল, বহিরাঙ্গিক উপস্থাপনা, দেখনদারি এবং কার্যসিদ্ধি।

২) যারা অতি মাত্রায় ম্যাকিয়াভেলিয়ান, তাদের বলা হয় হাই ম্যাক (high Mach) এবং যারা অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় ম্যাকিয়াভেলিয়ান, তাদের বলা হয় লো ম্যাক (low Mach)। যারা হাই ম্যাক তারা অর্থ, প্রতিপত্তি, ক্ষমতালোভী হয়ে থাকে এবং প্রতিযোগিতা করতে ভালোবাসে। এরা অত্যন্ত বহির্মুখী এবং বস্তুবাদী। অন্তঃকরণের চর্চা, বিবেকের মুখোমুখি হওয়া, পরিবারের প্রতি যত্নবান হওয়া এসবের ধার ধারে না এরা।

এক্ষেত্রে *বিনিদ্র* উপন্যাসের দীপ্ত রেকে হাই ম্যাক বলা যেতে পারে। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক জানান দেন, ঋতুচক্রের ফলে বাইরের আবহাওয়া যেমনই হোক না কেন দীপ্তর চারপাশে একটাই আবহাওয়া কারণ সে সারাক্ষণ এয়ার-কন্ডিশনে থেকে অভ্যস্ত। এত আরামের জীবন কাটানোর জন্য তাকে নিরন্তর পরিশ্রম করতে হয়। তবে দিবারাত্রি পরিশ্রমের পরও দীপ্তর শরীর-স্বাস্থ্য কখনও আলস্য অনুভব করে না। কারণ—

> পুরস্কারের জন্যে ভবিষ্যৎ। সে দমবে কেন![৭]

প্রতিনিয়ত পুরস্কার লাভের জন্য, আরও ক্ষমতা, আরও অর্থ এবং প্রতিপত্তি লাভের জন্য সে অবশ্য কম কাঠখড় পোড়ায়নি। চলা, বলা, মাপা হাসি, চাপা কান্না সবকিছুই সে নতুন করে অভ্যাস করেছে। বাঙালি ভেতোমি তার মোটেই পছন্দ নয়। তার চরিত্র থেকে রক্তে মিশে গেছে সাহেবিয়ানার কেতা, স্টাইল,—'অ্যাগ্রেসন'। সঠিক উচ্চারণে ইংরেজি বলার জন্য ফিরিঙ্গি সাহেবের কাছে নিয়মিত পাঠ নিয়েছে, সাহেব পাড়ায় গিয়ে চুল ছেঁটেছে,

ট্রাউসার্সের লেটেস্ট কাট নিয়ে নিজেকে সতর্ক করে তুলেছে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের চেয়ে জ্যাজ শোনায় নিজেকে অনেক বেশি অভ্যস্ত করে তুলেছে। দীপ্ত রায় বলা বা শোনার চেয়ে সে 'মিস্টার রে' হিসেবে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতেই বেশি আগ্রহী। যত্রতত্র হাই তোলার মতো ভ্যাদভ্যাদে বদভ্যেস তার নেই। তার ঘাড় বাঁকানো, স্তাবকদের মুগ্ধ করা হাসি, তীক্ষ্ণ-তীব্র উত্তেজনামুখর দৃষ্টি পর্যন্ত বহুদিনকার অভ্যাসের ফলাফল। অভিব্যক্তি হিসেবে কোমলতার পরিবর্তে রূঢ়তা, ধারালো স্মার্টনেসকেই সে পছন্দ করে। দীপ্তর এই প্রতিটি অভ্যাসই অত্যন্ত বহির্মুখী। হৃদয়ের চর্চার ন্যূনতম স্থানও তার জীবনে নেই। কারণ তার কাছে এগোনো মানে অর্থ আর প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে সমৃদ্ধিমান হওয়া। তাই সে বিবেকবোধকে ঘিরে তৈরি হওয়া অস্বস্তির জায়গাটিকে সমূলে উৎপাটিত করেছে—

> ক্রমশ বুঝেছিল, বিবেক তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। স্বার্থ আর বিবেক একই স্রোতের বিভিন্ন ঢেউ নয়— এ-ক্ষেত্রে, এগোতে চাইলে, তাকে এগোতে হবে বিবেক ভাসিয়ে। যে-কোনো উপায়ে।[৮]

পরিবারের প্রতি দীপ্ত উদাসীন নয় তবে, পরিবার বলতে সাধারণ যে ভালোবাসা, স্নেহ-মমতায় গড়া প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে, সেই ছবি দীপ্তর চোখে ধরা দেয় না। রাতে ছ-সাত ঘন্টা ঘুম ব্যতিরেকে বাকি প্রায় গোটা সময়টাই সে কাজে নিমগ্ন থাকে। পুরস্কারের লোভ তাকে কাজ থেকে পিছু হটতে দেয় না। এমনকি ঘুমের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে কাজ। টানা তিন বছর ধরে দীপ্তর জীবনে ছুটির দিন বলে কিছু ছিল না, সব দিনই কাজের দিন। তার একমাত্র ছেলে পাপুর সমস্ত দায়িত্বও পালন করে তার স্ত্রী জয়িতা নতুবা পাপুর আয়া। পাপুর কাছেও দীপ্ত স্যুট, ট্রাউসার্স, বুশশার্টের তৎপরতা মাখা, সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন একজন প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত-লোক। এর বাইরে হঠাৎ করে নিজের বাবাকে বাড়িতে

বসে ছুটি কাটাতে দেখলে, বা তাকে স্কুল থেকে নিতে এলে সেও বিস্ময়ে থমকে যায়। দীপ্ত তার স্ত্রী জয়িতার যাবতীয় অভিযোগকে পুষিয়ে দিয়েছে অন্যভাবে—

> ...অর্থ ও সাচ্ছল্য দিয়ে। তিন বছরে, আলিপুর নিয়ে, অন্তত চারবার বাসা বদল করা হলো। স্কোয়ার ফুটের ক্রমবর্ধমান হিসেব দিয়েই এখন সে পরিমাপ করতে পারে নিজেকে। ইতিমধ্যে দুই থেকে পাঁচে পৌঁছেছে পাপু। আরও মসৃণ হয়েছে জয়িতার ত্বক—ছোটো হয়েছে চুলের বহর, দীপ্ত মনে করতে পারে না শেষ কবে খোঁপা বেঁধেছিল জয়িতা। মনে করতে পারে না শেষ কবে সপরিবারে বাইরে বেরিয়েছিল সে—খুঁজতে সেই বিরল মুহূর্ত, যাতে, শুনেছে, অনেকেই অভ্যস্ত। বেরুনো বলতে সোস্যাল কল্—একে কি একান্ত বলা যাবে? নাইট শোয়ে সিনেমা? হ্যাঁ, গেছে; কিন্তু পাপুকে আয়ার কাছে রেখে, জয়িতাকে হিচড়ে নিয়ে, কিছুটা অশান্তি এড়াবার জন্যে—ধর্মভীরু নাস্তিক যেভাবে ছুটে যায় রবিবারের গির্জায়।[৯]

মা বা ভাইয়ের সঙ্গেও দীপ্তর সম্পর্ক তথৈবচ। ভাই দেখা করতে এসেছে শুনলে সে আপ্লুত হয় না, পরিবর্তে তার বহু আড়াল করা বিরক্তি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। সাত দিন আগে পাওয়া মায়ের চিঠির জবাব দিতে সে ভুলে যায় অথবা সেই দায়িত্ব জয়িতার ডিপার্টমেন্টে চালান করে। এমনকি মাকে টাকা পাঠানোর কথা মনে রাখার জন্যও তাকে স্লিপ বক্সে ‘MOTHER’ লিখে কাগজ ফেলতে হয়।

সম্পর্ক উপন্যাসের রামতনু সোম, দীপ্তর তুলনায় অনেক বেশি দায়িত্ব-সচেতন, কর্তব্যপরায়ণ এবং বিবেকবান। একদিকে নীরার প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ, অন্যদিকে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন, এ দুইয়ের মাঝে পড়ে রামতনু অস্থির, উৎকণ্ঠিত, অবসন্ন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি প্রবৃত্তির কাছে হার মেনে নীরার দিকেই ছুটে গেছেন। নীরার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মেয়ে শ্যামলীকে ট্রেনে তুলে দিতে পারেননি, তবে তার

জন্য তাঁর অনুতাপের অন্ত্য নেই। সেই দুঃখ কঠিন ভারের মতো তার বুকে চেপে বসে জানান দেয়—

> তুমি ব্যস্ত হতে পার, একটা বড়ো ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অমানুষিক কাজের মানুষ; কিন্তু শ্যামলীর সঙ্গে তোমার যা সম্পর্ক, তাতে ব্যস্ততা, দায়িত্ব, সমস্যা এগুলো নিতান্তই ফাঁকা বুলির মতো শোনাবে।[১০]

রামতনু সোমের বিবেকবোধ নিঃসন্দেহে দীপ্তর থেকে উন্নততর তবু তিনি আন্তরিকভাবে কর্তব্য পালন করেন না। বরঞ্চ তিনি যে কর্তব্যপরায়ণ এই নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত গর্ববোধ কাজ করে। পরিবারের প্রতি তিনি দায়বদ্ধ এবং এই দায়বদ্ধতায় তাঁর তরফ থেকে কখনও স্খলন ঘটেনি—এই বোধ তাঁকে আত্মতৃপ্তি দেয়। কন্যা শ্যামলীকে ট্রেনে তুলে দিতে না পারার ঘটনায় তিনি যত না দুঃখিত বা লজ্জিত, তার চেয়ে অনেক বেশি হতাশ এবং বিমূঢ় নিজের ব্যক্তিগত পরাজয়ের কারণে। তিনি কর্তব্যপরায়ণ—এই অহংবোধে ভাঁটা পড়ার দরুন এই অস্বস্তি। সেক্ষেত্রে তাঁর পরিবারনিষ্ঠ হওয়ার বিষয়টিতে আন্তরিক ভালোবাসা যতটা না আছে, তার চেয়ে বেশি রয়েছে মদগর্বী আত্মতৃপ্তি। তাঁকে মোটের ওপর লো ম্যাক বলা চলতে পারে।

৩) নিজের স্বার্থে বা যেকোনো কার্যোদ্ধারের জন্য অন্য মানুষকে বলির পাঁঠা বানাতে এরা সিদ্ধহস্ত। এরা আপাতভাবে অত্যন্ত সহৃদয়, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে ফাঁদ পাতার জন্য। এরা অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত হয়। এদের Intelligence Quotient (IQ) এবং Emotional Quotient (EQ) দুটোই অত্যন্ত শক্তিশালী, যা দিয়ে এরা মানুষকে ফাঁদে ফেলে। মানুষের মন পড়ার দুর্লভ ক্ষমতা রয়েছে এদের। মাত্র একটি-দুটি বৈঠকেই মানুষের মন বুঝে নিজের EQ-র সুচারু ব্যবহার করে ‘যে ঠাকুর, যে ফুলে সন্তুষ্ট’ তার সঙ্গে সেই মতো ব্যবহার করে এবং সুযোগ বুঝে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়।

দীপ্ত তার অধস্তন সুনীতাকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে ইনক্রিমেন্টের টোপ দিয়ে। অত্যন্ত সহৃদয় বন্ধুর ছদ্মবেশে দীপ্ত 'কফি অ্যাকাউন্টের' মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের দায়ভার তুলে দেয় সুনীতার মতো একজন জুনিয়ার কর্মচারীর হাতে। সুনীতাকে সে এটাই বোঝাতে চায় যে, সে সুনীতার ভবিষ্যতে ওপরে ওঠার পথ সুগম করে দিচ্ছে কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য অন্যরকম—

> আমি তোমাকে ব্যবহার করেছি মাত্র—বঁড়শির চারের মতো; তুমি যোগ্য বলে নয়, শুধু সিন্‌হা তোমাকে চেয়েছিল বলে! বলবে কী, স্বার্থের জন্যে নিজের স্ত্রীকেও যে ঠেলে দিতে পারে অস্বস্তিতে, নিঃসম্পর্কিতা একটি মেয়ের জন্যে তার প্রাণে দায় থাকতে পারে না; সত্য সামনে, ভেবে দ্যাখো কী করবে তুমি![১১]

রামতনু সোমও একইরকমভাবে নীরাকে ব্যবহার করে অন্তত প্রাথমিকভাবে তো বটেই। জয়ী হতে বা সফল হতে সব মানুষই চায় কিন্তু এরা জয়ী হওয়ার জন্য অধিকাংশ সময়ই শঠতার পথ বেছে নেয়। কারণ এরা খুব অল্প সময়ে, চটজলদি সাফল্যের স্বাদ পেতে চায়।

৪) ম্যাকিয়াভেলিয়ানরা অতি মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হয়। এদের আত্মবিশ্বাস এতটাই প্রখর এবং এরা অন্যদের নিজেদের তুলনায় এতটাই দুর্বল ভাবে, যে এরা মনে করে এরা অন্যান্যদের হাতের পুতুল বানিয়ে রাখতে পারবে।

রামতনু সোমের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, আত্মবিশ্বাসই তাঁর মূলধন। স্টারলেট হিউমের গত কুড়ি বছরের ইতিহাস তাঁর অমোঘ আত্মবিশ্বাসের ওপর ভর করেই গড়ে উঠেছে। প্রবল আত্মবিশ্বাসের জায়গা থেকেই তিনি মনে করেছিলেন তিনি সুচারুভাবে নীরাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন, যেমনটা তিনি তাঁর গোটা কর্মজীবন জুড়ে করে গেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে নীরার প্রতি হৃদয়াবেগের উদ্ভব সব বিষয়ে বাধ সাধে।

দীপ্তর ক্ষেত্রেও বলা যায় অহঙ্কার এবং দুর্দান্ত আত্মবিশ্বাস আছে বলেই দীপ্ত 'দীপ্ত রে' হয়ে উঠতে পেরেছে। তার প্রবল আমিত্ববোধ, চলায়-বলায় আত্মবিশ্বাসের ঝলকানি তাকে আরও ক্ষুরধার করে তুলেছে। স্ত্রী জয়িতাকে সে নিরন্তর প্রতারণা করে যায় অথচ তার মধ্যেও কাজ করে তার আত্মবিশ্বাস, কারণ সে জানে যতদিন জয়িতা তার সঙ্গে অন্য মহিলার নাম শুনে ঈর্ষায় জ্বলে উঠবে ততদিন জয়িতা তার হাতের মুঠোয়। দীপ্ত সেই লোক যে জয়িতার সঙ্গে আলাপের তৃতীয় দিনেই তার সঙ্গে সঙ্গম করার বাসনা জানায়। তাছাড়া টাকার ঐশ্বর্য আর বৈভব দিয়ে সে কেবল জয়িতা কেন, আরও বহু মানুষকেই নিজের হাতের মুঠোয় রাখতে পারে, সেই আত্মবিশ্বাস তার রয়েছে। কখনও ঘুণাক্ষরেও যদি কোনও গোপন যন্ত্রণা থেকে তার আত্মবিশ্বাসে ভাঁটা পড়ে সে সত্বর বিবেকের গ্লানিকে ছাই চাপা দিয়ে ফিরিয়ে আনে তার সর্বগ্রাসী আত্মবিশ্বাসকে—

> যন্ত্রণাটা সরে যাচ্ছে; জলে জল আসার মতো আস্তে আস্তে ফিরে আসছে আত্মবিশ্বাস। আলোর ভিতর ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার—[১২]

৫) ১৯৯৫ সালে ড্রেক (Drake) দেখিয়েছেন, যেহেতু ম্যাকিয়াভেলিয়ানদের EQ, বিশেষত নেতিবাচক EQ-র মাত্রা খুবই বেশি, তাই উদ্‌বেগ, বিষণ্ণতা, অপরাধবোধ এদের নিত্যসঙ্গী। ২০০৩ সালে ওয়াস্টেল (Wastell) এবং বুথ (Booth) অবশ্য তাঁদের গবেষণায় দেখাচ্ছেন, অপরাধবোধ এদের মধ্যে বেশ কম। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বলা যেতে পারে হাই ম্যাকদের অপরাধ বোধ নেহাতই ক্ষীণ।[১৩]

দীপ্ত বা রামতনু কখনোই বিবেকের সম্মুখীন হন না, এ কথা বললে ভুল বলা হবে। বিবেকের সঙ্গে নিরন্তর লড়াইতে এরা আপাতভাবে জিতে গেলেও অপরাধবোধ আর বিষণ্ণতা এদের পিছু ছাড়ে না। কখনও নিঃসঙ্গতার অবকাশ এলেই দীপ্তর অবচেতন

ফিরে যায় তার গ্রাম্য, ছাপোষা শৈশবের দোরগোড়ায়, ফিরে যায় স্টেথস্কোপ গলায় জড়ানো, ফুলহাতা শার্ট আর ধুতি পরা হোমিওপ্যাথের ডাক্তার তার জন্মদাতার কাছে। তার বাবার ছেলেকে ঘিরে স্বপ্ন ছিল নিতান্ত সাধারণ, আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাবার মতো—

> 'কতো রোজগার করবে, কতোজনের রোগ সারাবে, লোকে মানবে কতো!'[১৪]

দীপ্ত তার বাবার চাহিদাকে ছাপিয়ে গেছে কিন্তু শৈশবকে সে ভুলতে পারে না, নিজের শেকড়কে শতচেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই উপড়ে ফেলতে পারে না। নিজে বাবা হওয়ার পর ছেলের মধ্যে খুঁজে পায় তার শৈশবকে। দীপ্তর অসম্ভব গতিময় বিবেকহীন জয়যাত্রার পথে মাঝেসাঝেই তার পিতা এবং পিতৃত্ব তার সময় ও গতির পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। তখনই তার মতো প্রবল পুরুষও হয়ে ওঠে অসহায়, গতিহীন, বিশৃঙ্খল 'বিনিদ্র'।

রামতনু সোম দীপ্তর চেয়ে অনেক বেশি বিবেকবান, সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই অপরাধবোধও তাঁর অনেক বেশি। হাজার রকমের মানসিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও মেয়ে-জামাইকে সময় দিতে না পারার অপরাধ, স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করার অপরাধ, সর্বোপরি পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন না করতে পারার অপরাধবোধ তাঁকে তাড়া করে বেড়ায়। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও নীরার প্রতি অযাচিত আকর্ষণ যে সমাজের চোখে নিশ্চিতভাবে অন্যায়, অশালীন এবং অভব্য তা তিনি জানেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে দীপ্তর তফাত। অথচ রামতনুও শেষপর্যন্ত নিজেকে সংযত করতে পারেননি, পরিবর্তে আশাপাশের সমস্ত মানুষের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে গড়ে তুলেছেন একটা ফাঁপা অযৌক্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (defense mechanism)। তাঁর মনে হয়েছে, তাঁর পরিবারের সদস্যেরা আসলে অকৃতজ্ঞ। তিনি যে এতদিন তাদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে গেছেন, তা তারা

বেমালুম ভুলে গিয়ে নীরার ঘটনার মতো একটা ছোটো ঘটনাকে নিয়ে তাঁর ওপর অকারণ আক্রমণ হেনেছে—

> তিরিশ বছর ধরে তোমাদের সার্বিক মঙ্গলচিন্তায় আমি আমার রক্ত জল করেছি—প্রায় অন্ধের মতো, এই দীর্ঘ সময়কালের বিভিন্ন মুহূর্তের মধ্যে কোথাও আমি বর্তমান নেই, তার মূল্য তোমরা শোধ দিচ্ছ এইভাবে, আমার বিচার করে! কোন অধিকারে! কোন শর্তের জোরে!...ক্রমশ এমন হলো যখন তাঁর মনে কোনো দুঃখ নেই। পরিবর্তে একধরনের হৃদয়হীনতা, প্রতিশোধস্পৃহা তাঁর মাথার ভিতর জ্বলে উঠল আগুনের শিখার মতো। কার্যকারণ-সম্পর্করহিত এই স্পৃহা তাঁকে বিক্ষুব্ধ করে তুলল, অসহ্য অপমানে জ্ঞানশূন্য, নির্ভার হয়ে উঠলেন তিনি।[১৫]

এইভাবে নিজস্ব যুক্তিক্রম সাজিয়ে 'blame game' খেলা ম্যাকিয়াভেলিয়ানদের স্বভাবচিত।

৬) এরা স্বভাবতই এদের আশেপাশের লোকেদের ক্ষতি করে। এতৎসত্ত্বেও মার্জিত ব্যবহার, অতি মাত্রায় সামাজিক সচেতনতার কারণে এরা আশেপাশের লোকজনের থেকে যথেচ্ছ সম্মান, শ্রদ্ধা পায়।

এই ঘটনা এখানে আলোচ্য দুজন ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠতে না পারলেও অর্থ এবং ক্ষমতার প্রতিপত্তির কারণে রামতনু এবং দীপ্ত দুজনেই সামাজে রীতিমতো উচ্চপদস্থ স্থান অর্জন করেছে।

৭) ১৯৯২ সালে ফার তাঁর রিসার্চে দেখিয়েছেন, ম্যাকিয়াভেলিয়ানরা সাধারণত ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে বেশি আগ্রহী হয়। ডাক্তারি, নার্সিং ইত্যাদি কাজের ক্ষেত্রে এদের আগ্রহ সবচেয়ে কম থাকে। কার্যক্ষেত্রে লো ম্যাকেরা হাই ম্যাকেদের থেকে অনেক বেশি সাফল্যের অধিকারী হয়।[১৬]

চব্বিশ বছর বয়সে সদ্য এম.এ. পাশ করে রামতনু সোম অধ্যাপনার চাকরি নিয়েছিলেন কিন্তু কলেজ আর পড়াশুনোর মধ্যে কাটানো দৈনন্দিনতাকে তাঁর অর্থহীন ভার বলে মনে হতে থাকে। তিনি চেয়েছিলেন অ্যাড্রিনালিন রাশ, কম্পিটিশনের উত্তেজনা যা সারাক্ষণ তাঁর মস্তিষ্ককে গ্রাস করে রাখবে—

> পুঁথিবদ্ধ অধ্যাপনার কাজে ইতিমধ্যেই ক্লান্তি এসেছিল রামতনুর। চাইছিলেন এমন একটা কিছু— একটা পরিবর্তন, যা আরও উত্তেজক, যার মধ্যে উৎসাহ আরও বেশি; নিজের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও যেখানে আরও বেশি উপার্জনক্ষম হওয়া যায়।[১৭]

চূড়ান্ত উদ্দীপনা, উৎসাহ এবং অর্থের মেলবন্ধনের মধ্যে জীবন কাটানোর উদ্দেশ্যেই অধ্যাপনা ছেড়ে রামতনুর বিজ্ঞাপনের জগতে প্রবেশ। দীপ্তর ক্ষেত্রেও এই ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সে তার বাবার ইচ্ছেকে স্বীকার করে হোমিওপ্যাথির ডাক্তার হতে পারত, তারই মতো মেধাবী সহপাঠী সুজন আর নির্মাল্যর মতো অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে নির্বিবাদে জীবনযাপন করতে পারত, এমনকি তার সময়কার সবচেয়ে উজ্জ্বল ছাত্রর মতো ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি ছেড়ে সাধারণ ইংরেজি সাপ্তাহিকের এডিটর হয়ে ছাপোষা জীবনকে মেনে নিতে পারত। কিন্তু দীপ্ত তা করেনি। সে একজন ম্যাকিয়াভেলিয়ান হিসেবে বিজ্ঞাপন জগতের প্রতিযোগিতামূলক উৎসাহ, উদ্দীপনাকেই বেছে নিয়েছে।

ম্যাকিয়াভেলিয়ানরা দিনের শেষে নিঃসঙ্গ, একাকী। অর্থ আর স্বাচ্ছল্য দিয়ে সেই একাকিত্বের দীর্ঘশ্বাসকে পুষিয়ে দেওয়া যায় না। দীপ্ত বা রামতনুও তা পারেননি। বিপুল সাফল্য অর্জন করার পরও তাঁদের লড়াই একার, পরাজয়ও একার কারণ এঁরা আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসর্বস্ব। শব্দনিরোধক বহুতলা বাড়ির স্বপ্নহীন নৈঃশব্দ্যের এঁরা নিঃসঙ্গ সম্রাট।

২

দিব্যেন্দু পালিতের বেশ কিছু উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রে রয়েছে নাগরিক যুবকেরা। মূলত পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশকের মধ্যেকার জীবন সম্পর্কে হতাশ, বিরক্ত, নিরাশ, যৌবনোচিত চাঞ্চল্য ও উদ্দামতাবিহীন আত্মমগ্ন যুবকের দল কীভাবে লেখকের কলমে ধরা দিয়েছে, সেইটেই এখানে আলোচ্য বিষয়। এই সময়ের নিরন্তর রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনাপ্রবাহে ক্ষত-বিক্ষত নাগরিক বাঙালির নিদারুণভাবে মানসিক ব্যবচ্ছেদ ঘটেছিল। বাহ্যিক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা না থাকলেও বাহ্যিক ও অন্তর্জগতের টানাপোড়েনের সকরুণ আখ্যান অদ্ভুত, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে উপন্যাস জুড়ে ছেয়ে রয়েছে। তাই উপন্যাসগুলিকে বুঝতে হলে, উপন্যাসের মানুষগুলোর চরিত্রধর্মকে অনুভব করতে গেলে সমসাময়িক উত্তপ্ত রাজনৈতিক-সামাজিক দাবদাহের আঁচ অনুভব করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) সময় থেকেই জাতীয় বিপর্যয় চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল। মন্বন্তর, ব্ল্যাক আউট, যুদ্ধজনিত কারণে নৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবনমনের পাশাপাশি শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা-আন্দোলন, যার চূড়ান্ত পরিণাম দেশভাগ। ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত এবং দেশ বিভাগের মধ্যে দিয়ে ভারতবাসী যে স্বাধীনতা লাভ করেছিল তার অধিকাংশটাই ছিল ফাঁকি। দেশ বিদেশি প্রতিপক্ষের হাত থেকে মুক্ত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু দেশবিভাগের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়ে। অর্থনৈতিক বিষয়ে দীর্ঘকালযাবৎ উভয় বঙ্গ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল ছিল। যেমন ধরা যাক পাট-উৎপাদনকেন্দ্রগুলি পূর্ববঙ্গে থাকলেও চটকলগুলি ছিল পশ্চিমবঙ্গে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল বাংলা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ভয়ঙ্কর সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার ওপর দেশবিভাগের পর উদ্‌বাস্তু-সমস্যা জাতীয় বিপর্যয়ের

আকার নেয়। ভিটেমাটিহারা শিকড়বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যে ক্রমাগত ক্ষোভ সঞ্চারিত হয় দেশীয় শাসকদের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ১৯৪৬ এ কলকাতার 'গ্রেট কিলিং' আর পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি ও তিপেরা অঞ্চলে হিন্দু-নিধনের পর থেকেই পূর্ব থেকে পশ্চিমে উদ্‌বাস্তু-আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৯ এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৫০ এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের নানা অংশে, বিশেষত খুলনা, রাজশাহি, ফরিদপুর, বরিশালে যে দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড চলে, তার ফলে উদ্‌বাস্তু-আগমন বহুগুণ বেড়ে যায়। ১৯৫১ সালে কাশ্মীর সংক্রান্ত উত্তেজনা এবং তার পরের বছর পাসপোর্টের ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর উদ্‌বাস্তুর ঢল আরও বেড়ে যায়। পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্য হয়তো ছিল উদ্‌বাস্তু-স্রোত বন্ধ করা কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীতটাই ঘটেছিল। পশ্চিমবঙ্গে আগে থেকেই খাদ্যের ঘাটতি ছিল। তার ওপর স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতিরেকে আরও শরণার্থীদের খাদ্যের যোগান দিতে গিয়ে 'ডেমোগ্রাফি' বা জনসংখ্যার ছক বদলে যায়। কলকাতার ছবি হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা এইরকম –

> The 1951 census found only some 33.2 percent of Calcutta's inhabitants to be city-born. The rest, including a small group of non-Indians were migrants. 12.3 percent from elsewhere in West Bengal, 26.6 percent from other Indian state, and 26.9 percent from what had become East Pakistan in 1947.[১৮]

পাটশিল্প সংক্রান্ত সমস্যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্যার মাঝে আবার কেন্দ্রীয় সরকার পাটের ওপর করের বড়ো অংশ দাবি করে। এর ফলে সংকট আরও ঘনীভূত হয়। ১৯৪৯ এ আসা উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে ষাট শতাংশই কৃষিজীবী ছিল না। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের সমীক্ষা অনুযায়ী তারা অধিকাংশই ছিল উচ্চ ও মধ্য বর্গের মানুষ, যাদের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল কলকাতা। এরা কেউই ক্যাম্পে যেতে আগ্রহী ছিল না। এদেরকে ঘিরে গড়ে ওঠে প্রথম জবরদখল কলোনি। জবরদখল কলোনি

বলতে কলকাতার উপকণ্ঠে (বর্তমানে কলকাতার অন্তর্গত) বেশ কিছু পরিত্যক্ত বা পতিত জমি বা পুরোনো আমলের জমিদারদের বাগানবাড়ি সংলগ্ন জমি। জমির কারবারিরা (ল্যান্ড স্পেকিউলেটর) আন্দাজ করতে পেরেছিল, খুব শিগগির কলকাতা তার প্রত্যন্ত সীমা অতিক্রম করে আরও ছড়িয়ে পড়বে। তাই তারাও এসব অঞ্চলে জমি কিনে রেখেছিল যাতে পরবর্তীকালে সোনার দরে জমি বেচতে পারে। জমির মালিকেরা এই সময় প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু গৃহহীন, দিশেহারা উদ্‌বাস্তুদের অনমনীয় সংগ্রামী মানসিকতা এবং বিরোধী বাম দলগুলির অকুণ্ঠ-সহযোগিতা শেষপর্যন্ত তাদের বাধা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। অবশেষে ১৯৫৪ সালে মন্ত্রী কমিটির রিপোর্টের মাধ্যমে এই কলোনিগুলি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে।[১৯]

স্বাধীনতার পর ভারতের আর্থিক ও সামাজিক নীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষে শিল্পে অনগ্রসরতার প্রধান কারণ ছিল সাধারণ মানুষের দারিদ্র, জমিদার, মহাজন, আধুনিক পুঁজিবাদ এবং ঔপনিবেশিক শাসনের এক ভয়াবহ সংমিশ্রণ। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে গোড়ার দিকে নেহেরু উদ্‌বাস্তু-সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা বলে অভিহিত করেছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থাকে যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সেখানকার হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরে নেহেরুর হাতে ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের কাঠামো নতুন করে গড়ে তোলার ক্ষমতা। কিন্তু তাঁর আশেপাশের লোকজন এবং তাঁর শ্রেণিভুক্ত উচ্চমধ্যবিত্তের দল রাষ্ট্রযন্ত্রের ততটুকুই পরিবর্তন চেয়েছিল যতটুকু সম্ভব হলে ব্রিটিশ শাসকের পাতে দৃশ্যত যে ঝোলটুকু চলে গিয়েছিল, সেইটুকু নিজের পাতে টানা যায়। সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সূচনা ঘটল ভারতবর্ষের সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পর। কিন্তু পুরোনো অধিকারী সম্প্রদায়ের অন্যায়

শোষণের বিরুদ্ধে আদৌ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না। উপরন্তু উন্নতিকামী দেশে প্রগতিশীল ব্যবসায়ী শ্রেণি গড়ে তোলার নাম করে রাষ্ট্রযন্ত্রের শোষণের সিংহভাগটুকু বন্টন করে দেওয়া হল এই ব্যবসায়ী শ্রেণিগুলির হাতে।[২০]

কংগ্রেস-নেতৃত্বের সংবেদনশীলতার অভাব এবং অমানবিক নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন বামপন্থী-শিবিরের হয়ে বিপুল পরিমাণ প্রতিরোধ-শক্তির যোগান দেয়। তারই নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় ১৯৫৩ সালের ট্রামের ভাড়া বাড়ানোর প্রতিবাদে গড়ে ওঠা স্বল্পস্থায়ী আন্দোলনে। ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বেড়ে যাওয়ায় বেশ কিছু ট্রাম পোড়ানো হয়, শ্রমিকেরা ধর্মঘট ডাকে, কোম্পানি ট্রাম-চলাচল বন্ধ করে, পুলিশ প্রতিবাদ ঠেকাতে লাঠি-গুলি বর্ষণ করে। কিন্তু সে যাত্রায় সরকার-ট্রাম কোম্পানির জোটকে হারিয়ে জনগণই জয়লাভ করে। ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয় এবং গ্রেপ্তার হওয়া মানুষজনকেও মুক্তি দেওয়া হয়। ফলে জনসাধারণের মন থেকে কংগ্রেসের আরও এক-ধাপ পশ্চাদপসরণ হয়। ট্রামকেন্দ্রিক আন্দোলন ছিল কংগ্রেসের পতনমুখী হওয়ার সূচনা। এরপর খাদ্য-আন্দোলন কংগ্রেসের পতনকে প্রায় অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের আমলে প্রায় গোটা দশক ধরেই খাদ্যশস্যের বাজার ছিল নানারকম সংকটে মুখর। তাঁর খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন সংখ্যাতত্ত্বের বিভিন্ন ছলচাতুরিতে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে রাখলেও বাজার-দরকে বিভ্রান্ত করতে পারেননি। কন্ট্রোল, লেভি, কর্ডন, নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়ন্ত্রণ, পারমিট ইত্যাদি নানাবিধ বিধিব্যবস্থা আরোপ করার পরও গরিব মানুষের রান্নাঘরে চাল পৌঁছয়নি, অন্যদিকে চোরাচালানও বন্ধ হয়নি। নিরন্তর এই খাদ্য-দুর্নীতির চূড়ান্ত ফলাফল হয়ে দাঁড়ায় গ্রামবাংলার কঙ্কালসার মানুষের ভুখা-মিছিল। প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে কোচবিহারে, ১৯৫১ সালে পর পর দু-তিন দিন ধরে হাজার হাজার মানুষের মিছিল, অনশন সরকারের ঘুম কেড়ে নেয়। সবশেষে পুলিশি লাঠিচার্জ ও

গুলিবর্ষণের পর পাঁচটি নিরন্ন প্রাণের বিনিময়ে জনসাধারণ আংশিক রেশন পাওয়ার দাবি আদায় করে। পরে সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাটা ঘটে ১৯৫৯ সালে। ওই বছরের গোড়ার দিক থেকেই খাদ্যের ভয়ঙ্কর অভাব রুখতে খাদ্যশস্য সরবরাহের দাবি জানানো হয় 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি'র তরফ থেকে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া না পাওয়ার কারণে অগাস্ট মাসের শেষদিকে প্রায় লক্ষাধিক কৃষক ধর্মতলায় সমবেত হয়ে পুলিশের প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বেপরোয়া গুলিবর্ষণের কারণে অসংখ্য লোক জখম হন এবং ৮০ জন মারা যান। এর ফলে বিক্ষোভ আরও ছড়িয়ে পড়ে, সরকারের প্রতি বিদ্রূপ জানিয়ে এই সময় অন্নদাশঙ্কর রায় লেখেন, 'ভাত দেবার ভাতার নয় কিল মারার গোঁসাই/ তুর্কি না তাতার না গৌড়ীয় মশাই'।[২১]

এর মাঝেও ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবাংলার ভৌগোলিক মানচিত্র রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন। দুর্গাপুর ইস্পাত-কারখানা, খড়্গপুর আই.আই.টি., কল্যাণী উপনগরী, হরিণঘাটা দুগ্ধ-প্রকল্প, রাষ্ট্রীয় পরিবহন প্রকল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কাজ করে যান। তাছাড়া লবণহ্রদ উপনগরী, দীঘা পর্যটনকেন্দ্র, হলদিয়া শিল্পনগরী গড়ে তোলার কাজ তিনি শুরু করেছিলেন কিন্তু এগুলির পরিসমাপ্তি তিনি দেখে যেতে পারেননি। এতৎসত্ত্বেও নেহেরুর পশ্চিমবাংলার প্রতি কিছুটা অবহেলা, অবজ্ঞার মনোভাবের কারণে পশ্চিমবঙ্গ আরও অবনতির দিকে যায়। স্বাধীনতা-লাভের অব্যবহিত পরেই কলকাতার প্রাপ্য রাজস্বের ভাগ ২০ থেকে কমিয়ে ১২ শতাংশ করা হয়েছিল। পাটের ওপর শুল্ক আদায় করে কলকাতার প্রাপ্য অংশ কেন্দ্র কেড়ে নেয় এবং এই রাজ্যের স্বল্পার্জিত মুনাফা অন্যান্য রাজ্যে বিনিয়োগ করার সুবিধে করে দেয়। এই ঘটনার অনিবার্য ফলস্বরূপ ১৯৫১ সালে কলকাতা কলকারখানার সংখ্যার দিক থেকে প্রথম স্থানে থাকা সত্ত্বেও ক্রমাগত পিছিয়ে

পড়তে থাকে। কলকাতা-বন্দরের উন্নয়ন অবহেলা করে অন্যান্য রাজ্যের বন্দরের আধুনিকীকরণের উদ্যোগ শুরু করা হয়।[২২] অর্থনীতিতে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক চাপ-বৃদ্ধি, কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা-বৃদ্ধি এবং শিল্প-সংকোচনের সম্মিলিত চাপে পশ্চিমবাংলায় বেকারের সংখ্যা আরও বাড়তে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, কারিগরী কোনও পরিকল্পনাই বৃহত্তর জীবনে সুফল আনতে পারেনি। প্রথম ও দ্বিতীয় যোজনার শেষে দেখা গিয়েছিল ভারতীয় অর্থনীতির ধরাশায়ী চেহারা। দেশের ২২ টি পরিবারের হাতে জাতীয় সম্পদের ৬৫ ভাগ জমা পড়ে যায়। ভারতবর্ষে আমেরিকার পুঁজির লগ্নিও বেড়ে যায় হু-হু করে। যেমন —

১৯৪৮ সালে ২৫ মিলিয়ন ডলার।

১৯৫৯ সালে ১৬০ মিলিয়ন ডলার।

১৯৬৫ সালে ৬০০০ মিলিয়িন ডলার।

১৯৬৫ সালে মোট আদায়ীকৃত রাজস্বের ২৩৯৯ কোটি টাকার মধ্যে বিত্তবানেরা দেয় ৮০০ কোটি টাকা আর জনসাধারণের কাছ থেকে নেওয়া হয় ১৬০০ কোটি টাকা। চতুর্থ যোজনার শুরুতে গ্রামে শতকরা ৫ ভাগ মোট কর্ষিত জমির ৩৭.২৯ ভাগ এবং ৭০ ভাগ চাষী পরিবারের হাতে ২০ ভাগ জমি কেন্দ্রীভূত করা হয়। ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এই হারে —

১৯৫১ সালে ২৭৫. ১ লক্ষ।

১৯৬১ সালে ৩১৫ লক্ষ।

১৯৭১ সালে ৪৫৫. ৭ লক্ষ।

দেশ জুড়ে বেকারের সংখ্যা বেড়েছিল নিম্নলিখিত হারে—

প্রথম পরিকল্পনাতে ৫৩ লক্ষ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে ৭১ লক্ষ।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে ৯৬ লক্ষ।

চতুর্থ পরিকল্পনাতে ১৫৬ লক্ষ।[২৩]

স্বাধীনতা-পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যেই কেন্দ্রবিরোধী এবং জাতীয় কংগ্রেসবিরোধী এক জনমত ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। সেই জনমতের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠতে থাকে বামপন্থী রাজনীতি। ১৯৫৯ সালে ঐতিহাসিক খাদ্য-আন্দোলনের পর দেশ জুড়ে শুরু হয় এক উগ্র জাতীয়তাবাদের নেশা। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি ক্রুশ্চেভ এই সময় একটি অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণ ঘটান। তিনি স্টালিন আমলের অভাবনীয়, অমানবিক, অনৈতিক কীর্তিগুলো বিশ্বের দরবারে উন্মোচিত করে 'স্টালিন' নামক মিথকে টলিয়ে দেন। ফলে বাংলার প্রগতিবাদী চিন্তার আকাশে যুক্তি-তর্কের, অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়।[২৪]

অন্যদিকে, চিনে মাও-এর কমিউনিস্ট পার্টিতেও শুরু হয়েছিল অন্তর্বিরোধ। ক্রুশ্চেভ-বিস্ফোরণের পরবর্তী সোভিয়েত-নেতৃত্ব সম্পর্কে মাও হয়ে ওঠেন সংশয়বাদী। নতুন সোভিয়েত-বিধানকে বলে শোধনবাদ। ফলে সোভিয়েত-চিন বিরোধ আর লুকোনো থাকে না, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের আন্তর্জাতিক সংযোগ-সম্পন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে, অন্যান্য মার্কসবাদী দলগুলির মধ্যে এবং সাম্যবাদী ভাবধারার প্রতি আস্থাশীল বুদ্ধিজীবী-মহলে সোভিয়েতপন্থী না চিনাপন্থী কোন পথের পথিক হওয়া উচিত, কোন পথ হবে

বিপ্লবের পথ, তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ককে ঘিরে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হয়। এই প্রশ্নটিই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আলাদা গুরুত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠা পায় ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের সময়। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি চিনকে আক্রমণকারী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে শ্রমিক, কৃষক এবং সাধারণ মজুরদের নেহেরুর পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছিল। ছাত্র ফেডারেশনও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যেই কিছু সাধারণ কর্মী সেই নেতৃত্বের বিরোধিতা করায় তাদের চিনাপন্থী বলা হয়। এই যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল, ব্রিটিশ সরকার চিনের মাঞ্চু সাম্রাজ্যের সীমারেখার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ম্যাকমোহন লাইন নামে একটি সীমা চিহ্নিত করে চিন-ভারত রাষ্ট্র দুটির সীমা নির্দিষ্ট করেছিল। স্বাধীন ভারতের সেই ভৌগোলিক উত্তরাধিকারকে অগ্রাহ্য করে সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করার সংকল্প গ্রহণ করে চিন আসলে আধিপত্যবাদী মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছে বলে চিনা-বিরোধীরা মনে করেন। 'চিনের নাম বিষ' এই শিরোমানে কিছুসংখ্যক প্রগতিবাদী কবি মুখর হয়ে উঠেছিলেন কলকাতা শহরে। জওহরলাল নেহেরুর পদত্যাগের দাবিও উচ্চারিত হয়েছিল দিল্লি ও অন্যান্য জায়গায়। এরপর সেই উচ্ছ্বাসের বাষ্প হঠাৎ কেটে যায় যখন যুদ্ধ শুরুর কয়েক দিনের মধ্যে ২০শে নভেম্বর ১৯৬২ তে চিন একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার উত্তরে সরে যায়। দখল-করা ভারতীয় এলাকা চিন ছেড়ে দিয়েছিল নিঃশর্তে।[২৫]

চিন-ভারত যুদ্ধের এক বছর পর ১৯৬৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর 'বন্দী মুক্তি ও গণবাদী প্রস্তুতি কমিটি'র নামে একটা জনসভা ডাকা হয়। এতে রাজবন্দীদের মুক্তি ও জিনিসপত্রের দাম কমানোর জন্য আন্দোলন শুরু হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৬৪ সালে বাম শিবিরের নেতৃত্বে নতুন করে ছাত্র ফেডারেশন গড়ে তোলে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন শুরু হয়েছিল আগে থেকেই। ১৯৬২ তে জ্যোতি বসু ও

চিনা নেতৃবৃন্দের কুশপুত্তলি দাহ করা হয়। তবে জ্যোতি বসু ও তাঁর অনুগামীরা রুশলাইন অথবা চিনলাইন কোনোটাই পুরোপুরি সমর্থন করেননি। সেই সময় এদের বলা হতো মধ্যপন্থী বা সেন্ট্রিস্ট। ১৯৬৪ তে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়। ভারতবর্ষে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি আই এম) জন্ম ১৯৬৪ সালেই। ১৯৬৪ সালেই আবার দ্বিতীয় দফায় কমিউনিস্টদের বন্দী করা শুরু হয়। কমিউনিস্টদের ডাকে সংগঠিত হয় বন্ধ। ১৯৬৫ সালের ২৬শে জুলাই ট্রামের ভাড়া-বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন হয়। ট্রাম-শ্রমিকেরা, কলকাতার ছাত্র সমাজও সেই সময় এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। আবার এরই মাঝে বেজে ওঠে ভারত-পাক যুদ্ধের দামামা। জঙ্গী-জাতীয়তাবাদের চাপে পিষ্ট হয় যাবতীয় গণ-আন্দোলন, নতুন করে আবার কমিউনিস্টদের ধর-পাকড় করা শুরু হয়। সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া তৈরির চেষ্টা করেছিল শাসকশ্রেণি। শান্তির দাবিতে এগিয়ে আসে ছাত্ররা।[২৬]

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতবর্ষের অর্থনীতি আরও ভেঙে পড়তে থাকে। দেশের শতকরা ষাট জন মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করতেন। শহরে বসবাসকারীদের মাথাপিছু আয় ছিল চল্লিশ টাকা, আর গ্রামে বাইশ টাকা। ১৯৪৮ সালে ভারতীয় পুঁজিপতিদের মোট পুঁজির পরিমাণ ছিল ৯০০ কোটি টাকা। আর সেটা ১৯৬০ সালের মধ্যে ৩০০০ কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছয়। মোট পুঁজির ৫০ শতাংশেরও বেশি ছয়টি বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত ছিল আর বিপরীতে খেটে-খাওয়া নিরন্ন শ্রমিকদের গড় মাসিক আয় ছিল মোটে ৫০ থেকে ১০০ টাকা। ক্ষুধার জ্বালায় এই সময় বহু মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নেয়। দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি, চাকরির বাজারে হাহাকার সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা, আর্টস বা সায়েন্সে এম.এ. পাশ করা ছাত্ররাও ব্যাঙ্কে করণিকের চাকরির জন্য আবেদন করছিল। তাছাড়া

১৯৬২ সালে বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু এবং ১৯৬৪ সালে জওহরলাল নেহেরুর মতো দায়িত্বশীল নেতার মৃত্যু এই দশকের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ।[২৭]

১৯৬৪ সালেই সুরভী প্রকাশনী থেকে দিব্যেন্দু পালিতের *ভেবেছিলাম* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে অবশ্য *উল্টোরথ* পত্রিকার একটি সংখ্যায় এটি মুদ্রিত হয়। এই উপন্যাসে সরাসরি রাজনীতির প্রসঙ্গ না এলেও উপন্যাসের কথকের বয়ান থেকে বোঝা যায় এই সময়ের চাকরির বাজার ঠিক কেমন ছিল। এই উপন্যাস জুড়ে রয়েছে ত্রিশ বছর বয়সী একজন যুবকের জগৎ ও জীবনের ছবি তার নিজের বয়ানে। উপন্যাস শুরু হচ্ছে দশ মাস বেকার থাকা 'কর্মহীনতার কমপ্লেক্সে' ভুগতে থাকা এক যুবকের হঠাৎ 'মর্নিং নিউজ'-এ চাকুরিপ্রাপ্তির খবর দিয়ে, আর উপন্যাস শেষ হচ্ছে চাকরি খুইয়ে পুনরায় বেকারত্বের পুনরুজ্জীবনের ঘটনা দিয়ে। দিব্যেন্দু পালিত নিজে দীর্ঘকাল সংবাদপত্রের অফিসে চাকরি করেছেন। তিনি ১৯৬১ সালে ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে* (অধুনালুপ্ত) সাব-এডিটর পদে কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯৬৪ সালে চাকরিক্ষেত্রে অপছন্দের কিছু একটা ঘটনা ঘটায় তিনি সেখানকার চাকরি ছেড়ে দেন। ঘটনাচক্রে ১৯৬৪ সালেই *ভেবেছিলাম* প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং এই উপন্যাসে যে তাঁর বেশ কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উঠে আসছে, সেটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। ষাটের দশকের একজন প্রাপ্তবয়স্ক বেকার যুবকের চাকরি করতে যাওয়ার সময়টুকু কীভাবে কাটে তার জীবন্ত ছবি পাওয়া যায় উপন্যাসের শুরুর দিকেই—

> সাধারণত এই সময়টা শুয়ে-বসে ও কাগজে চাকরি-খালির বিজ্ঞাপন পড়ে কাটে। আরও বেলা হলে, অর্থাৎ কর্মহীনতার কমপ্লেক্স কেটে গেলে বাইরে, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই। দশটা, সাড়ে-দশটায় লতু কলেজে বেরিয়ে যায়। তখন আরও একটু হাঁটি ও পকেটের অবস্থা বিবেচনা করতে করতে রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকি।[২৮]

উপন্যাসে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার 'কর্মহীনতার কমপ্লেক্স' শব্দটি এসেছে, কারণ উপন্যাসের মুখ্য বিষয়বস্তুই এটি। চাকরি পেয়ে যাওয়ার পরও সেই কমপ্লেক্স থেকে যুবসমাজের মুক্তি নেই। কারণ চাকরি পেয়ে যাওয়াতেই তো বিড়ম্বনা শেষ হয় না। চাকরি বাঁচানোর প্রক্রিয়াটি আরও মর্মান্তিক। এতে প্রতি পদে পদে রয়েছে চাকরি হারানোর ভয়, উপরতলার ধমক-চমক, একজন উপরতলার পদাধিকারীকে সন্তুষ্ট করে চললে অন্যজনের গোঁসা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। চাকরিক্ষেত্রের মুখ্য কার্যক্রমের পাশাপাশি উচ্চ পদাধিকারী সকল ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করে চলার আশ্চর্য ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারলেই যে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে তা নয়, প্রয়োজনে শঠ হতে হবে, অসততা করবার যথার্থ ক্ষমতা থাকা চাই। বিশেষত সাংবাদিক হিসেবে অত্যন্ত ধুরন্ধর না হলে, অসৎ উপায়ে খবর সংগ্রহ করে খবরের কাগজকে গৌরবান্বিত করতে না পারলে চাকরি থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এবংবিধ গুণাবলী না থাকায় এবং চাকরি পাওয়ার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আটঘাট বুঝে সেই সব গুণ আয়ত্ত করতে না পারায় যুবক অচিরেই চাকরি হারায়। সেই সঙ্গে ক্রমান্বয়ে নিজের প্রেমিকা বিনতার সঙ্গে বিবাহের সম্ভাবনাও হারায়। কারণ সমসাময়িক ভয়াবহ দুর্নীতি ও অসাধুতার মাঝে দাঁড়িয়ে সে সততা ও নৈতিকতার প্রতি আস্থাশীল ছিল—

> আমার ধারণা, মানুষ মাত্রেই ভালোমানুষ, সৎ ও উদার, এবং ভালোত্বের ধারাবাহিকতা মনের অগোচরেই তারা রক্ষা করে থাকে; অবচেতনার শুদ্ধতা পৃথিবীকে নিরন্তর শুদ্ধ করে তোলে।[২৯]

এই বিশ্বাস নিয়ে সে সবসময় সৎ থাকার চেষ্টা করেছে, আশেপাশের মানুষজনদেরও ভরসা করেছে, বিশ্বাস করেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসার মিস্টার ঘোষের বিনয় দেখে, ভদ্রতা ও আন্তরিকতায় বিমুগ্ধ হয়ে গল্প করতে করতে সংবাদপত্রের অফিসিয়াল সিক্রেট জানিয়ে ফেলেছে। বন্ধু বীরেনের দাদা ভয়ানক দুর্ঘটনায় হাসপাতালে ভর্তি—বীরেনের মুখ থেকে এই কথা শুনে সে বিশ্বাস করে মাঝরাতে নিজের ডিউটি

ফেলে বেরিয়ে বীরেন ও তার প্রাক্তন প্রেমিকার একটি বিশ্রী ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ফেঁসে যায় এবং থানা-পুলিসের চক্করে পড়ে। অবশেষে এইসব অভিযোগের দায়ভার বাধ্যত গ্রহণ করে যুবক চাকরিক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হয়ে আবার 'কর্মহীনতার কমপ্লেক্সের' চক্রব্যূহে প্রবেশ করেছে। অবশ্য প্রবেশ করার কিছু নেই, এই চক্রব্যূহের মধ্যেই সে ছিল। সমকালীন সময় থেকে যেমন মানুষের মুক্তি নেই, তেমনি এই চক্রব্যূহ থেকেও কোনও মধ্যবিত্ত যুবকের মুক্তি ছিল না। বন্ধু নিকুঞ্জের সঙ্গে কথোপকথনের সময় যুবকের বয়ানে শিক্ষিত বেকারদের একটা বাস্তব ছবি উঠে আসে—

> নাক দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া বের করে আমি বললাম, 'পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত জানো?'
>
> নিকুঞ্জ ঘাড় নাড়ল। সে জানে।
>
> 'এই সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে; প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু বেকারের সৃষ্টি হচ্ছে। ইটস্ বিকামিং এ মেনাস।'
>
> 'মেনাস' কথাটির ব্যবহার উপযুক্ত হয়েছে ভেবে যখন মনে মনে গর্ব অনুভব করছি, তখন হঠাৎ কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা লরির উপমাটি আমার মনে পড়ল। যেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতি বছর কিছু-না-কিছু শিক্ষিত যুবকের মানপত্র দিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করার দায়িত্ব পালন করছে। অর্থাৎ, কর্পোরেশনের লরি। যেন সেই স্তূপীকৃত জঞ্জালের একাংশে আমি নিজেও পড়ে আছি, পরস্পরের বিক্ষোভের গন্ধে সর্বাঙ্গে ক্রমশ পচন ধরছে।[৩০]

চাকরি পাওয়ার অব্যবহিত পরে যুবক মনে করবার চেষ্টা করেছিল এই পচনশীল সময়ে দাঁড়িয়েও জীবন আসলে সুন্দর, মহৎ। সমস্ত মানুষ আসলে অন্তর থেকে ভালো এবং সৎ। কিন্তু সেই মনে হওয়ার পেছনে কোথাও যেন কৌতুক ছিল, ব্যঙ্গের ভাব ছিল, কারণ লেখক দিব্যেন্দু পালিত জানতেন তিনি যুবকের কী পরিণতি দেখাতে চলেছেন। যুবকের

বয়ানে এখানে যেন লেখক দিব্যেন্দু পালিত কথা বলেছেন। উপন্যাসে দেখা যায়, যথাসাধ্য মনোযোগ দিয়ে এডিটোরিয়াল লিখে, ওভার টাইম করে, সুবোধবাবু এবং মিস্টার সেনগুপ্তের মতো উপরতলার অফিসারদের তৈল-মর্দন করেও যুবক শেষ-রক্ষা করতে পারেনি। তার মতো আরও হাজারো 'কোয়ালিফায়েড ইয়ংম্যানদের' পিছনে ফেলে ট্রেনিং পিরিয়ড থেকে 'কনফার্ম' হওয়ার জন্য যে পরিমাণ ধুরন্ধর এবং স্বার্থপর হওয়া প্রয়োজন ছিল, সে তা হতে পারেনি। চাকরিক্ষেত্রের অনিশ্চয়তার কথা সে তার প্রেমিকা বিনতাকে জানানোর পর বিনতাও তার সততার প্রতি বিরূপ মনোভাবই দেখায়—

> বিনতা বলল এ-সব কথা তাকে বলার উদ্দেশ্য কী বুঝতে পারছে না। তা ছাড়া, সততার সঙ্গে চাকরি থাকা বা না-থাকার কোনো সম্পর্ক আছে বলে সে মনে করে না। বরং একটু কম সৎ থেকে যদি চাকরিটা বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তাহলেই খুশি হবে।[৩১]

বিনতা তার প্রেমিকের মতো জগৎ ও জীবন নিয়ে আকাশ-কুসুম ভাবে না। সে ভাবালু নয়, ঘোর বাস্তববাদী। তাই যথার্থ আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করে তবে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে আগ্রহী সে।

নির্লিপ্ত, নির্বিকার স্বার্থপরতা মধ্যবিত্তের আসন্ন সংকটগুলির মধ্যে অন্যতম। মানুষ নিজের স্বার্থ নিয়ে যত ব্যস্ত থাকবে, ততই সে সামাজিকবন্ধন বিমুখ হয়ে উঠবে আর তার পাশাপাশি কর্পোরেট-সংস্কৃতির দাস হয়ে উঠবে। কর্পোরেট-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে 'মেট্রোপলিটন সংস্কৃতি ও মধ্যবিত্তের সংকট' প্রবন্ধে প্রগতি মাইতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন—

> মানুষের মধ্যে কোনোরকম ঐক্য যাতে গ'ড়ে না-ওঠে, অথবা মানুষ যাতে কোনোভাবে সংঘবদ্ধ না-হতে' পারে— তার জন্য ভাষা, ধর্ম, জাতপাত, আঞ্চলিকতা— এগুলিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। একেবারে ঠুনকো বিষয় নিয়ে চলছে একই শ্রেণির মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী খুনোখুনি, এমনকি দাঙ্গাও। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে যৌনতা ও নেশার বাড়বাড়ন্ত। মানুষকে বুঁদ ক'রে

রাখার হিটলারীয় পদ্ধতি আজও সুকৌশলে প্রয়োগ হচ্ছে। বিজ্ঞানের কারিগরি দিকের প্রভূত অগ্রগতি হ'লেও মানুষের চিন্তাচেতনায় বিজ্ঞানের প্রভাব দূরঅস্ত। বরং ভাববাদ যুক্ত হয়ে কার্যত সর্বনাশের জমি উর্বর করার সর্বত প্রয়াস চলেছে। এ যুগের সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিক গণমাধ্যম যথেষ্ট শক্তিশালী। এরাও সংস্কৃতির একটা বড়ো অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।...এই দু'টি মাধ্যমের উদ্দেশ্য ও কারসাজি সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ সচেতন নয়। এরা— এই দুই মাধ্যমের সংবাদ তথা অন্যান্য মন্তব্যগুলি টপাটপ গিলে নেয়। গণমাধ্যমের এজাতীয় ভূমিকা মধ্যবিত্তের সংকটে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।[৩২]

এই গণমাধ্যমের যথার্থ অংশ হয়ে উঠতে পারেনি *ভেবেছিলাম* উপন্যাসের কথক-যুবক। তাই 'কর্মহীনতার কমপ্লেক্স' এবং দৈনন্দিন একাকিত্বের অবসর-যাপন থেকে তার মুক্তি নেই।

৩

খাদ্যের অভাব এবং চাকরির অভাবের সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতি-নির্ধারণে বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা। ১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে আবার খাদ্য-আন্দোলন শুরু হয়। সরকারি সামন্তবাদী ভূমিনীতি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের ভুল খাদ্যনীতি এই খাদ্য-আন্দোলনের প্রধান কারণ। ১৯৬৬ তে যে খাদ্যনীতি নেওয়া হয়েছিল, তা ছিল আসলে জোতদার এবং মজুতদার তোষণনীতি। খাদ্যের এই লড়াইয়ে রাজ্যের সেচমন্ত্রী গঠন করেন নতুন দল 'বাংলা কংগ্রেস'। ১৯৬৬-র ৬ই মার্চ দুটো আলাদা আলাদা খাদ্য-কনভেনশনে, কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে একটি এবং বাংলা-কংগ্রেস ও সহযোগীদের উদ্যোগে আরও একটি কর্মসূচী নেওয়া হয়। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময় থেকে মার্চের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-আন্দোলন চলেছিল। খোলা বাজারে চাল ছিল না, কিন্তু কালো বাজারে ছিল। রেশন থেকে পুরো চাল পাওয়া যেত না, যা পাওয়া যেত তাও ছিল

অখাদ্য। কেরোসিনের অভাবে অন্ধকারে ডুবে থাকত গ্রাম-জনপদ। চাকরির অভাব তো ছিলই, কারখানাগুলিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ৪৭–এর উদ্‌বাস্তুদের মতো ৬৬-৬৭ তেও পশ্চিমবাংলার গ্রামের মানুষ দলে-দলে এসে ভিড় করছিল শহরাঞ্চলে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের জন্য মাথা পিছু আড়াই ছটাক, আনুমানিক ১০০ গ্রাম রেশন বাড়িয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু খাদ্য-আন্দোলন শেষ হয়ে গেলেও অদ্যাবধি খাদ্য-সমস্যার সমাধান হয়নি। ছাত্র ফেডারেশনে এই সময় দুটি শিবির তৈরি হয়, একটি রক্ষণশীল দল এবং অপরটি অপেক্ষাকৃত তাজা তরুণ যুক্তিবাদীদের নিয়ে তৈরি করা রাডিক্যাল দল। খাদ্য-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে একঝাঁক তরুণ সক্রিয় কর্মী রাডিক্যালদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক সেই সময় ছাত্র-ফেডারেশনের রক্ষণশীল অংশে যোগদান করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অনিল বিশ্বাস প্রমুখ।[৩৩]

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চতুর্থ সাধারণ-নির্বাচনে ভারতের ১৫ টি রাজ্যের মধ্যে ৮ টি রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হয়। একটানা আধিপত্যের পর কংগ্রেসের এই পরাজয় ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলা-কংগ্রেস দলের অজয় মুখার্জীকে মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদে বসিয়ে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরও শূন্যগর্ভতাই আরও প্রকট হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট ও সোশালিস্টদের নিয়ে তৈরি ক্ষমতাশালী প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে মানুষের মোহমুক্তি ঘটতে দেরি হয়নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিকদের দমন করতে অকথ্য অত্যাচার চালায়। তাই শ্রমিকদের ক্ষোভ বন্ধনহীনভাবে ফেটে পড়েছিল ঘেরাও, হরতাল এবং লাগাতার বন্‌ধের মাধ্যমে। মালিক শ্রেণির আক্রমণের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শ্রমিকেরা সর্বাত্মক ধর্মঘট ডাকে।[৩৪]

১৯৬৭ সালের ২২শে মে উত্তর-বাংলার তরাই অঞ্চলের নকশাল-বাড়িতে ১৮ জন কৃষক, মহিলা ও শিশুকে গুলি করে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে পুলিশ হত্যা করেছিল। ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাডিক্যাল নেতৃত্বে কৃষক-বিদ্রোহের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ২৪শে মে এই খবর বেরিয়েছিল কলকাতার কাগজগুলিতে। ২৫শে মে কলকাতার সমস্ত জনবহুল এলাকার দেওয়ালগুলি পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে যায়। যেসব ছাত্ররা লাগাতার এই প্রচার চালায়, তাদের রক্ষণশীল দল সাধারণ নির্বাচনের আগে এবং পরে দল থেকে বহিষ্কার করেছিল।

ভারতীয় শাসকদের রাজনীতি বা অর্থনীতির ব্যর্থতা সেই সময় ছাত্রদের কাছে যত প্রকট হয়ে উঠছিল, ততই তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল বামপন্থীদের আচরণ। নকশালবাড়ির ঘটনার পর ছাত্ররা বুঝতে পেরেছিল ভালো কথায় আর কাজ হবে না, তাদের আন্দোলনে নামতে হবে দৃঢ় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে। এই সময়ই শ্রেণিশত্রু খতমের ডাক আসে নকশালদের তাত্ত্বিক নেতা চারু মজুমদারের কাছ থেকে। তাঁর মতে, চিনের পথই ছিল একমাত্র অনুসরণযোগ্য পথ। প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, শ্রমিক, কৃষক এবং নিপীড়িত মানুষ যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করবে না নকশালবাড়ির সশস্ত্র বিদ্রোহের পথকে সমর্থন করবে। শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষের ওপর নেমে আসা শোষণ এবং বঞ্চনার প্রতিকারে তাদের যে প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি ছিল, সেগুলি খুব সহজেই বুদ্ধিদীপ্ত তরুণদের আস্থা অর্জন করেছিল। তাই সেই সময় বাম এবং দক্ষিণ দলগুলি অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে ওঠে এবং দু-দলই তখন কিছু অনুগত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবছাত্রকে দলে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দিতে শুরু করে।[৩৫]

১৯৬৭ সালে নকশাল-বাড়ি ঘটনার ছয় মাস পরে অর্থাৎ নভেম্বর মাসে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় বৈঠকে স্থির হয়, কৃষক বিপ্লবকে সাহায্য করার পাশাপাশি শ্রমিক বিপ্লবের বিকাশের জন্য মাও সে তুং-এর চিন্তার প্রচার চালিয়ে একটি সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হবে। ১৯৬৮ সালের মে মাসে গঠিত হয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি। ১৯৬৯ সালে পার্টি গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ঠিক দুই মাস পর ১৯৬৯ সালেই সি পি আই (এম) দল ভেঙে সি পি আই (এম এল) দলটি গঠিত হয়, যাদের সাধারণভাবে 'নকশাল' বলে চিহ্নিত করা হয়। এই পার্টির সম্পাদক ছিলেন চারু মজুমদার। এখানে রাডিক্যাল ছাত্রদের কৃতিত্বই ছিল সিংহভাগ। সাধারণ ছাত্র-আন্দোলনের চেহারা বদলে গিয়ে ছাত্রগোষ্ঠী তখন এক বিরাট রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীর রূপ নেয়, কিন্তু তাদের ভিতর মতাদর্শগত বিপুল ভ্রান্তি রয়ে যায়। 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা' বা দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের যে উদ্যোগ ছাত্ররা নিয়েছিল, তাকে অকার্যকরী করার চেষ্টা চলছিল বিভিন্ন দিক থেকে। এরপরই শুরু হয় ছাত্র-যুব সমাজের অন্ধকার অধ্যায়। পুলিশের সঙ্গে দক্ষিণ এবং বাম দলগুলিও নেমে পড়েছিল নকশাল-নিধনে। এরপর ছাত্ররা শুধু কৃষি-বিপ্লব বা গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার লড়াইয়ে আটকে থাকতে চায়নি। ১৯৬৮ সালে জব্বলপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্ররা বিক্ষোভ করেছিল 'ডিগ্রি চাই না, চাকরি চাই' স্লোগান তুলে। ব্যক্তি-হত্যা, মূর্তি ভাঙা, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ জনসাধারণকে আরও বিভ্রান্ত করে তোলে। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার বাসনা ছিল নকশাল-নেতাদের। ১৯৭৫ সালকে তারা বিপ্লবের চূড়ান্ত বছর বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলন সর্বাত্মকভাবে বিফলে গিয়েছিল কারণ, তাদের জটিল তত্ত্ব, কৃষি-বিপ্লব আনার পদ্ধতি সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে ছিল। কৃষক, শ্রমিক যাদের জন্য এই লড়াই, তত্ত্বের জটিল ঘেরাটোপের কারণে তাদের কাছ থেকেই বহু দূরে সরে

গিয়েছিল এই আন্দোলন এবং আন্দোলনকারীরা। কিছু অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত, পরিশীলিত, সংস্কৃতিমনস্ক যুবসম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত হতাশা, দুর্মর আবেগ ভ্রান্ত পথে বিস্ফোরণের আকারে এই আন্দোলনের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে, যার ফলে সেই সব অত্যন্ত সম্ভাবনাময় তরুণদের অকাল-বিনাশ ঘটে। ১৯৬৯ সালে থেকেই প্রশ্ন উঠছিল এই আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে, গ্রামের সব জোতদারই কি শ্রেণিশত্রু? শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি মালিকই কি বিদেশি ব্যবসাদারের দালাল? সর্বত্রই কি সশস্ত্র কৃষক-সংগ্রামের অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছে? এই ধরনের বিচ্ছিন্ন প্রশ্নবাণের সামনে নকশাল-নেতারা অটল ছিলেন তাঁদের খতম-অভিযান করার সিদ্ধান্তে এবং তাঁদের গেরিলা বাহিনী সংগঠন করার তৎপরতায়। ১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই নকশাল-নেতা চারু মজুমদারকে গ্রেফতার করার পর এই আন্দোলন প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে এগিয়ে যায়। ২৮শে জুলাই হৃদরোগে তিনি মারা যান বলে ভারত সরকার ঘোষণা করে। তিনি মারা যাওয়ার আগে অনুভব করেছিলেন, শ্রেণি-সংগ্রামের আসল কাজ ক্ষমতা দখল করা, খতম করা নয়। জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ। ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে কলকাতা ও শহরতলীতে পুলিশি আক্রমণ, বীরভূমের গ্রামে কৃষকদের সশস্ত্র-সংগ্রাম, দলের ভেতর ভাঙন শুরু হওয়ায় অনেকের মধ্যেই পালটা দল গঠন করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। পুলিশি আক্রমণের পালটা জবাব দিতে নকশালরাও পুলিশ-নিধন করায় মেতে উঠেছিল। কিন্তু পুলিশের বড়োকর্তাদের গায়ে হাত দেওয়ার সুযোগ তাদের ছিল না। ফলত ছোটোখাটো কনস্টেবল মেরেই তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা মেটাতে হতো। বহু পুলিশকর্মী গ্রামীণ কৃষক ও পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষদের ওপর অত্যাচার চালাত, সন্দেহ নেই, কিন্তু ছোটোখাটো পুলিশ মেরে সেই সমস্যার আদৌ কোনও সমাধান করা সম্ভব ছিল না। এর ফলে নকশাল-আন্দোলনের ভ্রান্তির দিকগুলি আরও

প্রকট হয়ে উঠছিল এবং সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছিল পুলিশি নির্যাতন। বহু উজ্জ্বল তরুণের ভবিষ্যৎ এই নির্যাতনের শিকার হয়েছে।[৩৬]

১৯৭০ সালের ১৫ ই মার্চ অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবসান হয়। রাডিক্যাল ছাত্রনেতাদের অধিকাংশই গ্রামে চলে যায়, অন্যদিকে শহরে যারা ছিল তারা বন্‌ধ, হরতাল, ভাঙচুর চালিয়ে সাধারণ মানুষের মন থেকে আরও দূরে সরে যায়। এদিকে কংগ্রেসের ভিতরেও তখন ক্ষমতার লড়াই নিয়ে আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঞ্জীব রেড্ডির বিরুদ্ধে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী মনোনীত করেন ভি. ভি. গিরিকে। দুই কমিউনিস্ট পার্টিসহ পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের সদস্যরাও ভোট দিয়েছিলেন ভি. ভি. গিরিকেই। গিরি মহাশয় রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় বিরোধীদের সমর্থনে সংখ্যালঘু সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালিয়েছিলেন। নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও শক্তি-সংহত করে ১৬ই মার্চ অজয় মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় দ্বিতীয় ফ্রন্ট সরকারকে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেছিলেন। এর ফলে বাম এবং অবাম দলগুলির কেন্দ্রে ন্যাশানাল কোয়ালিশন সরকার গঠনের আশা দূরীভূত হয়। তাছাড়া ১৯৭০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৪ টি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করে ইন্দিরা গান্ধী নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করতে সক্ষম হন।[৩৭]

ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের বাতাবরণ। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে নির্বাচন হয়। পাকিস্তানি শোষণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামি লীগ ও তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান গণ-আন্দোলনের সূচনা করেন। এরপর পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর নেমে আসে ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর বর্বর আক্রমণ। ভারতবর্ষ সেই সময় পূর্ব-পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। ১৯৭১

সালের ডিসেম্বর মাসে ঘটে যায় পাকিস্তান-বিভাজন, অনিবার্য হয়ে ওঠে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ১৯৭১ সালে রাশিয়া বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সেই যুদ্ধে ভারতবর্ষের পাশে দাঁড়ায়। ভারত-রাশিয়ার মিলিত শক্তির কাছে পরাস্ত হয় পাকিস্তান। জন্ম হয় নতুন রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'-এর। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ জুড়ে তখন ইন্দিরা গান্ধীর জয়জয়কার। ১৯৭২ সালে তাঁকে 'ভারত রত্ন' সম্মানে ভূষিত করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ১৯৭১ এর পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় নির্বাচিত হন ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দল নব কংগ্রেস। ১৯৭২ এর বিধানসভা নির্বাচনেও প্রায় সর্বত্র কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আস্ফালন দেখা যায়। এই বছর সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়। এই পঞ্চম সাধারণ-নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল ২১৬ টি আসন। মন্ত্রীসভায় যোগ না দিলেও সি পি আই কিন্তু তখন কংগ্রেসের সহযোগী ছিল। সি পি আই (এম) স্বল্প সংখ্যক আসন পেয়ে ভোট পদ্ধতিতে ব্যাপক জালিয়াতি ও রিগিং–এর অভিযোগ তুলে বিধানসভা বয়কট করে।[৩৮]

১৯৭২ সালে ইন্দিরা গান্ধী 'গরিবি হটাও' শ্লোগান তুলে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক নীতি, যেমন কৃষি-উন্নয়ন, বেকার যুবকদের স্বনিযুক্তি-প্রকল্প, মজুরি-বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্যকরী করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর কোনও সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা যায়নি, বরঞ্চ ১৯৭৩ সালের মধ্যে শিল্প এবং চাকুরি ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর দুরবস্থা দেখা যায়।[৩৯] যেকোনো সামাজিক ঘটনারই প্রধান ভুক্তভোগী হয়ে থাকে মধ্যবিত্তের দল। আবার তাদের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় যুবক-যুবতীরা। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বারবার রাজনৈতিক প্রতারণার শিকার হওয়ার ফলে অস্থিরতা, নৈরাশ্য, অবসাদ, বিষণ্ণতা, আত্মতুষ্টি, আত্মশ্লাঘা, আত্মপ্রতারণা, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদির সমাবেশে মধ্যবিত্ত যুবকদের মধ্যে ক্রমশ আত্ম-অবমাননার পরিমাণ বাড়তে

থাকে এবং আত্মবিশ্বাস তলানিতে এসে ঠেকে। তার ফলে যাদের নায়ক হওয়ার কথা ছিল তারা হয় খলনায়ক হয়ে ওঠে, নতুবা শুভবোধসম্পন্ন অনুভূতি বিমুখ হয়ে নিষ্ক্রিয় জড়বস্তুতে পরিণত হয়।

দিব্যেন্দু পালিতের লেখক-জীবন শুরু ১৯৫২ সালে স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক ডামাডোলের পরিস্থিতিতে। তবু রাজনীতি খুব সরাসরি তাঁর উপন্যাসে অনুপ্রবেশ করে না। *ভেবেছিলাম* উপন্যাসেও তাই দেখা যায়। কিন্তু *আমরা* (১৯৭৩) উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথমবার দেখা যায়, সত্তরের দশকের রক্ত ঝরানো দিন, বামফ্রন্ট সরকারের উত্থান এই উপন্যাসের ভাবধারা, গতিবিধি নির্মাণ করেছে। সমকালীন এক যুবক প্রিয়নাথ মজুমদারের জীবনকে ঘিরে দেখানো হয়েছে সময়ের অসহিষ্ণুতা, পুঞ্জীভূত ব্যথা, ক্ষোভজনিত অসাড়তা। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে বারবার ঠকে যাওয়া, ঘা খাওয়া হতাশ, নিরুদ্‌বেগ মানুষগুলোর প্রতিনিধি প্রিয়নাথ। ট্রাম, বাস আরও অনেক শহুরে শব্দের ভিড়ে প্রিয়নাথের অগোছালো, নিরুত্তাপ দৈনন্দিন গতানুগতিকতার গল্প এটি। এখানে কোনও বৈচিত্র্য নেই। বরঞ্চ একঘেয়ে অস্বস্তিকর দম-আঁটা পরিবেশে পেট্রল-ডিজেল আর ঘামের দুর্গন্ধ এই উপন্যাসের কঙ্কাল রচনা করেছে। দুর্ভাগ্যপীড়িত মধ্যবিত্তের অসহায়তা, দীর্ঘকালীন বিরক্তিজনিত বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা সেই কঙ্কালের ওপর মাংস আর ত্বকের প্রলেপ দিয়েছে। জমে ওঠা কালচে রক্তের মতো উপন্যাসের যত্রতত্র রয়েছে পুঞ্জীভূত বেদনা। কিন্তু সে বেদনা আজন্মলালিত হতে হতে স্থবির হয়ে পড়েছে। তা আর যন্ত্রণার তীব্রতা নিয়ে টনটন করে ওঠে না, শুধু ঘটনা নির্বিশেষে সে বেদনার মধ্যিখানে কখনো-কখনো চোরাস্রোত খেলে যায়।

যুবকের নাম প্রিয়নাথ মজুমদার। চৌঁত্রিশ বছর বয়সে আটান্ন কিলো ওজন এবং পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির আধময়লা রঙবিশিষ্ট গড়পরতা চেহারা নিয়ে মন্দার বাজারে কোনোক্রমে সে একটি বেসরকারি চাকরি জোটাতে পেরেছে। আট বছরে কচ্ছপের গতিতে বাড়তে বাড়তে তার মাইনে দাঁড়িয়েছে চারশো সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা। হাতে পায় আরও কম। সাদামাটা রোগাটে গড়ন নিয়ে বেকারত্বের বাজারে কোনোরকমে একটা খুঁটি ধরে তার মধ্যবিত্ত জীবনে দুটি উপরি পাওনা জুটেছে, একটি তার প্রেমিকা তনুশ্রী সরকার। বয়স ছাব্বিশ, প্রিয়নাথের মতে ত্রিশও হতে পারে। প্রিয়নাথের প্রতিটি কথায় তনুশ্রীর সঙ্গে তার ভালোবাসার কথা বারবার ফিরে আসে। কারণ তার চৌঁত্রিশ বছরের কেজো মধ্যবিত্ত জীবনে প্রাপ্তি বলতে বি.এ. পাশ, সরকারি অফিসে চাকুরিরত, বেশ সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, কেশবতী, শ্যামবর্ণ তনুশ্রী। পিতৃ-মাতৃহীন বৈচিত্র্যহীন জীবনে আহ্লাদিত হওয়ার মতো ঘটনা তার একটিই, কোনও এক বর্ষার রাতে তনুশ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পরবর্তীকালে প্রেম। খবরের কাগজে ‘পাত্রী চাই’–এর বিজ্ঞাপন ছাড়াই বর্ষার রাত তাকে এমন একজন সুপাত্রী উপহার দিয়েছে। পাঁচ বছরের পুরোনো প্রেমে ‘প্রেম করছি’ ভাবটুকু নেই কিন্তু আহ্লাদটুকু রয়ে গেছে। পোক্ত প্রেম, যথেষ্ট বয়স, বাড়িতে জানাজানি এইসব প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়নাথ বিয়ের দিকে এগোনোর সাহস করে উঠতে পারেনি কারণ তনুশ্রীর সরকারি চাকরির শক্ত খুঁটি থাকলেও তার অর্থ-সংস্থানের খুঁটি বড়োই নড়বড়ে। হঠাৎ দুশো-তিনশো টাকার দরকার হলেও তাকে হাত পাততে হয় তার বড়োলোক বন্ধু কৌশিকের কাছে।

প্রিয়নাথের দ্বিতীয় পাওনা আত্মীয়তা। তার দাদা আছে তবে সে স্ত্রীর সঙ্গে আলাদা থাকে। প্রিয়নাথের ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে দেওয়া ব্যতিরেকে তার সঙ্গে তার দাদার আর কোনও যোগসূত্র আছে বলে মনে হয় না। প্রিয়নাথের সঙ্গে থাকে তার থেকে প্রায় দশ বছরের

বড়ো পিসতুতো দিদি অমলাদি। বিয়ের সাত দিনের মধ্যে একটি ভয়ানক জিপ দুর্ঘটনায় অমলাদির স্বামী মারা যান। তার নয় মাস পরে অমলাদি তার প্রথম এবং শেষ সন্তান প্রসব করে যার আয়ু ছিল মাত্র তিন মাস। মাত্র নয় মাসের মধ্যে দুটি মৃত্যুর ঘা খেয়ে, কূট-কপালের দায় নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েও সে বাঁচতে চেয়েছে। প্রিয়নাথের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত বা বেঁচে থাকার আর্তি নিয়ে সে ছুটির দিন বাদে অন্য সব দিনেই খুব যত্ন করে তার রুমাল, আন্ডারওয়্যার, গেঞ্জি কেচে দেয়, তার জন্য রান্নাবান্না করে। জন্মদিনের দিন ঠিক মতো মনে রাখতে না পারলেও মাসটুকু মনে করে প্রিয়নাথের জন্য পায়েস রেঁধে দেয়। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে সে। তাই দুর্ভাগ্যের জ্বালা থাকার পাশাপাশি তার জিভের জ্বালা আর যৌনতার জ্বালাও রয়েছে। দুপুরবেলা একাকিত্বের জ্বালা কাটাতে সে পাড়া বেড়াতে যায়, এর-ওর খবর সংগ্রহ করে। লোভবশত লুকিয়ে প্রিয়নাথের জন্য আনা মাছ থেকে ভাগ বসায়। তনুশ্রীর সঙ্গে তার আলাপ আছে। সে তনুশ্রীকে খাতির করে চলে কিন্তু কখনোই প্রিয়নাথকে তনুশ্রীর সঙ্গে একা সময় কাটাতে দেয় না। সেটা রক্ষণশীলতার কারণে নাকি নিজের অবস্থানের সঙ্গে সমীভবন ঘটাবে বলে, তা বোঝা দায়। সত্তরের দশকে এসেও অমলাদির মতো বিধবাদের অবস্থান সমাজে খুব বেশি বদলায়নি। বিশেষত, সে যেহেতু আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী নয়, তাই এভাবেই অন্যের গলগ্রহ হয়ে তাকে কোনোরকমে টিকে থাকতে হয়।

অমলাদির মতো মাঝবয়সী আরেকজন চরিত্রকে এই উপন্যাসে পাওয়া যায়, সে তনুশ্রীর বৌদি সুধা। তনুশ্রী তার দাদা-বৌদির সংসারে থাকে কিন্তু সংসারের আর্থিক দায় তারই। কারণ তার দাদা নয়নাংশু অসুস্থ, পেটের রোগে শয্যাশায়ী। দুটি বাচ্চা নিয়ে সুধা নিজের ভাগ্যের সঙ্গে লড়ে যায়। নয়নাংশু এবং অমলা দুজনেই সংসারের বোঝা। তাদের স্বজনেরা তাদের টেনে নিয়ে যায় কেবলমাত্র দায়ভার থেকে এবং কিছুটা করুণাবশত।

অল্প বয়সে বৈধব্য পালনের সামাজিক ব্যাধি এবং নয়নাংশুর শারীরিক ব্যাধি দুটিই সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে থেকে প্রিয়নাথ ও তনুশ্রীর জীবনে প্রভাব ফেলে। তনুশ্রী প্রিয়নাথকে বিশ্বাস করে, সে তার বৌদি সুধার সুখ-দুঃখ অসহায়তা নিয়েও ভাবে। তাই সে প্রিয়নাথকে কিছু টাকা তার বৌদির হাতে তুলে দিতে বলে। সেই টাকা দিতে যাওয়ার সূত্র ধরে একদিন তনুশ্রীর অনুপস্থিতিতে, তার অজান্তে প্রিয়নাথ এবং সুধার মধ্যে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। ব্যাধিগ্রস্ত শরীর ও সমাজের আক্রমণে মনও হয়ে ওঠে ব্যাধিগ্রস্ত, পাপবোধে সংকুচিত হয়ে সুধা তারপর নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। কিন্তু প্রিয়নাথের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে কোনও ভাবান্তর দেখা যায়নি। প্রিয়নাথ অদ্ভুতভাবে নিস্পৃহ, নিরাসক্ত, উদাসীন। যেকোনো ঘটনাই তাকে খুব বেশি আন্দোলিত করে না, কোনও পাপ, কোনও পুণ্য কোনোকিছুতেই সে খুব বেশি বিচলিত হয় না। একধরনের নেতিবাচকতায়, দীর্ঘকাললালিত বিষাদগ্রস্ততায় সে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে অনেকটা সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) *বিবর* (১৯৬৫) উপন্যাসের বীরেশ বা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের (জন্ম-১৯৩৫) *ঘুণপোকা*-র (১৯৬৭) শ্যামের মতো। বীরেশ এবং শ্যামের ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায় এরা উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল কিন্তু চাকুরিক্ষেত্রের অসততা, অন্যায় এবং স্তাবকতাকে মেনে নিতে না পেরে একদিন হঠাৎ এরা চাকরি ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে, প্রিয়নাথ সাধারণ চাকরি করে। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার মতো সেভিংস বা সাহস কোনোটাই তার নেই। যেহেতু সে বিত্তগত অবস্থানের দিক থেকে শ্যাম এবং বীরেশের চেয়ে পিছিয়ে তাই ছেড়ে দেওয়ার থেকে নিজেকে অভ্যস্ত করিয়ে নেওয়াতেই সে বেশি বিশ্বাসী—

> দোষ দেবার, দায়ী করবার জন্যে আমি সে-রকম কোনো উপলক্ষ পাইনি বলেই সম্ভবত আরও সহনীয়ভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম ব্যাপারটায়। তারপর থেকে এই চাকরিটা আমার আর খারাপ লাগত না; খারাপ লাগত অন্য এবং নতুন কোনো চাকরি কেন পাচ্ছি না এই ভেবে। এই

ক'বছরে সবসুদ্ধ কতগুলো ইন্টারভিউ যে দিয়েছি মনে নেই।...শুধু একটা চাকরির ইন্টারভিউয়ের কথা এখনো আমার মনে আছে। ইন্টারভিউটা দিতে পারিনি। আর কোনো কারণে নয়; চিঠিটা এলো যেদিন ইন্টারভিউ তার দু'দিন পরে। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে চিঠি হাতে আমি গেলাম সেই অফিসে; খোঁজ করতে, যিনি হ্যান্ডেল করেন তাঁর কাছে পাঠানো হলো আমাকে। 'খামটা কোথায়?' চিঠিটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'খামটায় পোস্টিংয়ের ডেট দেখলেই বুঝতে পারতেন ইন্টারভিউটা যাতে না দিতে পারেন সেই জন্যেই দেরিতে পোস্ট করা হয়েছে। এ-নিয়ে মশাই মন খারাপ করবেন না। ইন্টারভিউ দিলেও কি চাকরি হতো![৪০]

সমকালীন বেকারির সমস্যা, অসৎ উপায়ে চাকরির লেনদেনের ছবি এখানে সুস্পষ্ট। *ঘুণপোকা* উপন্যাসেও চাকরির ইন্টারভিউর একটি চমৎকার ছবি দেখা যায়, যেখানে চাকরি যাতে না দিতে হয় তার জন্য উদ্ভট, অপ্রাসঙ্গিক সব প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয় শ্যামের দিকে। পরিবর্তে শ্যামের প্রতিক্রিয়া আসলে সমকালীন সমাজ, চাকরিক্ষেত্রের অসততা এবং ব্যবস্থাপনার প্রতি তীব্র ব্যাঙ্গাত্মক প্রতিবাদ।

চাকরিক্ষেত্রের হতাশাকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে নিজের বিত্তগত শ্রেণি সম্পর্কে একটা চাপা ক্ষোভ। মধ্যবিত্তের গল্পহীন গতানুগতিকতার প্রতি একটা আনুগত্য আছে বা বলা ভাল, সেই আনুগত্য মেনে চলতে সে বাধ্য কারণ তার হাতে বিলাসিতা করার মতো, জীবন ও যৌনতা সম্পর্কে যথেচ্ছ হয়ে ওঠার মতো বা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত সাদা ধবধবে পরিচ্ছন্ন ঘরে বসে বিয়ার খেতে খেতে ইংরেজি রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে রিল্যাক্স করার মতো যথেষ্ট অর্থ নেই। হাড়ভাঙা খাটুনি আছে কিন্তু আরাম করার উপায় নেই, স্বাদ-আহ্লাদ আছে কিন্তু পূরণ করার সামগ্রী বা সাহস কোনোটাই নেই। প্রিয়নাথ সেই ক্ষোভ থেকে প্রতি মুহূর্তে বিলাসিতা, কাব্যময়তা, কোমল, মধুর সবকিছুকে চ্যালেঞ্জ করেছে। চাকুরিজীবী সত্তার বাইরে তার মধ্যেকার লেখক সত্তা বারবার এমন কিছু গল্প এনে হাজির

করেছে, যেগুলি জীবন সম্পর্কে প্রচলিত শুভবোধ, কল্পনাবিলাস, কবিত্বকে তুলোধোনা করেছে। তার গল্পের চরিত্রেরা উঠে এসেছে তার জীবন থেকেই, তারা কখনও তার আটপৌরে বান্ধবী তনুশ্রী, কখনও অমলাদি, কখনও তার বড়োলোক বন্ধু কৌশিক। সেইসব গল্পে সে নিষ্ঠুরভাবে দেখিয়েছে কৌশিকের মতো বিত্তবানদের বহিরাঙ্গিক সমস্তকিছুই অস্বাভাবিক রকমের সাদা, পরিচ্ছন্ন। কোথাও এক চিলতে মালিন্যের কোনও স্থান নেই। গৃহকোণ থেকে গৃহবধূ সবই অসম্ভবরকমের মসৃণ এবং মূল্যবান। কিন্তু মনটা কলুষিত, কালিমালিপ্ত। তারা যখন-তখন যাকে-তাকে ব্যবহার করতে পারে, তনুশ্রীর মতো সাধারণ মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে কিন্তু তাকে ভালোবাসতে পারে না। কারণ তাদের কাছে শরীরের কোনও ক্লাস বা শ্রেণি নেই। *বিবর*-এর বীরেশ এবং *ঘুণপোকা*-র শ্যাম কৌশিকের মতো যথেচ্ছ নারীসঙ্গ পেয়েছে, বিলাসের ফোয়ারায় বহু-স্নান সেরেছে। তাই এই সমস্তকিছুর অসাড়তাকে অতিক্রম করে তারা একটা উচ্চতর বোধে পৌঁছতে পেরেছে। কিন্তু প্রিয়নাথ কোথাও যেন কৌশিকের মতো হতে চায়, হতে পারে না বলে কৌশিককে ঈর্ষা করে, কৌশকের দুর্দান্ত সুন্দর স্ত্রী মীনাকে ভোগ করার স্বপ্ন দেখে। বিত্তহীন বলে সে তার জীবনকে গল্পহীন, নিশ্চল বলে মনে করে। তাই তনুশ্রীকে নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে নায়ক হিসেবে বেছে নেয় কৌশিককে—

> তনুশ্রীকে নিয়ে আমি যে-গল্পটা লিখেছিলাম, তাতে আমার কোনো ভূমিকা ছিল না। সে-গল্পে কৌশিককে আনতে হয়েছিল স্পষ্ট দুটো কারণে; এক, কৌশিকই (বা যারা তার মতো) পারে অভ্যস্ত জীবন থেকে বেরিয়ে এসে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে, আর, তনুশ্রীর জীবনে যদি কোনো শোক আর অভিমান থেকে থাকে কৌশিকই পারে তা জাগিয়ে তুলতে। এটা আমার অক্ষমতা নয়, তনুশ্রীরও নয়। কিংবা, এমনও হতে পারে, দু'জনেই ডুবে আছি এক গভীর গল্পহীনতায়; চলা ও দাঁড়িয়ে পড়ার মধ্যে শুধু নড়ে ওঠে আমাদের শরীর। আর কিছু নয়।[৪১]

এই নৈরাশ্যের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় তনুশ্রীকে একান্ত করে পাওয়ার, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার উত্তেজনা, আর সেই উত্তেজনার সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে যায় সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশের উত্তেজনা, যুক্তফ্রন্ট সরকারের নয়া আগমনের উত্তেজনা—

> এইভাবে মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে আমি হাঁটতে শুরু করলাম তনুশ্রীর দিকে। পাশে মধু বিশ্বাস। চতুর্দিকে কলকাতা। পাশ দিয়ে পেরিয়ে যেতে যেতে তিনজন উৎসাহী চেঁচিয়ে গেল, 'যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ।' মধু সম্ভবত খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, ওর টাকের ওপর শিশিরবিন্দুর মতো বিজবিজ করছে ঘাম, এমনও মনে হলো আমার যে ওর শরীর কাঁপছে, বলল, 'চারিদিকে কী থ্রিল লক্ষ করেছেন!' বলে, উত্তর না শুনেই, বাঁ দিকে মোড় ঘুরল দ্রুত, 'চলুন, স্টেটস্‌ম্যানের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। লেটেস্ট রেজাল্টটা জানা যাবে।'[৪২]

কিন্তু প্রিয়নাথকে এই উত্তেজনা আদৌ স্পর্শ করে না। সে মাঝেসাঝে পাঞ্জাবি পরে, লেখালেখি করে কিন্তু কমিউনিস্ট নয়, আবার কমিউনিস্ট-বিরোধীও নয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার তার কাছে একটা অমূর্ত সম্ভাবনামাত্র। প্রিয়নাথ বিপ্লবের রঙিন স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে না। তার কাছে 'ক্লাস কনফ্লিক্ট' যা, 'সেক্স' এবং 'শেষ অব্দি ট্র্যাজেডি'-ও তা। এই তিনটি বিষয়ের সংযোগ তার কাছে রোমাঞ্চকর গল্প রচনা করার উপাদান ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। পারিপার্শ্বিক ইলেকশনের উত্তেজনা, ভোটের পোস্টারময় কলকাতার উত্তেজনার মাঝে দাঁড়িয়ে সে বা তার মতো অনেকেই প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে 'প্রিকসান' নেবে কিনা সেই কথা ভাবতে থাকে। চৌত্রিশ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে যে দেশে একজন মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি যৌনতার সাধারণ চাহিদা অতৃপ্ত থাকে, সেই দেশে প্রিয়নাথের মতো যুবকদের কাছে স্বাধীনতা, সংগ্রাম নেহাতই গাল-গল্প, আড্ডার ঠেকের খোরাক। তার বেশি কিছু নয়। তাছাড়া স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রবঞ্চনা প্রিয়নাথের

মতো যুবকদের মধ্যে যে হতাশাব্যঞ্জক ঔদাসীন্যের জন্ম দিয়েছিল, প্রিয়নাথের বয়ানে তা সুস্পষ্ট—

> এটা টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির শেষভাগ—এখন লোকে এইমাত্র ঘটনায় চমকায় না। ইতিমধ্যে কিছু মহৎ ব্যাপার আনতে হবে। নায়ককে তার ক্লাশের মধ্যে রেখেই ক্লাশের ওপরে নিয়ে যেতে হবে, একটা সংগ্রাম-টংগ্রাম কিছু দরকার। শেষ দৃশ্যটা এ-রকম হতে পারে—। নায়ক একটা মিছিল পরিচালনা করতে করতে এগিয়ে যাবে, তার ওপর হামলা হবে, ভাড়াটে গুণ্ডাদের হামলা—গুরুতর আহত হয়ে সে হাসপাতালে পৌঁছে যাবে। এ-খবর যখন নায়িকার কাছে পৌঁছুবে তখন সে বন্ধু পরিবৃত হয়ে হাসি-মস্করায় মশগুল। হঠাৎ টেলিফোন তাকে বিপর্যস্ত করে দেবে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে আসবে সে, তাদের দুটো গাড়ির একটাও তখন বাড়িতে থাকবে না, কারণ বাবা ও মা দু'জনেই বেরিয়ে গেছে, সুতরাং পায়ে হেঁটে —না, এখানে একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাওয়া ভালো। কারণ, আহত অজ্ঞান নায়ক চোখ খুলেই যাতে নায়িকাকে দেখতে পারে—'...পাবলিক এ-রকমই চায়। অগোছালো বলেই সাজানো দেখতে তার লোভ!'[৪৩]

ক্লাস-স্ট্রাগল, সংগ্রাম, কমিউনিজম, ভিয়েতনামের জয় এই সব ঘটনাই প্রিয়নাথের কাছে গালগল্পের মতো শোনায়। এগুলি তার কাছে কমার্শিয়াল ছবি বা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে উপাদেয়। কারণ স্বাধীনতা-পরবর্তী দাঙ্গা, দেশভাগ, বেকারত্বের বাজারে তাদের মতো সাধারণ মানুষদের জীবনের প্রাথমিক চাহিদাই পূরণ হয় না, সেখানে মিটিং-মিছিল, কমিউনিজমের জটিল তত্ত্ব, সুদূর ভিয়েতনামের জয়জয়কার নতুন করে প্রতারিত মনে আশা জাগায় না। প্রিয়নাথের সহকর্মী মধু বিশ্বাস বা অনাদি বোসের মতো কিছু মানুষ যদিও বা উত্তেজনায় গা ভাসায় কিন্তু তারা কেন উত্তেজিত, কোন বিষয় নিয়ে তারা মিছিলে গলা ফাটাচ্ছে, তা-ই তারা জানে না—

> 'ভিয়েতনাম জায়গাটা ঠিক কোথায়?' মধু জিজ্ঞেস করেছিল এইভাবে; আমি জিজ্ঞেস করি নিজেকে। তারও অনেকক্ষণ পরে খেয়াল হয় আমি দাঁড়িয়ে আছি একা, মিটিং চলছে পুরোদমে,

একজন খুব উঁচুতে উঠে চেঁচিয়ে যাচ্ছে : ‘এ সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম, আমাদের সকলের সংগ্রাম, সুতরাং এ-লড়াই জিততে হবে। মনে রাখবেন আমাদের প্রত্যেকের বুকেই আছে ভিয়েতনাম—।’[৪৪]

মিছিলে দাঁড়িয়ে ক্ষণিক-উত্তেজনায় ডুব দিয়ে মধু বিশ্বাস ফিরে যায় তার পরবর্তী সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য, অনাদি বোস একজন বেশ্যাকে ভালোবেসে দুঃখ করে খানিক মদ্যপান করে আর প্রিয়নাথ তার গতানুগতিক নৈরাশ্যময় গল্পহীনতায় গা ভাসায়। সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে এরা সরাসরি সম্পৃক্ত নয় কিন্তু রাজনৈতিক প্রতারণার ভুক্তভোগী। এদের হৃদয়, মস্তিষ্ক, স্মৃতি জুড়ে রয়েছে রক্তাক্ত রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ। অসুস্থ সামাজিক পরিবেশে এরা প্রত্যেকেই খুঁজে ফেরে নিজেদের অস্তিত্ব। শারীরিক অস্তিত্ববিহীন শব্দ-গন্ধময় এক আচ্ছন্নতায় ভরে থাকে প্রিয়নাথের মস্তিষ্ক—

আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের পাশ দিয়ে ক্রমাগত হেঁটে যাচ্ছে শব্দ—গাড়ির শব্দ, মানুষজনের নিরন্তর হাঁটাচলার শব্দ, ট্র্যাফিক পুলিসের হুইসিলের শব্দ—একগতি সমস্ত ছুটে যাচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে। তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে প্রায় স্পষ্ট ভিয়েতনামের প্রতিরোধের শব্দ, সংগ্রাম সম্পর্কিত অঙ্গীকারের শব্দ, অনাদি বোসের নিঃশ্বাস, আমার নিঃশ্বাস, হয়তো বা তনুশ্রী, সুধা, অমলাদি, নয়নাংশু, মধু বিশ্বাসের নিঃশ্বাসের শব্দ। এসব ভাবনায় হঠাৎ হাসি পায় আমার, হঠাৎ চেঁচিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে—কী অসীম কল্পনার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছি আমি![৪৫]

যুক্তিহীন, অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, গল্পহীনতার গল্প রয়েছে *আমরা* উপন্যাসে। অপার অর্থহীনতার মধ্যে হেঁটে যেতে যেতে বহু মানুষ, বহু অভিজ্ঞতা, বহু ঘটনা, বহু অনুভূতিই প্রিয়নাথকে স্পর্শ করে যায়, কিন্তু তার গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। সমস্তকিছুতেই তার গা ছাড়া ভাব, সহানুভূতির অভাব। আসলে সমকালীন পরিস্থিতিটাই ছিল সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার, নিজেকে এবং অপরকে প্রতারণা করার, নিজের থেকে নিজে পালিয়ে

বেড়ানোর। তনুশ্রী, অমলাদি, সুধা, নয়নাংশু এদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ঠিক কী, কতোটা গভীর, তার নিজের সঙ্গেই বা তার নিজের সম্পর্ক কী—এইসব প্রশ্ন প্রিয়নাথকে দোলা দিয়ে যায় কিন্তু সে উত্তর খুঁজতে ভয় পায়, পালিয়ে বেড়ায়, অস্তিত্বহীনতায় ভোগে। তখন তার মনে হয়—

> ...প্রিয়নাথ মজুমদার বলে সত্যিই কেউ নেই, আসলে সে আর ল্যাম্প-পোস্ট আর ট্রামের লাইন ইত্যাদি এক এবং অভিন্ন—হৃৎপিণ্ডহীন এক গণতন্ত্রের অংশ। বুক চিরলে গড়িয়ে পড়বে মরচের গন্ধময় এক অদ্ভুত তেল, আর কিছু কাচের টুকরো, বিস্কুটের টিনের ঢাকনা কিংবা অকেজো ট্রানজিস্টারের পুরো যন্ত্রপাতি।[৪৬]

ট্রাম, বাস, ধুলো, ধোঁয়ার ব্যস্ত দৈনন্দিনতায় বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে সে কঠিন একটা জড় বস্তুর মতো জীবনকে বয়ে নিয়ে যায়। আশেপাশের কোনও ঘটনা, কোনও মানুষের সঙ্গে যেন তার মায়ার বাঁধুনি তৈরি হয় না। সকলের মাঝে বসে 'নিজের মুদ্রাদোষে' সে নিজেই একা হয়ে পড়ে। তার প্রায়ই মনে পড়ে—

> ...কার্জন পার্কের ফুটপাথে বসে-থাকা এক ফেক্‌লু জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিল, 'তোমার জীবন খুব একার হবে।'[৪৭]

৪

পণ্য-সভ্যতায় লালিত কর্মক্ষেত্রগুলিতে এমন কিছু মানুষকে দিব্যেন্দু পালিত দেখিয়েছেন, যারা কোনও এক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি, যারা ভয়ানক রকমের সাফল্যকামী, আত্মকেন্দ্রিক। সব বিষয়ে স্বৈরাচারী না হলেও, যেন-তেন প্রকারেণ কাজ হাসিল করায় বিশ্বাসী। সাফল্য-লাভের ইঁদুর-দৌড়ে নেমে সাফল্য পাওয়ার সুতীব্র বাসনা এবং বিবেকের দংশন—এ দুইয়ের মাঝে পড়ে *সম্পর্ক* উপন্যাসের রামতনু সোম এবং *বিনিদ্র*-র দীপ্ত রে পণ্য-সভ্যতার ছোবল খেয়ে বিষের জ্বালায় ছটফট করেন। আর এঁরা

যে-সব প্রতিভাবান যুবকদের দিয়ে কাজ হাসিল করেন, তাদেরকেও নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন দিব্যেন্দু পালিত *ঢেউ* (১৯৮৭)–এর মতো উপন্যাসে। এদের অবস্থান কিন্তু *আমরা* উপন্যাসের প্রিয়নাথ বা *ভেবেছিলাম*-এর যুবকটির থেকে একেবারে আলাদা। আগের আলোচিত উপন্যাসগুলির বহু পরে এই উপন্যাসটি দিব্যেন্দু পালিত লিখেছেন। সুতরাং, খুব স্বাভাবিকভাবেই এখানে তাঁর লেখনী আরও পরিণত হয়েছে, চরিত্রগুলির গভীরতা আরও বেড়েছে।

এই উপন্যাস মুখ্যত দুজন মানুষকে ঘিরে আবর্তিত। একজন, 'অ্যাকশন গ্রুপ অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েটস'-এর 'কৃতী শোম্যান' বছর পঞ্চাশের অপরেশ গুপ্ত। অপরজন, অপরেশের কলকাতার অফিসের প্রতিভাবান, সংবেদনশীল, কল্পনাপ্রবণ ভাবালু যুবক অপূর্ব। অক্সফোর্ড থেকে পড়াশুনো করা, দুরন্ত কায়দায় ইংরেজি বলা কেতাদুরস্ত লোক অপরেশ। সে গোলগাল ফর্সা মুখবিশিষ্ট, মাঝারি উচ্চতার, মাথায় চকচকে টাকওয়ালা, খানিক মোটা ধাঁচের মানুষ। চেহারায় বিশিষ্টতা না থাকলেও ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য আর অসাধারণ কর্মদক্ষতার কারণে মাত্র পাঁচ-ছয় বছরের ব্যবধানে সে 'গিলবার্ট মরিসন হিকস'-এর চাকরি ছেড়ে নিজে 'অ্যাকশন গ্রুপ অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েটস' নামের একটি অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি খুলে বাজারে একটা আলোড়ন তুলে ফেলেছে। সাফল্যকে নিজস্ব ছকে বেঁধে নিজের কোম্পানি খুলে সে তার আগের কর্মক্ষেত্রকেও পেছনে ফেলে দিয়েছে। কুড়ি লক্ষ টাকা দিয়ে সূচনা হলেও মাত্র পাঁচ বছরে তার কারবার দেড় কোটি টাকার আশেপাশে দাঁড়িয়েছে। শুধু কলকাতা নয়, তার কোম্পানি বিস্তৃতি লাভ করেছে দিল্লিতে এবং ব্যাঙ্গালোরেও। 'গিলবার্ট মরিসন' থেকে নিজেকে মুক্ত করে যেদিন সে খোলা আকাশের নীচে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙেছিল, সেদিনই সে প্রথম বুঝেছিল কারো অধস্তন কর্মচারী হিসেবে কাজ করা তার

পক্ষে সম্ভব নয়, সে আসলে স্বাবলম্বী এবং স্বাধীন। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলেও স্বাধীনতা লাভের অমোঘ আনন্দ থেকে সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল, ঈশ্বর যেন তার সন্তানকে আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষতার এমন শীর্ষে পৌঁছে দেন যাতে সে যেকোনো চ্যালেঞ্জকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। তথাকথিত ঈশ্বর অপরেশের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন সর্বৈবভাবে, সে ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু যে স্বাধীনতার আশ্বাস লাভ করে তার ফাঁকা বুক একদিন ভরে উঠেছিল, সাফল্য লাভের দুর্বার প্রতিজ্ঞা সেই স্বাধীনতাকেই কেড়ে নিয়েছে। তার পদ, সৌজন্য, ব্যক্তিত্ব আকর্ষণ জাগায়, শ্রদ্ধা জাগায় কিন্তু তাকে আপন করে নিতে দেয় না। ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা, আনুগত্য পেলেও সে ভালোবাসার আন্তরিকতা থেকে বঞ্চিত। ব্যবসায়িক বৈভবের চূড়ান্ত স্তর স্পর্শ করার পরেও অপরেশ গুপ্ত তার একক সাম্রাজ্যের একাকী, নিঃসঙ্গ সম্রাট। স্বচ্ছলতার আরাম থাকলেও তার ঘুম আসে না, ঘুম আনার জন্য নিয়মিত মদ্যপান করতে হয়। স্ত্রী বীথি এবং অষ্টাদশী কন্যা সুজাতা রয়েছে কিন্তু কর্মব্যস্ততা এবং সাফল্যের দৌড়ের পর অপরেশের ক্লান্ত প্রাণ আর পারিবারিক বন্ধনকে পোক্ত করে গড়ে তোলার সুযোগ পায়নি। ব্যবসায়িক কারণে আজ দিল্লি, কাল কলকাতা করতে গিয়ে অপরেশের পক্ষে সবসময় পরিবারের খোঁজ রাখা সম্ভব হয় না, তার সেক্রেটারি মিসেস সান্যাল পারিবারিক যোগাযোগটুকু টেলিফোনের মাধ্যমে সারেন। তার তরুণী কন্যা সুজাতা যে তার পিয়ানো শিক্ষক দিলীপ ব্যানার্জীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে, রাতে বাড়ি ফিরছে না সে খবর অপরেশ রাখে না। মেয়ের দেখভাল পর্যন্ত করে না কিন্তু হঠাৎ স্ত্রীর মুখে কেলেঙ্কারির খবর পেয়ে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মেয়ের গায়ে হাত তোলে। দায়িত্বজ্ঞানহীনতার দীর্ঘ যাপনের পর আকস্মিক রূঢ় আক্রমণ দেখে আপাত শান্ত, নিরীহ বীথি ক্ষোভে ফেটে পড়ে—

> 'মারলে ওকে!' বীথি হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'তুমি কি মানুষ!'

সুজাতার স্তম্ভিত ও ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়েই অপরেশ বুঝতে পেরেছিল সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে ভুল সিদ্ধান্তটি একটু আগে কার্যকর করেছে সে। সংশোধনের সুযোগ নেই।

‘কী করেছ তুমি ওর জন্যে? কী করেছ তুমি আমার জন্যে?’ বীথি যেন ফিরে গিয়েছিল তার পুরনো হিস্টিরিয়ায়। বাঁশপাতার কাঠামোয় কাঁপছে শরীর, রক্তোচ্ছ্বাস মুখের ত্বকে। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ‘সেক্রেটারিকে দিয়ে বাড়িতে ফোন করিয়েই দায়িত্ব শেষ করো! তোমার কি একবারও মনে পড়েছে পরশু ওর জন্মদিন ছিল!’[৪৮]

অপরেশ ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিল দাম্পত্যের শুরুর দিকে, যখন সে সাফল্যমণ্ডিত ‘অপরেশ গুপ্তা’ হয়ে ওঠেনি, সেইসময়কার মিষ্টিমধুর ভালোবাসা, আন্তরিকতা তার জীবন থেকে চির-বিদায় নিয়েছে। সে সব মমত্বময় কোমলতা তার জীবনে আর ফিরে আসবে না। সে টাকার ক্ষমতার কাছে অসহায়। সে আসলে তার সাম্রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে না। টাকা তাকে এবং তার সাম্রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সে হাত-পা বাঁধা পুতুল মাত্র। ইচ্ছে হলেই সে তার চেম্বারের নিয়ন্ত্রিত তাপের বাইরে বেরিয়ে এর-ওর ডেস্কে গিয়ে খোশগল্প করে আসতে পারবে না। আগের মতো আড্ডা-গল্প-চর্চায় মেতে উঠে, সুখ-দুঃখের আদান-প্রদান করে মনকে হালকা করে ফেলতে পারবে না। সে অন্যদের থেকে বেশি সফল হতে চেয়েছে, হয়েওছে, তাই সে অন্যদের থেকে আলাদা, অপর, একাকী—

এখানে ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই অপরেশ গুপ্তর—শোক, দুঃখ, আনন্দ, সুখের একটা মেকানিক্যাল প্রসেস কাজ করে হয়তো, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে সেগুলো ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ? না, নেই। স্বাধীনতা নিয়ে যারা কথা বলে তারা জানে না সে নিজে আরও বেশি বন্দী; এই ঘরের চতুঃসীমায় ঘেরা তার গণ্ডি আরও ছোটো।...উল্টোদিক থেকে কেউ দেখলে শো-কেসের ভিতরে ডামি চোখে পড়ত। নাম—অপরেশ গুপ্তা; পেশা—বাণিজ্য; লক্ষ্য—সাফল্য, সাফল্য, সাফল্য। নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস, কেউ কি বলেছিল?[৪৯]

অপরেশ গুপ্তর হাত ধরে উপন্যাসে উঠে এসেছে বিজ্ঞাপন জগতের ছলনা, মিথ্যাচারিতা, টাকার নোংরা খেলার টুকরো টুকরো ঘটনা। চারিদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো বিজ্ঞাপনের এজেন্সি গজাচ্ছে, অপরেশের কোম্পানিকে বধ করার জন্যও ছিপ ফেলে বসে আছে 'অল অ্যাঙ্গলারস'-এর মতো নতুন কোম্পানি। পণ্য-সভ্যতার সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে ক্ষতিকারক সন্তান বিজ্ঞাপনের জগৎটাই এমন, যেখানে নীতি-নৈতিকতার ধার ধরলে চলে না। ঝকঝকে, রঙিন, আকর্ষণীয় মিথ্যের বেসাতি গড়ে না তুলতে পারলে টাকার অঙ্ক কমতে থাকে, প্রোডাক্ট হাতছাড়া হয়ে যায়। একটা অত্যন্ত সাধারণ দ্রব্যকে বিজ্ঞাপনের রঙিন মোড়কে পেশ করে জনপ্রিয় করে তোলা যায়। তাই লোক ঠকানোর এই নৈতিকতাবিহীন প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রায়শই দরকার পড়ে অসাধারণ সুন্দর, আকর্ষণীয়, লরেটোয় পড়া, ডিভোর্সি তুখোড় মেয়ে সীতা চৌধুরীর। 'বিউটি প্রোডাক্টস লিমিটেড'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর লম্পট লাডলীমোহন সরকারের থেকে সাবানের বিজ্ঞাপনের প্রোজেক্ট সে-ই ছলে-বলে-কৌশলে এনে দিয়েছিল অপরেশকে—

> 'ক্রেজ' সাবানটা বাজারে লেগে যাবার পর বোরোক্রিম ছেড়েছিল, ফেসিয়াল মেক-আপ, সেটাও হিট। অথচ মালে কিছু নেই। নিতান্তই বোরিক পাউডার মোলায়েম করে জুঁইয়ের সুবাস মেশানো। দুটো প্রোডাক্টই চটপট লেগে যাওয়ায় এখন প্যাকেজের দিকে ঝুঁকছে, বলছে ফ্রেঞ্চ ফরমুলেশন নিয়ে আরও তিনটে প্রোডাক্ট ছাড়বে শীগ্রি। খবরটা সীতাই এনেছিল।[৫০]

সীতা কখনও ব্যক্তিগত সম্পর্কের জেরে, কখনও নিজস্ব দক্ষতা দিয়ে ক্লায়েন্টদের আস্থা অর্জন করলেও লাডলীমোহনের ক্ষেত্রে কাজ করেছিল তার রূপ, সৌন্দর্য, তার 'মিলিয়ন ডলার স্মাইল'। শুধু কাজ এনে দিলেই চলে না, বিজ্ঞাপনকে এমন আকর্ষণীয়ভাবে হাজির করতে হয় যাতে জনগণকে সহজেই বোকা বানানো যায়। তার জন্য প্রয়োজন হয় দামি মডেলের যৌনতায় ভরপুর উত্তেজক উপস্থিতি—

'স্নিগ্ধা' গায়ে মাখার সাবানের জন্যে মডেল বাছা হয়েছিল টালিগঞ্জের এক উঠতি অভিনেত্রীকে; এর সঙ্গেও এক ফুটবলারকে জড়িয়ে খবর ছাপা হয়েছিল বাংলা কাগজে, অফিসে দেখেছিল। তো বিক্রম দাসের স্টুডিয়োতে ছবি তোলার সময় মনোজ যখন বলল ব্রা দেখা গেলে চলবে না, বাস্টলাইনেরও এক্সপোজার চাই, তখন সাজানো বাথটব থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দু হাতে বুক আড়াল করে মেয়েটি বলল, 'ও মা, অ্যাত্তো দ্যাখাতে হবে! তাহলে কিন্তু আরও এক হাজার বেশি চাই।' শুনে দাঁত চেপে কী একটা মন্তব্য করল মনোজ, বলল, 'ঠিক আছে, আরও দুশো।' তখন বুক থেকে হাত সরিয়ে এলানো গলায় মেয়েটি বলল, 'না, দেখুন, প্লিজ, অন্তত পাঁচশো। আমার একটা রেট আছে তো!'[৫১]

বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অভিনেত্রীর অভিনয়-দক্ষতা, প্রোডাক্টের গুণের পরিবর্তে পণ্য হয়ে দাঁড়ায় তার শরীর, তাকে ঘিরে ছড়ানো স্ক্যান্ডাল। পণ্য-সভ্যতায় এভাবেই টাকার দরে বিক্রি হয় তথাকথিত শিল্পী এবং শিল্প।

সাফল্যের নেশা থাকলেও অপরেশ কিন্তু *বিনিদ্র* উপন্যাসের দীপ্ত নয়। অপরেশ ম্যাকিয়াভেলিয়ানদের মতো যেকোনো প্রকারে কাজ হাসিল করায় বিশ্বাসী নয়। অন্যান্য বহু অনৈতিকতাকে সে প্রশ্রয় দিলেও কাজের ক্ষেত্রে নারী-দেহের ব্যবহার কত দূর সঙ্গত, তা নিয়ে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার কারণেই হোক বা বন্ধুর প্রাক্তন স্ত্রী হিসেবেই হোক, সীতার স্কিলকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি সীতার প্রতি তার প্রচ্ছন্ন দায়িত্ববোধও রয়েছে। সীতা লাডলীমোহনের থেকে কাজ হাসিল করার জন্য সরাসরি নিজের শরীরকে হাতিয়ার বানাবে, এটা সে কখনোই চায় না—

মনে হচ্ছে সীতার প্রতি আলাদা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে একটা, সেটাই সব; সেই আকর্ষণ থেকেই আগ্রহ। এমনকী ওকে মডেল করার কথাও তুলল! দ্যাটস ব্যাড ইনডিড! যদি সেরকম কোনও মতলব থেকে থাকে লাডলীর তাহলে এই অ্যাকাউন্ট নেওয়া আদৌ সঙ্গত হবে কি না তা ভেবে দেখা দরকার। এরকম হতে থাকলে সীতাও তার সুযোগ নিতে পারে। সেটা হতে দেওয়া উচিত

হবে না। অ্যাকশন গ্রুপে সীতাকে যখন নিয়েছিল তখনই অবশ্য জানত কাজকর্মে দক্ষ এবং অ্যাগ্রেসিভ হওয়া ছাড়াও ওর মুখ এবং চেহারার চটকও কিছুটা হেল্‌প করবে এজেন্সিকে। কিন্তু, এভাবে নয়। ব্যক্তি যেখানে প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে সেখানে প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখাই দায় হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত।[৫২]

তাছাড়া ম্যাকিয়াভেলিয়ান দীপ্তর মতো যতদূর প্রয়োজন মানুষকে ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলার প্রবৃত্তি অপরেশের নেই। অপরেশ নিঃসন্দেহে স্বার্থান্বেষী, আত্মপরায়ণ কিন্তু সে তার প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মচারীর প্রতি দায়িত্ববান। তার প্রতিষ্ঠানের সুদক্ষ কর্মী অপূর্বকে তার প্রয়োজন, কিন্তু সেই প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে গিয়ে তার মতো 'ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট' লোকের মনেও কোথাও যেন অপূর্বর প্রতি মায়া জন্মেছে। যথেষ্ট ঔদ্ধত্য নিয়ে কাজ ছেড়ে দেওয়ার পরও অপরেশ তাকে নানান প্রোজেক্টের কাজে ডাকে। অপূর্বর লেখার হাত চমৎকার, সে চলে গেলে আখেরে অপরেশেরই লোকসান। তাই ঠান্ডা মাথায়, কোমল গলায় কথা বলে কারসাজি করে অপরেশ অপূর্বকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে, সীতাকে অপূর্বর কাছে পাঠিয়ে বরফ গলানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অপরেশকে আর পাঁচটা ক্ষমতালোভী মানুষের মতো 'ম্যানিপুলেটিভ' বলা যেতে পারে কিন্তু 'ম্যাকিয়াভেলিয়ান' বলা যায় না। বরঞ্চ সাফল্যের সিঁড়ি অতিক্রম করে সে শেষের দিকে একাকিত্বের অসহায়তা চিনেছে, নিজের ভুল-ভ্রান্তিও কিছু ক্ষেত্রে বুঝতে পেরেছে।

অপূর্ব অপরেশের কোম্পানিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে সমকালীন রাজনীতিবিদ (এম এল এ) বিমলকৃষ্ণের একমাত্র সন্তান। সে যেরকম সচ্ছল, ক্ষমতাবান পিতার সন্তান, তাতে সে যেকোনো ভালো চাকরি পেতে পারত তার বাবার সূত্র ধরে কিন্তু সে তা করেনি। মাত্র ষোলো বছর বয়সে তার মা মারা যান। তারপর তার বাবা বিমলকৃষ্ণ এবং পিসিমা গায়ত্রী দেবীই তার দেখাশুনো করেছেন। তিন বছর আগে

ইলেকশনের সময় খবরের কাগজের মাধ্যমে জানাজানি হয় বিমলকৃষ্ণ তাঁরই দলের (সম্ভবত কংগ্রেস) কোনও এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। অপূর্ব তার বাবাকে ক্ষমা করতে পারেনি এবং এ কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, বাবার সঙ্গেও আর যোগাযোগ রাখেনি। তখন থেকেই তার একাকিত্বের শুরু। মায়ের ধাঁচে কিছুটা লম্বা, রোগা, ফর্সা চেহারার অপূর্ব অসম্ভব প্রতিভাধর। তার চরিত্রকেও কোনও বিশেষ ধাঁচায় ফেলা যায় না। সে একাধারে প্রতিভাবান, উজ্জ্বল, ভাবালু, প্রেমিক, প্রতারক, একরোখা, জেদি, অভিমানী, প্রতিবাদী, সুতীব্র অনুভূতিসম্পন্ন এক বিচিত্র চরিত্র। অপরেশের ভাষায়—

> ছেলেটি ভাল, কিন্তু বয়সের তুলনায় একটু অপরিণত, একটু বেশি সেনসিটিভও। লেখার হাত চমৎকার, কল্পনাশক্তিও আছে; তার চেয়ে বড়ো কথা চট করে ঢুকে পড়তে পারে পয়েন্টে। অভিজ্ঞতার পালিশ বাড়বে ক্রমশ। অ্যাকশন গ্রুপের এই কয়েক বছরে যে তিন চারজনের ওপর এমনকী তার মতো ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট লোকেরও দুর্বলতা জন্মেছে কিছুটা, অপূর্ব তাদের একজন।[৫৩]

কিন্তু অপূর্বর চারিত্রিক অস্থিরতা তাকে থিতু হতে দেয় না কোথাও। সে হয়তো অপরেশের এজেন্সির একজন হোতা হয়ে উঠতে পারত কিন্তু হঠাৎ চাকরি ছেড়ে সে সাংবাদিকতার দিকে ঝোঁকে। লেখার হাত চমৎকার হওয়ায় সেখানেও অপূর্ব দুর্দান্ত সাফল্যের অধিকারী হয়। আইজলের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অপূর্বর তৈরি করা রিপোর্ট ভীষণ জনপ্রিয় হয়। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সে মাঝেসাঝে অপরেশের গ্রুপের কিছু কিছু প্রোজেক্টে কাজ করতে রাজি হয়। শরীর দিয়ে সীতা তাকে চাকরিতে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। কারণ কেবলমাত্র শারীরিকভাবে বশ মানবার ছেলে অপূর্ব নয়। সে স্বাধীনচেতা, কোনও অফিসিয়াল ডিসিপ্লিন বা জৈবিক অভ্যাসের চর্চা দিয়ে তাকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। তার

সিদ্ধান্ত আপাতভাবে হঠকারিতার নামান্তর হলেও তার চারিত্রিক গভীরতা পাঠককে ভাবিয়ে তোলে।

অপূর্বর বাবা বিমলকৃষ্ণ কংগ্রেসের লোক কিনা সে কথা সরাসরি উপন্যাসে বলা নেই, কিন্তু তিনি যে নকশাল-আন্দোলনকে খাটো চোখে দেখেন এবং কমিউনিস্টরা যে তাঁর মূল বিরোধী পক্ষ, এ কথা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। সমকালীন রাজনীতি, ইলেকশন, পোস্টার, ভোটারলিস্টের কথা বারবার উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দলের নাম বা স্বচ্ছভাবে সরাসরি রাজনৈতিক কার্যকলাপের বর্ণনা এখানে অনুপস্থিত। যেটুকু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা রয়েছে, তা অপূর্বর সূত্র ধরে, তার অবস্থান বোঝানোর জন্য। যেমন ধরা যাক, অপূর্বর বাবা একজন ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদ আর অপূর্বর প্রেমিকা মালবী তার কমিউনিস্ট বন্ধু শৌনিকের বোন। কমিউনিস্ট বিরোধী পিতার সন্তান হয়েও অপূর্ব শৌনিকের সঙ্গে কমিউনিস্টদের হয়ে খাটাখাটনি করত এবং সেই সূত্র ধরেই একদিন শৌনিকের বাড়িতে তার যাদবপুরে এম.এ. পড়া মামাতো-বোন মালবীর সঙ্গে আলাপ হয়। মালবীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্কে সে অর্থে কোনও বাধা আসেনি। অপূর্ব সুপ্রতিষ্ঠিত, পাম অ্যাভিনিউতে তার একটা ওয়ান বেডরুমের ফ্ল্যাটও রয়েছে। মালবী একটি কলেজে পড়ায় এবং শীঘ্রই সে সেখানে স্থায়ী পদ পাবে। অন্যদিকে, অপূর্ব নিজের দক্ষতার কারণে অপরেশের এজেন্সিতে শীঘ্রই প্রোমোশন পাবে—এমতাবস্থায় অপূর্ব চাকরি ছেড়ে দেয় এবং তার জীবনে আসে সীতা চৌধুরী। বস্তুগত দিক থেকে বিচার করলে, অপূর্বর জীবনে প্রায় কোনোকিছুর অভাব নেই। যে আর্থিক স্বাচ্ছল্যের স্বপ্ন *আমরা* উপন্যাসের প্রিয়নাথ দেখে, তা অপূর্বর হাতের মুঠোয়। তার প্রেমিকা মালবীও স্বাবলম্বী এবং তাদের বিয়ের পথে কোনও বাধা নেই। এতৎসত্ত্বেও অপূর্বর অন্তরের শূন্যতা কিছুতেই ভরে না।

সীতা চৌধুরীর কাছে অপমানিত হয়ে অপূর্ব চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। অপরেশের অনুরোধে সীতা স্বয়ং অপূর্বর মান ভাঙাতে আসে তার বাড়িতে। সীতার প্রতি দুরন্ত মানসিক বাধা সত্ত্বেও শারীরিকভাবে সে সীতার কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তারপর থেকেই হঠাৎ সীতার প্রতি দুর্বলতা অনুভব করা শুরু করে অপূর্ব। প্রেমিকা মালবীর কাছে নয়, সীতার কাছেই অপূর্ব প্রথম নারী-শরীরের পূর্ণ আস্বাদ পায়। তবে শুধু শারীরিক মিলনের পরিপূর্ণ আস্বাদনই এই দুর্বলতার একমাত্র কারণ নয়। সীতা একজন 'ফ্লার্ট', তথাকথিত চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল মহিলা—এ কথা জানা সত্ত্বেও অপূর্ব স্মার্ট, কেতাদুরস্ত, আকর্ষণীয় সীতার মধ্যে আবিষ্কার করে অন্য আরেক সীতাকে, যে শুধুই একজন মা। কেবল যৌন-আকর্ষণ নয়, অপূর্বর চোখে কোথাও যেন বড়ো হয়ে ওঠে সীতার নিখাদ মাতৃত্ব। অপূর্বর থেকে বয়সে বড়ো এবং অনেক বেশি অভিজ্ঞ সীতার নারী-রহস্য কোনোদিনই ভেদ করতে পারেনি অপূর্ব। সীতার অন্তঃকরণ বোঝা কঠিন, তবু কোথাও যেন মনে হয়, সীতাও অপূর্বর প্রতি স্নেহশীল ছিল। সবটাই তার অভিনয় নয়। সীতা জানিয়েছিল, অপূর্বকে দেখে তার সন্তান বাবলুর কথা মনে পড়ে। সেও অপূর্বরই মতো কিচ্ছুটি পারে না, আবার সীতাকেও করতে দেয় না। মা-মরা অপূর্ব বাবলুকে চিনত। সেও অপূর্বরই মতো রোগা, সাদাটে, চুপচাপ, বিষণ্ণ। সেই বাবলুর মা সীতা যখন অপূর্বকে অনুরোধ করে তাকে একটু ভালোবাসার জন্য, তখন প্রেমিকা মালবীকে প্রতারণা করা হবে জেনেও অপূর্ব নিজেকে আটকাতে পারেনি। উপন্যাসের একেবারে শেষে দেখা যায়, অপূর্ব মালবীকে বিয়ে করেছে এবং তার ক-দিন পর হঠাৎ সীতা চৌধুরী অপঘাতে মারা যায়। সীতার মৃত্যুর পর অপূর্বর যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তাতে নিশ্চিত করে বলা যায় তাদের সম্পর্ক শুধুই শারীরিক নয়, তার থেকে অনেক গভীর—

তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বিস্মৃত আবেগটা খুঁজে পেল অপূর্ব, পরিষ্কার অনুভব করল কিছু একটা আসছে, ঢেউয়ের মতো, সারা শরীর আলোড়িত করে, ক্রমশ প্রচণ্ড হয়ে আছড়ে পড়ছে তার ওপর। দেখতে দেখতেই ভেঙে পড়ল সে এবং নিজের ভাঙাচোরা মুখটা নামিয়ে আনল সীতার বুকের সেই কাঙাল, দুটি সাদা হাতের টেনে আনা আগ্রহে যেখানে আশ্লীষ্ট হতে হতে একদিন সে ভরে উঠেছিল পূর্ণতায়। আজও তা-ই খুঁজছে!

'নো ইউ কানট গো লাইক দিস! ইউ কানট গো লাইক দিস—!' চাপা থেকে ক্রমশ সরব, বড়োই নাটকীয় কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ হাহাকারে ভরা অপূর্বর সেই কান্না হঠাৎই অপ্রস্তুত করে দেয় সকলকে।[৫৪]

অপরেশের সহকর্মী বুদ্ধিদীপ্ত রমেন চৌধুরীর স্ত্রী সীতা ছিল অন্যরকম। অ্যালকোহলিক রমেন সাত-আট বছর আগে সীতার বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা করে। দু-আড়াই বছরের ছেলেসমেত তখনকার সীতার মধ্যে রূপের ঝলক যত না ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল অসহায়তা। ডিভোর্সের পর একক মাতৃত্বের দায় নিয়ে সীতা ধীরে ধীরে চিনেছে স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা, টাকার আরাম, পাততে শিখেছে রূপের ফাঁদ, হয়ে উঠেছে 'সীতা চৌধুরী'। সীতা চৌধুরীর অবস্থান কিছু কিছু জায়গায় *চৌরঙ্গী* (১৯৬২) উপন্যাসের করবী গুহর কথা মনে করায়। করবী মিস্টার আগরওয়ালের কোম্পানির ভাড়া করা সুন্দরী-শিক্ষিত অতিথি-সেবিকা (হস্টেস)। আগরওয়ালের ক্লায়েন্টদের তুষ্ট করে চলাই তার মূল কাজ এবং সেই সূত্রেই সে শাজাহানের মতো বিলাসবহুল হোটেলে স্থায়ীভাবে বসবাস করত। করবীর জীবনে প্রেম মুক্তির আস্বাদ এনেছিল কিন্তু মুক্তি দিতে পারেনি। সে যে শাজাহান হোটেলের সুসজ্জিত ঘরে (সুইটে) চির-বন্দিনী, সে কথা সে ক্ষণিকের আনন্দে বিস্মৃত হয়েছিল। অনিন্দ্য পাকড়াশীর মতো উচ্চবিত্ত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানকে যে সমাজ সহজে করবীর মতো অভাগীর সঙ্গে ঘর বাঁধতে দেবে না, সে তো চিরাচরিত স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো-কোনো রূপকথার গল্পে এমন অভাগীর কপালে

অনিন্দ্যর মতো রাজপুত্তুর জোটে বটে, কিন্তু *চৌরঙ্গী* রূপকথার গল্প বলে না। সুতরাং বাস্তবসম্মত নীতি মেনে করবীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয় অনিন্দ্যর মা ছদ্ম-সমাজসেবী মিসেস পাকড়াশীর সঙ্গে। অনিন্দ্যর প্রতি নিখাদ প্রেম করবীকে এই যুদ্ধের নীতিহীনতাকে প্রশ্রয় পেতে দেয়নি। সে এক শিশি ঘুমের ওষুধ খেয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছে শুধুমাত্র অনিন্দ্যর পরিবারকে অসম্মানিত হতে দেবে না বলে। সীতার জীবনে এরকম মুক্তির আস্বাদ এসেছিল কিনা বলা মুশকিল, তবে সেও খুব সম্ভবত আত্মহননের পথ বেছে নেয়। সীতাকে সকলে কামনা করে, অথচ সেই সীতার মৃত্যুতে কাউকে কাঁদতে দেখা যায় না। একমাত্র সদ্য-বিবাহিত অপূর্বর বল্গাহীন বহিঃপ্রকাশ দেখে বোঝা যায় সে সীতাকে ভালোবাসত। অথচ অপূর্ব মালবীর সঙ্গে একটি সুস্থ সম্পর্কে ছিল, সীতার সঙ্গে একদিনের ভুলকে ঝেড়ে ফেলে তাকে বিয়েও করেছে। মালবী তথাকথিত ভদ্র বাড়ির শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, সংসারী মেয়ে, তবু মালবীর প্রেম কোনোদিনই মা-মরা অপূর্বর শূন্যতা ভরাট করতে পারেনি। কোথাও যেন কী একটা না পাওয়ার ফাঁক রয়ে গেছে এবং সেই ফাঁক থেকেই সীতার জন্ম—

> অফিস থাকতে টেলিফোন ছিল, মালবীর বাড়িতেও আছে, তেমন-তেমন দরকার হলে ফোন করা যেত ওর কলেজেও। দেখা হতই। তাহলে তিনটে বছর কেটে গেল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, রেস্তোরাঁয় বসে, সিনেমা কিংবা থিয়েটারে, ছুটির দিনে কখনও বা দুপুরের ট্রেনে চড়ে বজবজ, কল্যাণী কি ডায়মন্ডহারবার। তঞ্চকতা ছিল না কোথাও। ছিল না?[৫৫]

ফাঁকি ছিল বলেই তঞ্চকতা ছিল। শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তাদের সম্পর্ক খুব বেশি দূর এগোয়নি। তাছাড়া মালবীর গভীরতা, তার আকর্ষণ সীতার মতো ঘা-খাওয়া অভিজ্ঞ মহিলার কাছে নেহাতই ফিকে। মা মারা যাওয়ার পর থেকে অপূর্বর সেই দীর্ঘকালীন অপূর্ণতার বোধ হঠাৎ করে একদিন পূর্ণতা পায় সীতার কাছে এসে। শারীরিক পূর্ণতা

এবং মাতৃস্নেহ উভয়ের যুগপৎ মিলন অপূর্বকে যা দিয়েছিল, মালবীর সঙ্গে শুভ পরিণয়ও তাকে তা দিতে পারেনি। আসলে সীতা চৌধুরী সাধারণ মহিলা ছিলেন না, তাঁর চরিত্রে বিভিন্ন স্তর রয়েছে, বিশেষত্ব রয়েছে। দিব্যেন্দু পালিত নিজে নবনীতা দেবসেনের কাছে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে সীতা চৌধুরীকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, সঙ্গে এটাও জানিয়েছেন যে 'ক্ল্যারিয়ন-ম্যাকান অ্যাডভার্টাইসিং সার্ভিসেস লিমিটেড'-এ চাকরি করার সময় তিনি বিজ্ঞাপন জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তারা সিন্‌হার সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। দিব্যেন্দু তাঁর গ্রুপে কাজ করতেন না, কিন্তু মিসেস সিন্‌হার ব্যক্তিত্বের অনন্যতা তাঁর মাথায় এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে সীতা চৌধুরীর চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তারা সিন্‌হার বিশেষ প্রভাব কাজ করেছে। সীতা চৌধুরী হয়তো তারা সিন্‌হার প্রতিরূপ নয়, কিন্তু মিসেস সিন্‌হার আদলে সমৃদ্ধ একটি চরিত্র। এই বিষয়ে স্বয়ং ঔপন্যাসিক জানান—

> হ্যাঁ, She was quite smart। মিসেস গান্ধী যেমন ওঁকে বলা যায় ব্যতিক্রমী মহিলা, অসম্ভব ইন্টেলিজেন্ট, সাংঘাতিক চট্‌পট নিজে ডিসিশন নিচ্ছেন, মানে পুরুষদের পাত্তাই দিচ্ছেন না, কোনো ব্যাপারে নয়। মিসেস্ সিন্‌হার মধ্যেও কিন্তু সেই ব্যাপারটা দেখতাম।...যেসমস্ত চরিত্র আমরা লিখি, তুমি জানো, তুমি নিজে লেখো, সেটা তো হুবহু একটা মানুষকে দেখে কেউ চরিত্র আঁকে না। পাঁচজনকে দেখে একজন খাড়া হয় এবং তার সঙ্গে যিনি লিখছেন তাঁর কিছু কল্পনাশক্তিও যুক্ত হয়। তা এই *ঢেউ* উপন্যাসের সীতা চৌধুরীর চরিত্রে মিসেস সিন্‌হা-র কিছুটা আদল আছে। সে অসম্ভব কর্মসক্ষম, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী – বিয়ে হয়েছিল, divorce হয়ে গেছে with a child, তাছাড়া তাঁর একটা মেজাজ আছে। মানে Commanding মেজাজ।[৫৬]

সীতা চৌধুরীর মতো তার জীবনযাপনও আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের থেকে আলাদা। এমন একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়। অপূর্বও তা পারেনি, বিশেষত মাতৃহারা অপূর্বর কাঙাল মন কোথাও যেন সীতার স্নেহধন্য হয়ে অনেকখানি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ছেলেবেলা থেকে বহু আবেগের ঢেউ অপূর্বকে আন্দোলিত

করেছে কিন্তু সীতার চিরতরে চলে যাওয়ার ঘটনা যেন সর্বাধিক বড়ো ঢেউয়ের আকারে অপূর্বর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উন্মত্তের মতো আছড়ে পড়া ঢেউয়ের তোড়ে সে আবেগের গভীর সমুদ্রে ডুবে যায়। সীতা তার শেষ জীবনে অপূর্বর বাবা বিমলকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অপূর্বর মায়ের মৃত্যুর আকস্মিক ঢেউ বিমলকৃষ্ণকে অপূর্বর থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল, আবার সীতার মৃত্যুর ঢেউয়ের স্রোত কাছে টেনে আনে তাদের দুজনকে। জীবনের বিভিন্ন ঘটনার ঢেউ, তজ্জনিত স্রোত এভাবেই কখনো-কখনো জীবনকে ওলোট-পালোট করে দেয়, কখনও জীবনকে নতুন করে সাজায়। সেই ঢেউয়ের পরম্পরাকে মান্যতা দিয়েই হয়তো দিব্যেন্দু পালিত উপন্যাসের নাম রেখেছেন *ঢেউ*।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এবং পরিবেশ পুরুষদের যেভাবে শক্তিধর, সাহসী, ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্বের আদর্শ মডেলের ছাঁচে গড়ে-পিটে নিতে চায়, সেই সামাজিক প্রকল্পটির মূলেই রয়েছে ভ্রান্তি। নারী-পুরুষের সমাজে নারীকে যদি আলাদা করে প্রতিটি ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে বাদ বাকি যে-কজন মানুষ পড়ে থাকে, তারা যে পুরুষ বা পুরুষের দেহবিশিষ্ট সে কথা আর বলে দেওয়ার দরকার পড়ে না। মানুষকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত না করে নারী এবং পুরুষ হিসেবে চিহ্নিতকরণ এবং তারপর তাদের পৃথক-পৃথক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া, সেখান থেকেই বিচ্ছিন্নতার শুরু। বাহ্যত বা দেহজ বিষয়ের দিক থেকে সাধারণভাবে নারী-পুরুষ আলাদা, এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই বহিরাবরণের সূত্র ধরে অন্তরের গুণাবলীর পৃথক বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করে দেওয়ার এই প্রকল্পই তৈরি করে অন্তরের শূন্যতা এবং একাকিত্ব।

তথ্যসূত্র:

১। দিব্যেন্দু পালিত, 'বিনিদ্র', *দশটি উপন্যাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ২৭৩

২। Delroy L. Paulhus, Kelvin M. Williams, 'The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy, *JOURNAL OF RESEARCH IN PERSONALITY*, 36 (2002), P. 559

৩। William Shakespeare, *The Tragedy of Macbeth*, British Library, Strand, Bookseller to His Royal Highness the Prince of Wales, 1788, P. 28-29

৪। Daniel N. Jones, Delroy L. Paulhus, 'Machiavellianism', *INDIVIDUAL DIFFERENCES IN SOCIAL BEHAVIOR*, Mark R. Leary, Rick H. Hoyle (Eds.), New York, The Guilford Press, 2009

৫। দিব্যেন্দু পালিত, 'সম্পর্ক', *দশটি উপন্যাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ৮৪

৬। দিব্যেন্দু পালিত, 'বিনিদ্র', *দশটি উপন্যাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ২৬৫

৭। তদেব, পৃ. ২৫৯

৮। তদেব, পৃ. ২৭০

৯। তদেব, পৃ. ২৬৬

১০। দিব্যেন্দু পালিত, 'সম্পর্ক', *দশটি উপন্যাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ৬৮

১১। দিব্যেন্দু পালিত, ‘বিনিদ্র’, *দশটি উপন্যাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ২৮০

১২। তদেব, পৃ. ২৮৩

১৩। Daniel N. Jones, Delroy L. Paulhus, ‘Machiavellianism’, *INDIVIDUAL DIFFERENCES IN SOCIAL BEHAVIOR*, Mark R. Leary, Rick H. Hoyle (Eds.), New York, The Guilford Press, 2009

১৪। দিব্যেন্দু পালিত, ‘বিনিদ্র’, *দশটি উপন্যাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ২৬৭

১৫। দিব্যেন্দু পালিত, ‘সম্পর্ক’, *দশটি উপন্যাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ১২০

১৬। Daniel N. Jones, Delroy L. Paulhus, ‘Machiavellianism’, *INDIVIDUAL DIFFERENCES IN SOCIAL BEHAVIOR*, Mark R. Leary, Rick H. Hoyle (Eds.), New York, The Guilford Press, 2009

১৭। দিব্যেন্দু পালিত, ‘সম্পর্ক’, *দশটি উপন্যাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ৯৯

১৮। সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, ‘উদ্‌বাস্তু স্রোত ও পশ্চিমবাংলার জনজীবন’, *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি,* স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পা.), পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৭০০০০৯, চতুর্থ সংস্করণ ২০২০, পৃ. ১৭৫

১৯। তদেব, পৃ. ১৭৬

২০। অরবিন্দ পোদ্দার, 'পশ্চিম বাংলা : রাজনৈতিক বৃত্তে পঞ্চাশ বছর', *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পা.), পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৭০০০০৯, চতুর্থ সংস্করণ ২০২০, পৃ. ১৮১

২১। তদেব, পৃ. ১৮২

২২। তদেব

২৩। শৈবাল মিত্র, 'ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন : পশ্চিমবঙ্গ', *সত্তর দশক (তৃতীয় খণ্ড) ষাট-সত্তরের ছাত্র আন্দোলন*, অনিল আচার্য (সম্পা.), অনুষ্টুপ, ২-ই নবীন কুণ্ডু লেন কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭, পৃ. ৩৫

২৪। অরবিন্দ পোদ্দার, 'পশ্চিম বাংলা : রাজনৈতিক বৃত্তে পঞ্চাশ বছর', *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পা.), পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৭০০০০৯, চতুর্থ সংস্করণ ২০২০, পৃ. ১৮৩

২৫। তদেব, পৃ. ১৮৩-১৮৪

২৬। শৈবাল মিত্র, 'ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন : পশ্চিমবঙ্গ', *সত্তর দশক (তৃতীয় খণ্ড) ষাট-সত্তরের ছাত্র আন্দোলন*, অনিল আচার্য (সম্পা.), অনুষ্টুপ, ২-ই নবীন কুণ্ডু লেন কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭, পৃ. ৪৩-৪৪

২৭। তদেব, পৃ. ৭১

২৮। দিব্যেন্দু পালিত, 'ভেবেছিলাম', *প্রথম পাঁচটি উপন্যাস*, প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০০২, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৮০

২৯। তদেব, পৃ. ১৯১

৩০। তদেব, পৃ. ১৮২-১৮৩

৩১। তদেব, পৃ. ২১৭

৩২। প্রগতি মাইতি, 'মেট্রোপলিটন সংস্কৃতি ও মধ্যবিত্তের সংকট', *বাঙালি মধ্যবিত্ত মানস,* সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি (সম্পা.), উবুদশ, কলকাতা ৭০০০১২, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২০৯

৩৩। শৈবাল মিত্র, 'ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন : পশ্চিমবঙ্গ', *সত্তর দশক (তৃতীয় খণ্ড) ষাট-সত্তরের ছাত্র আন্দোলন,* অনিল আচার্য (সম্পা.), অনুষ্টুপ, ২-ই নবীন কুণ্ডু লেন কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭, পৃ. ৬০-৬৪

৩৪। তদেব, পৃ. ৬৬-৭০

৩৫। Samar Sen, Debabrata Panda & Ashish Lahiri (Eds.), *Naxalbari and after : A frontier anthology,* Kathashilpa Publication, Vol 1, July 1978

৩৬। শৈবাল মিত্র, 'ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন : পশ্চিমবঙ্গ', *সত্তর দশক (তৃতীয় খণ্ড) ষাট-সত্তরের ছাত্র আন্দোলন,* অনিল আচার্য (সম্পা.), অনুষ্টুপ, ২-ই নবীন কুণ্ডু লেন কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭, পৃ. ৭৯-৮৩

৩৭। তদেব, পৃ. ৮৫-৮৬

৩৮। গৌতম সেন, 'সত্তর দশকের রাজনীতি', *সত্তর দশক (প্রথম খণ্ড) সত্তর দশকের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়ন,* অনিল আচার্য (সম্পা.), ২ই নবীন কুণ্ডু লেন কলকাতা ৭০০০০৯, ১৫ বর্ষ শারদীয় ১৩৮৭, পৃ. ১১৪-১২৩

৩৯। তিমির বসু, 'শ্রমিক আন্দোলন : বিপর্যয়ের ধারা', *সত্তর দশক (প্রথম খণ্ড) সত্তর দশকের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়ন*, অনিল আচার্য (সম্পা.), ২ই নবীন কুণ্ডু লেন কলকাতা ৭০০০০৯, ১৫ বর্ষ শারদীয় ১৩৮৭, পৃ. ৯৮-১১২

৪০। দিব্যেন্দু পালিত, 'আমরা', *দশটি উপন্যাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ১৩২

৪১। তদেব, পৃ. ১৬০-১৬১

৪২। তদেব, পৃ. ১৫১

৪৩। তদেব, পৃ. ১৫৫

৪৪। তদেব, পৃ. ১৭৯

৪৫। তদেব, পৃ. ১৮১

৪৬। তদেব, পৃ. ১৪৩

৪৭। তদেব, পৃ. ১৫৮

৪৮। দিব্যেন্দু পালিত, 'ঢেউ', *দশটি উপন্যাস* ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪

৪৯। তদেব, পৃ. ৩৪২-৩৪৩

৫০। তদেব, পৃ. ২৯৬

৫১। তদেব, পৃ. ৩১০-৩১১

৫২। তদেব, পৃ. ২৯৭-২৯৮

৫৩। তদেব, পৃ. ২৯৯

৫৪। তদেব, পৃ. ৩৭০

৫৫। তদেব, পৃ. ৩২৮-৩২৯

৫৬। অনুলিখন: শ্রাবন্তী বসু, 'দিব্যেন্দু - নবনীতা আলাপচারিতা', *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), জানুয়ারি—মার্চ ২০০৩, গল্‌ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ১৯৯

(চতুর্থ অধ্যায়)

দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অভিঘাত

চাকরির খোঁজে ভাগলপুরের মফঃস্বল থেকে আসা দিব্যেন্দু পালিত অল্প বয়সেই হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলেন বাস্তব জীবনে আসলে, টাকায় মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর। কলকাতা তাঁকে মোটেই উষ্ণ আমন্ত্রণ করেনি, বরঞ্চ ভয়ঙ্কর কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিব্যেন্দু চিনেছিলেন শহুরে জীবনের অলিগলি। খাওয়া, থাকা, উপার্জনের কোনোরকম বন্দোবস্ত ছাড়াই এই অনাত্মীয় শহরে পা দিয়ে তিনি কীভাবে দিন কাটিয়েছেন, সে কথা নিজেই ব্যক্ত করেছেন 'প্রিয়দর্শিনী'-র বিশেষ সংখ্যায়—

> বেশ কয়েকদিন শিয়ালদা নর্থ স্টেশনের বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটিয়েছি। কখনও খাবার জুটেছে, কখনও খিদের জ্বালায় ককিয়ে উঠেছে পেট, কখনও কেঁদেও ফেলেছি। এমন জীবন যেন কারও না হয়। তখনও শিয়ালদা স্টেশনে উদ্বাস্তুরা থাকতেন। একদিন রাতে আমাকে হাঁটুতে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদতে দেখে এক প্রৌঢ়া এসে হাত রাখলেন পিঠে। দেখি তাঁর হাতে একটি শালপাতায় দুটি রুটি আর কুড়নো তরকারির ঝোল। আমার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'খাও বাছা, দেখেই বুঝতে পারি ভদ্দর ঘরের ছেলে। আহা রে বাছা। খেয়ে নে—।' মানুষের এমন করুণার কণ্ঠস্বর আমি আরও শুনেছি। বেশ কিছুদিন পরে শিয়ালদা স্টেশনে ওই মহিলাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। পাইনি।[১]

গ্রাম থেকে শহরে আসা এই মানুষগুলো, যারা আসলে অন্তঃকরণে মধ্যবিত্ত, তাদের তিনি চিনেছিলেন ভীষণ নিবিড়ভাবে, নিজের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধিসমেত। এরাই তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্র। জীবনের প্রতিটা ভাঁজ খুলে খুলে তিনি দেখিয়েছেন, এরা কীভাবে

গ্রামীণ কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পুঁজিবাদী শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার শিকার হয়ে যাচ্ছে এবং শেষপর্যন্ত টাকা লোটার দৌড়ে কেউ কেউ সফল হচ্ছে, আর্থিক স্বাচ্ছল্য, সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা সুরক্ষিত করে জাতে উঠছে, কেউ কেউ খেলায় হেরে গিয়ে নিম্নবিত্ত তকমা নিয়ে শহরের জনস্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ দীর্ঘকাল একই অবস্থানে থেকে মধ্যবিত্তসুলভ হতাশায় ডুবে মরছে। বিত্ত, সাদা কথায় টাকা কীভাবে হয়ে উঠছে মুখ্য নিয়ন্ত্রণকর্তা, সেটাই তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন লেখায়। বিপুল বাকসংযম এবং নিচু গলায় বলা কয়েকটি নির্বাচিত গল্প নিয়েই সেই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা সম্ভব। তবে তার আগে মধ্যবিত্ত-মননের উৎপত্তিস্থল এই কলকাতা শহরের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

১

১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ জোব চার্নকের (১৬৩০-১৬৯৩) কলকাতা প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল সজাগ ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি। তিনদিকে নদীবেষ্টিত, সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আদর্শ এমন সুরক্ষিত বন্দর এলাকা ভারতবর্ষে যদিও বা মিলত, কিন্তু একইসঙ্গে সোনার বাংলার অফুরন্ত সম্পদের কথা মাথায় রাখলে এমন উপযোগী বাণিজ্যিক আখড়া আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই সব ভেবে-চিন্তে চার্নক থেকে শুরু করে কোম্পানির কর্তারা সবাই কলকাতাকেই বাণিজ্যের আখড়া বানিয়েছিলেন। চার্নক কুঠি বেঁধেছিলেন মাত্র আট হাজার লোক নিয়ে। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ-এলাকায় (সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং ডিহি কলকাতা গ্রামে) সেই লোকসংখ্যা প্রায় পনেরো হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। আর মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে

ওয়েলেসলির কলকাতা তার যাবতীয় গ্রাম্যতা ঝেড়েঝুড়ে পাঁচলক্ষ লোকের ‘নগর কলকাতার’ রূপ পরিগ্রহ করে। উর্বর বাণিজ্যভূমি হিসেবে জন্মলগ্ন থেকে ব্যবহৃত হতে হতে কলকাতার মনন, অনুধ্যান হয়ে দাঁড়িয়েছে টাকা, টাকার কষ্টিপাথরে ঘষেই দাম নির্ধারণ করা হয় কলকাতার মানুষগুলোর। এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের বক্তব্য স্মরণ না-করলেই নয়—

> ...কলকাতাকে কিপলিঙের ভাষায় ‘chance-erected’ বলা যায় না, তবে তাঁর কথার এইটুকু সমর্থন করা যায় যে ‘palace, byre, hovel, poverty and pride side by side’ —এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে কলকাতার নাগরিক রূপায়ণ হয়েছে এবং এই একই বৈশিষ্ট্য আজও কলকাতার মেট্রোপলিটন মহাবিকাশপর্বে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু এই রূপায়ণের মধ্যেও কোনো দৈবক্রমের ব্যাপার নেই বরং পরিকল্পনাই আছে এবং সবচেয়ে বেশি আছে বাণিজ্যতন্ত্রের ও ধনতন্ত্রের দ্বিধাগ্রস্ত যাত্রাপথের স্থূল পদচিহ্ন। কেবল কলকাতার বহিরঙ্গেই যে আছে তা নয়, তার মানসতার মধ্যেও এই স্থূলতার চিহ্ন সুস্পষ্ট।[২]

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের ধন-সম্পদ লুঠ করে ইংল্যান্ডের শিল্পোন্নয়নে কাজে লাগাতে থাকে। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ব্রিটিশ শিল্পপতিরা তাদের পণ্যদ্রব্য, বিশেষত ম্যানচেস্টার কটন মিলের কাপড় রপ্তানি করার একটা আখড়া বানিয়ে ফেলে ভারতবর্ষকে। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খনন এবং ইংল্যান্ডে অবাধ বাণিজ্য নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ কুটির-শিল্পের চরম সর্বনাশ ঘটে যায়। কুটির-শিল্প যখন প্রায় ধ্বংসের পথে, তখন কুটির-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকেরা বাধ্য হয়ে জীবিকা হিসেবে কৃষিকাজকে বেছে নেয়, যেখানে উৎপাদিত দ্রব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রিটেনের শিল্প-বিকাশের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করার কাজে লাগানো হতে থাকে। প্রথম দিকে ইংরেজ সরকার

ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহী ছিল। পরে তারা দেখল, ভারত থেকে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করার পরিবর্তে কাঁচামাল আমদানি করা ব্রিটিশ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বেশি লাভজনক। কারণ ততদিনে ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শিল্পের জন্য একদিকে কাঁচামাল, অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট বৃহৎ বাজারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভারতের রেশম-শিল্পের কারিগরদের নিজেদের বাড়িতে বসে কাজ করার পরিবর্তে ইংরেজদের তৈরি করা কারখানায় যোগ দিতে নির্দেশ করা হয়। তার ফলে দলে-দলে কর্মহীন লোক কাঁচা টাকার লোভে নিজেদের ভাগ্য-পরীক্ষা করার জন্য গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে হাজির হতে থাকে। বিশিষ্ট ভারতীয় পণ্ডিত এবং সমাজ-সংস্কারক মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১) এই সম্পর্কে জানিয়েছেন, ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ভারতে উৎপন্ন কাঁচামাল কম টাকায় সংগ্রহ করে ইংল্যান্ডের জাহাজে করে স্বদেশে পাঠিয়ে সেখানকার কারখানায় উৎপন্ন-দ্রব্য ভারতের বাজারে এনে বিক্রি করত। অর্থাৎ, একই পণ্য দ্রব্যে দু-দুবার মুনাফা অর্জন করার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করেছিল ভারতের ব্রিটিশ সরকার। কুটির-শিল্পের ধ্বংসসাধন ইতোমধ্যেই ভারতীয় অর্থনীতিকে দুর্দান্ত বিপর্যয়ের মধ্যে এনে ফেলেছিল। ভারতের গ্রামজীবন এবং গ্রামীণ অর্থনীতি কৃষি ও কুটির-শিল্পের সমন্বয়-সাধনের ফলেই গড়ে উঠেছিল। তাঁত এবং চরকাই সনাতন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী স্মারক। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুচতুরভাবে তাঁত ও চরকার ধ্বংসসাধন করে ভারত তথা সমগ্র এশিয়ার সামাজিক জীবনে বৃহত্তম বিপ্লব সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষের নিজস্ব শিল্পের ধ্বংসসাধন হওয়ার পর অধিকাংশ ভারতবাসী হয় কৃষিকাজ, নয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়া চাকরিতে যোগ দিতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ সরকার আধুনিকীকরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে রেলপথ-নির্মাণ, বাগিচা, খনি ও কল-কারখানার উন্নতি, শ্বেতাঙ্গদের হাতে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ও শিল্প-পরিচালনা ইত্যাদির প্রচলন করে। তবে ব্রিটিশ

সরকার নিজস্ব পুঁজি-বিনিয়োগ করে এই ব্যবস্থাগুলির প্রবর্তন করেছিল নিজেদের স্বার্থ-রক্ষা করার জন্যই। রেলপথ-স্থাপন ছিল ভারতবর্ষের মতো উর্বর, সম্ভাবনাময় উপনিবেশের অর্থনৈতিক-শোষণ ব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার। রেলপথের জাল রচনা করা হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও রণনীতির স্বার্থে। রেল-ব্যবস্থার বেশিরভাগ যন্ত্রপাতির আমদানি করা হতো ইংল্যান্ড থেকে। সুতরাং এক্ষেত্রেও মুনাফার ভাগ পড়ত ইংল্যান্ডের ভাগ্যে। তাছাড়া ১৯২১ সালে গিয়েও রেল-বিভাগের উচ্চপদে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র ১০% ভারতীয়। অর্থাৎ, রেলপথে বিনিয়োগের ফলে যা আয় হতো, তার লভ্যাংশের অধিকাংশটাই সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি শাসকদলের দেশে চলে যেত।[৩]

ইংরেজরা নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে, শাসন-ত্রাসন চালু রাখতে জন্ম দেয় নবকৃষ্ণ দেব, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, রামদুলাল দে, গোবিন্দরাম মিত্র, গোকুল ঘোষাল প্রমুখের মতো কিছু সর্বনাশা মধ্যস্বত্বভোগীদের। এরা প্রত্যেকেই ছিল সামন্ততন্ত্রের যাবতীয় বদগুণসম্বলিত অত্যাচারী মুতসুদ্দি, যারা ইংরেজদের পদলেহন করে হয়ে যায় নবীন কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়, যাদেরকে কুখ্যাত অসংস্কৃত, অশিক্ষিত, অমার্জিত 'বাবু সম্প্রদায়' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, যে সব ইংরেজরা নিজেদের দেশ ছেড়ে সুদূর ভারতবর্ষে কোম্পানি চালাতে আসত, তারাও ছিল ইংরেজ-জাতির উচ্ছিষ্টাংশস্বরূপ, অমার্জিত অর্থলোভ এবং প্রভুত্ববোধে অন্ধ অহংকারী। লোভাতুর বণিক সম্প্রদায় এবং নির্বোধ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতীয় জমিদারদের এমন চমৎকার বন্ধুত্ব অঙ্কুরেই কলকাতার ভোগবাদী, সর্বগ্রাসী, অসংযমী চরিত্র তৈরি করে দিয়েছিল। উচ্ছিষ্ট, পরিত্যক্ত সামন্ততান্ত্রিক ভাবনা, কুসংস্কার আর নব্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবরকম কুফল, বেলেল্লাপনা —এই দুইয়ের বিষম সহাবস্থান কলকাতার অভিরুচিকে করে দেয় রাক্ষসের সামিল, যার ক্ষুধা আর কোনোকিছুতেই মেটে না। ইংরেজদের কাজেকর্মে-সহায়ক এই দেশীয়

কর্মচারীরাই নব্য বুর্জোয়া-মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর জন্য এদেরকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়োজন পড়ে। তারই ফলাফল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০), হিন্দু কলেজ (১৮১৭), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭)। আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি-সমাজচিন্তা সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসকের গড়া এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্পর্শ। 'মধ্যবিত্ত' আসলে কারা, এদের প্রকৃতি কীরকম, এ প্রসঙ্গে সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

> 'মধ্যবিত্ত' এই শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে এই শ্রেণি সমাজবিন্যাসের মধ্যবর্তী স্তর। অর্থাৎ এর ওপরে একটি এবং এর নিচে একটি স্তর—মধ্যবর্তী রেখায় এর অবস্থান। অন্যভাবে বলা যায় এই শ্রেণির বিত্তের পরিমাণ মাঝারি ধরনের—এদের অতিবিত্ত নেই, আবার এরা বিত্তহীনও নয়। এদের ওপরে বিত্তশালী অভিজাত শ্রেণি যাদের বেশিরভাগ জমিদার আর নীচে কৃষক, শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির মানুষরা। এই দুই শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হল এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি।[৪]

জন্মলগ্ন থেকেই এই শ্রেণির একটা নিরন্তর প্রচেষ্টা আছে নিজের অবস্থান থেকে উঠে উচ্চবিত্ত হওয়ার। একদিকে এই শ্রেণির মধ্যে রয়েছে উচ্চবিত্ত হওয়ার প্রচণ্ড লোভ, আরেকদিকে রয়েছে নিম্নবিত্ত হয়ে পড়ার তীব্র ভয়। ভয় এবং লোভ এ-দুইয়ের টানাপোড়েনে মধ্যবিত্তের দল স্বভাবতই হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত স্বার্থমগ্ন। উচ্চবিত্তদের বা মালিক শ্রেণিকে তোষামোদ করেই মধ্যবিত্তের যাত্রা অথচ এর প্রধান নির্ভর শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়। অর্থাৎ, কায়িক শ্রম-পরিহারকারী এবং অপরের শ্রম-আত্মসাৎকারী অথবা কায়িক শ্রমজীবীদের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল এবং বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার মালিকানাহীন ব্যক্তিদের মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আবার প্রখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী, সাহিত্য-সমালোচক এবং চিন্তাবিদ বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০) মহাশয় জানিয়েছেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পুঁজিপতি মালিক শ্রেণি এবং মজুর শ্রেণি উভয়ের

চরিত্রেরই সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ‘বাংলার নবজাগৃতি’ গ্রন্থে হজস্কিনের মধ্যবিত্ত-বিষয়ক বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন—

> মধ্যবিত্ত শ্রেণি এমনই এক শ্রেণি যারা অল্প মেহনত করে এবং যন্ত্রযুগের প্রসারের তালে তালে যারা এমনই একটা স্থান সমাজে দখল করে নেয় যেখানে তাদের ধনিক ও মজুর দুইই মনে হয়। সাধারণ মজুর শ্রেণির মতন তারা কেনা গোলামি করে না, কিন্তু মেহনত না করেও তাদের নিস্তার নেই।[৫]

উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত উভয় শ্রেণির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে রয়েছে এবং তারা বাকি দুই শ্রেণির ওপর নির্ভরশীলও বটে। বিত্তবান ওবং বিত্তহীন শ্রেণির মাঝখানে থাকা অভিন্ন স্বার্থযুক্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মূল শিকড় আসলে গ্রামে। কর্মসূত্রে অথবা নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে এদের গ্রাম থেকে শহরে আসা। শহরে এলে মানুষ মাটি থেকে, শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। মাটির বাড়ি, মাটির পথ সব ফেলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসার এই পথ যতই রোমাঞ্চকর হোক না কেন, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা ওপরমহল আসলে একার জগৎ। ছোটো-ছোটো কুঁড়েঘর যেমন বড়ো-বড়ো অট্টালিকায় ঢাকা পড়ে যায়, তেমনি উচ্চে ওঠার মই আড়াল করে দেয় মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিত্তি প্রস্তরগুলোকে, প্রাচীর গেঁথে দেয় দুটো মানুষের মনের মাঝে। ইঁট-কাঠ-পাথরের ক্রমাগত ঠোকাঠুকিতে মনের কমনীয়তা, অনুভূতিপ্রবণতা বড়ো দ্রুত হারিয়ে যায়। সকলেই জানেন—

> ধন, যশঃ, ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এ সকল প্রথম বারে যে পরিমাণে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয় বারে সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয় বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু দুইটি অসুখের কারণ জন্মে; প্রথমতঃ, অভ্যস্ত বস্তুর ভাবে সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ হয়; এবং অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়।[৬]

এতৎসত্ত্বেও মানুষের মন ক্ষণস্থায়ী সুখের পশ্চাতে দৌড়ে বেড়ায়। অপূরণীয় রাক্ষুসে ক্ষুধা-উদ্রেককারী এই নব্য যান্ত্রিক সভ্যতা সম্পর্কে কমলাকান্তের বিশ্লেষণ অবশ্যই স্মরণীয়—

> শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'মাটিরিয়াল্ প্রস্পেরিটির' উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ্ বড়ো ভালোবাসেন-ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন-তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ্ সাধনেই নিযুক্ত-আমরা তাহাই ভালোবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি।...কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারান মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে? ঐ যে কৃপণ ধন তৃষায় মরিতেছে, উহার তৃষা নিবারণ করিবে? অপমানিতের অপমান ফিরাইতে পারিবে? রূপোন্মত্তের ক্রোড়ে রূপসীকে তুলিয়া বসাইতে পারিবে? না পারে, তবে ওই রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও—[৭]

প্রায় একশো বছর পর, এই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিব্যেন্দু পালিত বারবার তাঁর গল্পে হন্যে হয়ে খুঁজেছেন, খুঁজতে খুঁজতে মানুষের মনকে চিরে চিরে দেখেছেন, মনের গোপনীয়তম ভাঁজ খুলে দেখেছেন, কিন্তু উত্তর আলাদা কিছু হয়নি। বরঞ্চ এখানেও কমলাকান্তের বক্তব্যেরই সমর্থন মেলে। মানুষের বেঁচে থাকার একটাই মন্ত্র—

> টাকার রাশির ওপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ!...মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন আবার কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্য সম্পদ্।[৮]

লণ্ডনের ব্যবসায়ী মন যেমন কোনোকালে ইংল্যান্ডের হৃদয় হয়ে উঠতে পারেনি, ঠিক তেমনিই কলকাতাও সেই একই পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশের আবেগাপ্লুত হৃদয় ধারণ করতে পারেনি। কলকাতা হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের মানিব্যাগ, গ্রাম থেকে উঠে আসা মানুষগুলোর ভাগ্য পরীক্ষা করার কেন্দ্রস্থল, বাণিজ্যিক সভ্যতার ক্যাসিনো। কলকাতার সঙ্গে আর বাংলাদেশের হৃদয়াবেগের কোনও সম্পর্ক নেই। এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ ব্যঙ্গের

ছলে জানিয়েছেন, কোম্পানির কার্যকলাপে আহ্লাদিত হয়ে অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে কোম্পানির ডিরেক্টরেরা লিখেছিলেন—

It is enough our Cash feels the benefit (26 February 1703)[৯]

লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের বংশধরদের জমিদারি কলকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটি কোম্পানি কিনেছিল নবাবকে নগদ 'ক্যাশ' দিয়ে। সেই কলকাতা আয়তনে বেড়েছে, বাণিজ্যিক উন্নতি করে ক্রমে গ্রাম থেকে টাউন হয়েছে, তাতে তো 'ক্যাশ'-এর হৃদয় স্পন্দিত হওয়ারই কথা! টাকা, তার আবার হৃদয়! যে কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে ক্যাশের ওপর এবং বিকশিত হয়েছে সামন্ত-ধনতান্ত্রিক মননের ভিত্তিতে, সেই কলকাতায় বসবাসকারী মানুষগুলোর ভাগ্য, হৃদয়বৃত্তি, পরিণতি যে টাকাই নির্ধারণ করে দেবে, এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকে না। টাকার মূল্যে মানবিক-সামাজিক মূল্য নির্ধারিত হওয়ার প্রক্রিয়া কীভাবে ফটোগ্রাফিক বাস্তবতায় উঠে এসেছে দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে, এবার সরাসরি সেই প্রসঙ্গে অনুপ্রবেশ করা যেতে পারে।

২

নিজের লেখালেখিকে যদিও দিব্যেন্দু পালিত নিজে দুটি পর্বে ভাগ করছেন, ১৯৬৪-৬৫-এর আগে এবং ওই সময়ের পরে, তবু তাঁর অনুসন্ধানের মূল সুরটিকে ধরতে গেলে দুটি পর্বের গল্প নিয়েই আলোচনা করা দরকার। ১৯৫৫ সালের ৩০শে জানুয়ারি, তখনও তিনি কলকাতায় আসেননি। এমতাবস্থায় মাত্র ১৬ বছর বয়সে দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম গল্প 'ছন্দ-পতন' (১৩৬১) প্রকাশিত হয় *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র 'রবিবাসরীয়'-তে। গল্পের প্রেক্ষাপট কলকাতা নাকি অন্য কোনও জায়গা তা বোঝবার কোনও অবকাশ নেই, তবে

ধরে নেওয়া যায় শহর বা শহরঘেঁষা কোনও জায়গার একটি পরিবারের বিবাহিত দুই বোনকে ঘিরে এই গল্প—

> সুষমা এবং নীলিমা—অনসূয়ার দুই মেয়ে। একজনের আছে প্রাচুর্য, অন্যজনের ভালোবাসা। কিন্তু, দুজনেরই জীবন একই রকম হয়ে গেল কী করে।[১০]

নীলিমার লাঞ্ছনা বাইরে থেকে সঞ্জাত আর সুষমার ঘরেই লাঞ্ছনার চাষ। নীলিমার বর সুশোভন সাহিত্যিক, বই লেখে, একটু দাঁড়িয়ে গেলেই টাকাপয়সার অভাব হবে না—এই আশা নিয়ে অনসূয়া দেবী মেয়ের প্রেমে সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বছর ঘুরেছে, নীলিমার কোলে দু-দুখানি বাচ্চা এসেছে, তবু সুশোভনের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। শেষকালে মেয়ের দুর্গতি দেখে একপ্রকার জোর করেই মেয়ে-জামাইকে বাচ্চাসহ নিজের কাছে এনে রাখেন তিনি। অন্যদিকে, সুষমাকে দেখে-শুনে বড়ো ঘরে বিয়ে দিয়ে অনসূয়া কেবল নিশ্চিন্ত নন, একপ্রকার গর্বিত। অথচ তিনি জানেনই না, তাঁর মেয়ের বড়োলোক স্বামী অতুল কন্ট্রাকটারি করে এমন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে যে, স্টেটাসের পক্ষে ক্ষতিকারক বিবেচনা করে মধ্যবিত্ত শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আর কোনোরকম আত্মীয়তা রাখতে চায় না। দামি শাড়ি-গয়নার বর্ম ভেদ করে সে কোনোদিনই সুষমার হৃদয় ছুঁতে পারেনি, ছোঁয়ার চেষ্টাও করেনি। সে কাজের মানুষ, কাজের শেষে মদ-টদ, ইয়ার-ফুর্তি এই তার জীবন। বউয়ের প্রতি সৎ ব্যবহার করুক, বা না করুক বউয়ের সদ্ব্যবহার সে যথেষ্টই করে, বড়োলোক বন্ধুদের সঙ্গে সদ্ভাব বাড়ানোর জন্য টোপ হিসেবে মাঝেমধ্যেই বউকে ঠেলেঠুলে তাদের সামনে প্রদর্শন করে। সুশোভনের আছে শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভালোবাসা ও যন্ত্রণাসিক্ত গভীর অনুভব, মান-অপমানবোধ। আর অতুল ঠিক তার বিপরীত মেরুর একজন মানুষ। খুব স্বাভাবিকভাবে সমাজে দুজনের আদর-আপ্যায়নও দু-রকম। অতুলকে সমাজ দিয়েছে অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান আর সুশোভনকে কেবলই লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান,

দারিদ্র। এদের দুজনের অবস্থান আলাদা হলেও অদ্ভুতভাবে দুজনের পরিবারের মানসিক অবস্থা একেবারে পাশাপাশি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যন্ত্রণা কারোরই কম নয়। সুষমা টাকার জোরে বাইরে থেকে ঝকঝকে-তকতকে একটা আবরণ নিয়ে চলে। ভালোবাসা, যত্ন-আত্তি সবকিছুই সরবরাহ করে বাইরে থেকে, অন্তর থেকে সে সম্পূর্ণ শূন্য। বহিরাবরণের পূর্ণতা থাকলেও মনের গভীরে সে সম্পূর্ণ একা। এদিকে নীলিমা বাইরের সমস্ত মানুষের কাছে দিনমান অপমান কুড়িয়ে, দিন শেষ করে সুশোভনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় আবিষ্ট হয়ে। অথচ সে তার নিজের মায়ের কুচিন্তার কেন্দ্রস্থল, একরকম গলগ্রহ, এমনকি সন্দেহের পাত্রী। অথচ যাকে নিয়ে চিন্তা হওয়ার কথা ছিল, সেই সুষমার খাতির-যত্ন সবই নীলিমার থেকে অনেক বেশি। সুষমার সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থান অনেকটা লকারে রাখা জড়োয়ার গয়নার মতো, কাজে লাগে না, একাকী পরিত্যক্ত অবস্থায় সারাক্ষণ ঘরের কোণে পড়ে থাকে অথচ, মিথ্যে গর্বের উৎসস্থল হিসেবে তাকে তার পরিবারের মানুষজন মাঝেমধ্যে দরকার পড়লে নেড়েঘেটে দেখে। এই গল্পে পুরো ব্যাপারটাই ঘটছে বিত্তকে কেন্দ্র করে। উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মেয়ের প্রতি মধ্যবিত্ত মায়ের (সমাজের) অনুভূতি। সুষমাকে কাছে টেনে নিয়ে, নীলিমাকে তার মতো করে তার ভালোবাসার কাছে সমর্পণ করা উচিত ছিল। সুষমার অন্তরের দিকে নজর দিয়ে, নীলিমাকে বাহ্যিক গঞ্জনা-মুক্ত করার দিকে মনোযোগী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সমাজ রচনা করেছে এক উলটপুরাণের। এই 'ছন্দ-পতন', এই অস্বাভাবিকতাটাই বহির্মুখী, বিত্তানুরাগী, অর্থলোলুপ সমাজের স্বাভাবিক ধর্ম। শহরের এই ইতিকথাটুকুই দিব্যেন্দু পালিত মর্মস্পর্শীভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন এই গল্পে।

'ছন্দ-পতন' বেরোনোর তিন বছর পর *আনন্দবাজার পত্রিকা*-তে আবার দিব্যেন্দু পালিতের আরেকটি গল্প প্রকাশিত হয়, 'মায়াতরু' (১৩৬৪) যার প্রেক্ষাপট সরাসরি

কলকাতা। তখনও যন্ত্রশক্তির প্রাবল্য কলকাতাকে গ্রাস করেনি। ফোন তখনও মনের তুলনারহিত ভারবাহক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেনি, চিঠি তখনও সগৌরবে বিরাজমান। এই গল্পটি গোটাটাই একটি চিঠির আকারে লেখা। এগারো বছর বয়সে মা-হারা নবীন কিশোরী তরু বরাতের জোরে সম্পর্কে জ্যাঠা বা কাকা রমাকান্ত লাহিড়িদের বাড়িতে কোনোক্রমে আশ্রয় পায়, কিন্তু আশ্রিতের ভাগ্যের পরিণতি কালক্রমে যা হয় তরুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পরিবারের কচি-কাঁচার সংখ্যা বেড়ে উঠবার পাশাপাশি নব-নব বাজেট অধিবেশনে তরুর মূল্য ক্রমশ কমতে থাকে, দায়-দায়িত্ব, অত্যাচার, অপমান বাড়তে থাকে। তবে শুধু আশ্রিত এবং আশ্রয়দাতাদের মধ্যেকার টানাপোড়েনের গল্প এটা নয়। তরুর জীবনেও আর পাঁচটা তরুণীর মতো প্রেম আসে, তবে তা তার দুর্ভাগ্যের ফেরকে আরও ঘন করে, আরেকবার মনে করিয়ে দেয়—

> ...সব সময় মনে রেখো, তুমি মেয়ে। মেয়ে পুরুষে তফাৎ অনেক।[১১]

তরু অনাথ, তদুপরি আশ্রিতা, বিত্ত বলতে তার কিছুই নেই। এমতাবস্থায় তার জীবনে আসে সুশিক্ষিত, সুপুরুষ যুবক অলোক। অলোকের মতো 'গুণী ছেলে' তরুর মতো অনাথ, বিত্তহীন মেয়েকে নিয়ে ক্ষণিকের লীলা-খেলায় মেতে উঠতে পারে, অসামাজিক মাতৃত্বের দায় চাপিয়ে দিতে পারে, কিন্তু বিয়ে করে সামাজিক মর্যাদা দিতে পারে না। একথা সর্বজনবিদিত, সামাজিক মান-মর্যাদা-সম্মানের কল তৈরি হয় টাকা দিয়ে, বিচারও হয় টাকা দিয়ে। সুতরাং সামাজিক বন্ধনের ক্ষেত্রে বিত্তবান বনেদী রমাকান্ত লাহিড়ির মেয়ে বিথি এবং সিঁথি যতখানি উপযুক্ত, মা-বাপহারা আশ্রিতা মোটেই ততখানি নয়। 'ছন্দ-পতন' গল্পে নীলিমা তরুরই মতো বিবাহ-বহির্ভূত মাতৃত্বের অধিকারী হয়, কিন্তু নীলিমার স্বামী সুশোভন, অলোক নয়। সুশোভনের টাকা নেই বটে, কিন্তু সে বিবেকবান। অন্যদিকে, অলোক উচ্চশিক্ষিত, তার বিত্তের অভাব নেই, সেটাও আন্দাজ করা যায়, অথচ সে

প্রতারক। টাকার সঙ্গে প্রতারণা, বিবেকহীন পাথুরে মনের উল্লসিত অনাচার বারেবারে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে। কারণ টাকাই এসব করার অগ্রাধিকার দেয়, ধনতান্ত্রিক সমাজে টাকার বিনিময়ে সাত খুন মাফ হয়। তার ওপরে হৃদয়হীনতার বিকাশ যদি একটি মেয়েকে ঘিরে হয়, সেক্ষেত্রে তো কথাই নেই। সমাজ তাকে এমনিতেই 'দ্বিতীয় লিঙ্গের' সম্মান দেয়, সমাজে সে এমনিতেই প্রথম লিঙ্গের অর্থাৎ, পুরুষের আশ্রিত। আশ্রিতদের মধ্যে প্রায়শই একটা অমূলক প্রতিযোগিতা চলে, কে বেশি প্রভুভক্তি দেখিয়ে প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে। সেই জায়গা থেকে লাহিড়ি গিন্নি, বিথি এবং সিঁথি আপাদমস্তক পিতৃতন্ত্রের আদলে গড়া, তারা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্য কখনোই তরুর পাশে এসে দাঁড়ায়নি। কিন্তু যিনি তরুর হয়ে চিঠিটি লিখেছেন, তরুর প্রতিবেশী বীণাদি, তিনি সবসময় তাঁর স্নেহপ্রবণ মন নিয়ে তরুর পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। বীণা চৌধুরীকে দেখলে 'স্ত্রীর পত্র'-র মৃণালের কথা মনে পড়ে, তবে বীণা মৃণাল নয়। মৃণাল ব্যতিক্রম, অনেকাংশেই কবির ইচ্ছাপূরণ হয়েছে তাকে ঘিরে। আর বীণা বাংলাদেশের সহানুভূতিশীল, স্নেহপ্রবণ, দরদী বাস্তব চরিত্রের প্রতিনিধি, যাদের দরদ আছে, ন্যায়-অন্যায় বিচারের যথার্থ মন আছে কিন্তু সাহস নেই। সে তরুর একটা ব্যবস্থা করার জন্য কোনও একজন সহৃদয় মানুষকে চিঠি লিখতে পারে কিন্তু পুরুষমানুষের একগুঁয়েমির নিরেট পাথরে ফাটল ধরানোর ক্ষমতা বা দুঃসাহসিকতা কোনোটাই তার নেই। সে গৃহস্থ বাড়ির বউ, স্বামীর ধমক মাথায় নিয়েই চলে—

> 'তোমার অত মাথাব্যথা কিসের! আসলে ও মেয়েটার দোষ আছে।'[১২]

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৬-১৯৭৫) 'ধূপকাঠি' গল্পটি খুব সম্ভবত 'মায়াতরু' গল্পটি লেখার পিছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। দিব্যেন্দু

পালিত নিজেও স্বীকার করেছেন, তাঁর প্রথম দিককার অধিকাংশ গল্পই ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখের সাহিত্য কর্তৃক অনুপ্রাণিত—

> সত্যি বলতে, প্রায় প্রস্তুতিহীনভাবে যখন আমি হঠাৎ লেখা শুরু করি, গোড়ার দিকে সেইসব রচনায় শুধু সুবোধ ঘোষ কেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রভাবও কম ছিল না[১৩]

'ধূপকাঠি' গল্পটিও একজন সহৃদয় মহিলা, মাধুরী সেনগুপ্তর চিঠি হিসেবে পেশ করা হয়েছে যেখানে বাগবাজারের চৌধুরীদের বনেদি বাড়ির আঠারো-উনিশ বছরের আশ্রিতা যুবতী রেণুর সঙ্গে বাইশ-তেইশ বছর বয়সের ধূপকাঠি ফেরি করা অজিত বিশ্বাসের প্রেমের করুণ পরিণতি বিবৃত। যদিও এখানে অজিত বিশ্বাস রেণুকে প্রতারণা করেনি, সে তাকে চৌধুরীদের রাক্ষুসে পুরী থেকে উদ্ধার করে বেলগাছিয়ার উদ্‌বাস্তু-কলোনিতে তাদের মা-ছেলের ছোট্ট সংসারে নিয়ে যেতে চেয়েছে এবং সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করেই নিয়ে যেতে চেয়েছে, কিন্তু বিত্তগত অবস্থানের হেরফের সামাজিক পদমর্যাদা রক্ষার পথে বিপুল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে বাধা এমনই বাধা যে চৌধুরীদের আশ্রিতা কাজের লোকের দিকে চোখ তুলে তাকালেও কলোনি-নিবাসী ফেরিওয়ালাকে সমাজ উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে। অর্থাৎ, অর্থাভাব একদিকে মানুষকে হৃদয়বান করছে, আরেকদিকে মান-সম্মান কেড়ে নিয়েছে, হৃদয়ের মানুষটিকে ছিনিয়ে নিয়ে মানুষকে পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ এবং একাকী করে তুলেছে। অন্যদিকে অর্থের প্রাচুর্য মানুষকে বিবেকহীন, চিদ্‌বৃত্তিশূন্য করে তুললেও সামাজিক মান-সম্মান-আভিজাত্যের আলোকে মোড়া একটি কপট-আশ্রয় প্রদান করেছে। আর বাঙালি মধ্যবিত্তের আর কিছু থাকুক, না থাকুক সামাজিক মান-সম্মানের দিক থেকে জাতে ওঠার লোভ রয়েছে ষোলোআনা। ভিক্টোরিয়ান যুগ, ভারতীয়দের শিখিয়ে দিয়ে গেছে কেমন করে চাদরের আড়ালে আদিম জৈব-প্রবৃত্তির সাধনা করে ওপরে

টানটান শুদ্ধ চরিত্রের শুভ্র চাদর বিছিয়ে আভিজাত্য রক্ষা করতে হয়। একদিকে সমাজের ভয়াবহ সব শাস্তির প্রতি ভীতি, অন্যদিকে সমাজে জাতে ওঠার মই টাকার প্রতি ভয়াবহ আকর্ষণ —সাঁড়াশির এই দুই দাঁড়ে দুই পা দিয়ে মানুষ ভারসাম্য রক্ষা করে এগিয়ে চলেছে। কোনোরকমভাবে পা ফসকালেই সমাজ সাঁড়াশির মতো প্রবল প্রতাপে টুঁটি টিপে ধরবে। টাকা মানুষকে এভাবেই প্রলুব্ধ করে, মানুষে মানুষে বিভেদ রচনা করে অর্থের বিনিময়ে সামাজিক দাসে পরিণত করে। এই বিষয়টিই ঘুরে-ফিরে দিব্যেন্দু পালিতের নানা গল্পে বারবার এসেছে।

৩

দিব্যেন্দু পালিতের মূল আগ্রহ ধনতান্ত্রিক জীবনে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই এবং সেই সূত্রে মানুষের মনের গতিবিধির নিখুঁত পর্যবেক্ষণ। তাঁর গল্পের অধিকাংশ কাহিনিই জীবনের কড়া বাস্তবে ঘা-খাওয়া করুণ রসকে পরিবেশন করে। আপাত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও রয়েছে ছোটো-খাটো ত্যাগ স্বীকার, সুখ-দুঃখের, না-পাওয়ার বেদনার চোরাস্রোত। এই বিষাদময়তার মধ্যে ব্যতিক্রম 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি' (১৩৬৫) গল্পটি। এই গল্পটি যেন এক স্বপ্ন-রাজ্যের কোনও এক দম্পতির রূপকথার গল্প। রাজনীতি-সমাজনীতির বীভৎসতার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তৈরি একজন অত্যন্ত সাধারণ কেরানি হেমন্ত এবং তার স্ত্রী রেবার দাম্পত্যের কাহিনি। এই গল্পটি প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) 'দেবী' (১৩০৬) গল্পের একদম শুরুর দৃশ্য উমাপ্রসাদ এবং তার ষোড়শী পত্নী দয়াময়ীর খুনসুটির কথা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) 'শুধু কেরানী' (১৯২৪) গল্পের দম্পতির নীড় বাঁধার গল্প মনে করাবেই। এরা কেউই 'আফ্রিকার কালো কাফ্রী জাতের হুঙ্কার', 'হলুদবরণ মৃতপ্রতিম জাতির পুনরুজ্জীবনের' আশ্বাস নিয়ে ভাবিত নয়। মেয়েটি স্বামীকে

খাইয়ে-দাইয়ে পানের ডিবে হাতে দিয়ে স্বামীকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েই খুশি, আর ছেলেটি আপিসের কাজ সেরে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে নিরালা, নিভৃত কক্ষে বউয়ের সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের গল্প করতে পারলেই তৃপ্ত। তাদের কোনও দ্বিতল-ত্রিতল বা বহুতল বাড়ির বায়নাক্কা নেই, গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ানোর শখ নেই, নিদেনপক্ষে দী-পু-দায় ঘুরে আসার গূঢ় বাসনা আছে, এমন কথাও কোথাও প্রকাশ পায় না—

> হেমন্ত হাসে; একটু শব্দ হয়। তারপর এগিয়ে আসে। রেবা হাসে। মেঝেয়ে পায়ের ছাপ পড়ে না। নইলে দেখা যেত, হুবহু হেমন্তকে অনুসরণ করছে রেবা।[১৪]

–এই অনুসরণে তার কোনও কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, গ্লানি নেই, অনুযোগ নেই। অন্য কিছু নয়, এখানে রেবার নিখাদ ভালোবাসা হেমন্তের 'পিছু-পিছু ধায়'। অন্যদিকে, হেমন্ত পরিবারের কর্তা হিসেবে, অর্থের যোগানদার হিসেবে কোনও বাড়তি সুযোগ-সুবিধে তো নেয়ই না, বরঞ্চ পরিবারের সবার কথাই সে আগে ভাবে। রেবার টাকাকড়ির চাহিদা নেই, তবে সে একটা সামান্য অনুরোধ করে হেমন্তর কাছে, হেমন্ত যেন এই কনকনে ঠান্ডায় পুরোনো শালখানা ছেড়ে এবার একটা ভালো কোট কেনে, তা সে যত দামিই হোক। রেবার কথা রাখতে গিয়ে মহিলাদের অন্য একটি লাল রঙের কোট দেখে যথারীতি হেমন্তর চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক দৃশ্য—

> গাঢ় লাল ওই কোট পরলে কী সুন্দর মানাবে রেবাকে![১৫]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কেরানি যেমন ট্রামের খরচা বাঁচিয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে স্ত্রীর জন্য ফুলের মালা কিনে এনেছিল, তেমনি হেমন্তও নিজের জন্য কোট কিনতে গিয়ে রেবার জন্য কোট কিনে হাজির হয় রেবার সামনে। আসলে যেখানে অন্তরের প্রেমের উষ্ণতা এত তীব্র, একে অপরের প্রতি ভাবনা, যত্ন এত বিশুদ্ধ সেখানে বাইরের ঝড়-

ঝাপটা, শীত-গ্রীষ্মের সঙ্গে যুঝতে কোনও বহিরাবরণ, টাকার প্রলেপ আর দরকার পড়ে না। সংসারের মালিন্য, অর্থের লোভ, সমাজের কলুষতা এখনও এদের দাম্পত্যে হানা দেয়নি। তাই অন্তরের উষ্ণ সৌন্দর্যেই এদের দাম্পত্য উজ্জ্বল এবং সুরক্ষিত–

> উজ্জ্বল, উষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে হেমন্ত। তারপর হঠাৎ, সেই দুঃসহ শীতে, ধোঁয়া-ধোঁয়া ঘন কুয়াশার মধ্যে আকস্মিক ক্ষিপ্রতায় রেবাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'কোটের দরকার কী রেবা...!'
>
> হেমন্ত আরো কী বলছিল; রেবার বুক ভিজে গেল। বলল; কিন্তু কী বলল, হেমন্ত শুনতে পেল না।[১৬]

দাম্পত্যের একেবারে অন্যরকম আরেকটি ছবি উঠে আসে 'পলাতকা' (১৯৬৪) গল্পে। এখানে তুলে ধরা হয়েছে একজন হতভাগ্য বিত্তবান আর্টিস্ট শরদিন্দুর একফালি জীবন। হেমন্ত এবং রেবার মধ্যবিত্ত জীবনে যে জিনিসগুলির অভাব, সেই নাম, যশ, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, সন্তান-সৌভাগ্য, সর্বোপরি অর্থের প্রাচুর্য কোনোকিছুর কোনও অভাব শরদিন্দুর জীবনে নেই। কিন্তু যৌবনের দুর্মর আকাঙ্ক্ষার শিকার হয়ে সে তার প্রথম স্ত্রী যূথিকার মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করে ফেলে সুনন্দাকে। যৌবনের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ কার না থাকে! কিন্তু লালসা থাকা যতটা স্বাভাবিক, লালসার নিবৃত্তি মোটেই ততখানি সহজসাধ্য নয়। তবে টাকার জোর থাকলে কোনও পার্থিব চাহিদা পূরণ করাই আর অসম্ভব নয়, সেই ভাবধারাকে তোষণ করেই নিজের চেয়ে ছাব্বিশ বছরের ছোটো যৌবনমদমত্তা সুনন্দাকে গৃহিণী হিসেবে পেতে শরদিন্দুর বিশেষ কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি। কোনোকিছু পাওয়ার পথ অর্থ যতখানি সুগম করে দেয়, সে জিনিস ধরে রাখার পথ করে দেয় ততোধিক জটিল এবং দুর্গম। কারণ টাকা সততই ক্ষণস্থায়ী সুখ দেয়। পার্থিব চাহিদায় ডুবে থাকা প্রৌঢ় শরদিন্দু তাই সুনন্দাকে হারিয়ে বুঝতে পারেন—

এই ছাব্বিশ বছরের ব্যবধান গত দশ বছরে একটু একটু করে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছেন তিনি। কিসের অভাব ছিল সুনন্দার? অর্থ, মান, গৃহসুখ—এই পর্যন্ত ভেবে হঠাৎ শরদিন্দু উপলব্ধি করেন, সুনন্দার মধ্যে কিছু একটা অভাব ঘটেছিল, যা এই বয়সে, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁর পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয়নি।[১৭]

'ভাগ্যবানের বউ মরে' এই প্রবাদটা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যতখানি নির্লজ্জ আদর-আপ্যায়ন পায়, 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' ঠিক ততখানি নয়। সুতরাং, বৃদ্ধ শরদিন্দুর যুবতী স্ত্রী অন্য কারও সঙ্গে পালিয়েছে, এ কথা জানলে তার সামাজিক সতীর্থেরা যে তাকে মোটেই ছেড়ে কথা বলবে না, তা তিনি ভালো করেই জানেন। এমনকি নিজের ছেলের সামনেও এ কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ার মধ্যে রয়েছে প্রকাশ্যে নিরাভরণ হওয়ার মতোই লজ্জা এবং কুণ্ঠা। অর্থকেন্দ্রিক ক্ষণস্থায়ী সুখ এবং দীর্ঘস্থায়ী করুণ অসুখের একখানি চমৎকার নিদর্শন এই গল্পটি। প্রসঙ্গত, রমাপদ চৌধুরীর (১৯২২-২০১৮) *বীজ* (১৩৮৫) উপন্যাসের সুধাময়ীর কথা মনে করা যেতে পারে। সুধাময়ীর মধ্যে তার স্বামী শশাঙ্কশেখরের অজ্ঞাত কারণে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল অজানা আশঙ্কা। শশাঙ্কশেখর একটি পেজমার্কে তার প্রিয় ছাত্রী অপর্ণার নাম লিখে রেখেছিলেন। এর নানানরকম মানে দাঁড়াতে পারে কিন্তু কোনোভাবে যদি এমন হয়, শশাঙ্কশেখর তার ছাত্রীর প্রতি দুর্বলতার কারণে হঠাৎ স্ত্রী-সন্তান-সংসার ছেড়ে উধাও হয়েছেন, তবে সুধাময়ীর কাছে তা হবে তার অ্যাক্সিডেন্টের খবরের চেয়েও মারাত্মক। কারণ তার ফলে সুধাময়ী সমাজ, সন্তান-সন্ততি সকলের কাছে ছোটো হয়ে যাবেন। সমাজ সম্পর্কে এই দারুণ ভয় সুধাময়ীর থেকেও বেশি শরদিন্দুর মধ্যে ছেয়ে গেছে, তিনি সাইটিকার ব্যথায় কুঁকড়ে গেছেন, নিরন্তর চেষ্টা করে গেছেন যাতে একদিনের জন্য অন্তত পাড়াপড়শি, এমনকি নিজের ছেলের থেকেও ঘটনাটা লুকিয়ে রাখতে পারেন। নিজেকে নিজেই

সমস্তকিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন। শরদিন্দু বা সুধাময়ীর এই একক মানসিক সংগ্রামের কোনও দীর্ঘসূত্রী সমাধান নেই। কারণ এর সঙ্গে কিছু সামাজিক মানদণ্ড জুড়ে আছে— অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান এবং সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত মন।

৪

'অপমান' (১৩৭৪) এবং 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ' (১৩৭৪) দুটি গল্পেরই নায়ক শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত। প্রতিষ্ঠান তাদের বিত্ত, সম্মান এবং সেই সূত্রে সাফল্যের আবেশ জড়ানো স্ত্রী উপহার দিয়েছে, তবে পাশাপাশি মনে করিয়ে দিয়েছে— 'তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন, মন রে আমার।/ তাই জনম গেল, শান্তি পেলি না রে মন, মন রে আমার।।' সাঙ্ঘাতিক রকমের আর্থিক সাফল্য থাকার পরও 'অপমান' গল্পের ভবতোষ যখন হঠাৎ একসময় খেয়াল করে সাফল্যের পেছনে দৌড়তে দৌড়তে সে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল, ভুবন নামের একজন (বা একাধিক) বেকার যুবককে সে কথা দিয়েছিল চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে। তারপর তার তাৎক্ষণিক অসাবধানতা এবং অনবধানতার কারণে যখন ভুবন সুইসাইড করে, তখন সে অনুভব করে—

> '...ভুবন তাঁকে নিঃস্ব করে গেছে।'[১৮]

ভবতোষ শেষ-অবধি অন্তহীন নৈঃশব্দ্যের মাঝে বিহ্বল হয়ে পড়ে। অর্থ এবং ক্ষমতা তাকে শেষ পূর্ণতাটুকু প্রদান করতে অক্ষম হয়। যাবতীয় জাগতিক সুখের উপস্থিতি সত্ত্বেও সে ভগ্নপ্রায় অবস্থায় একাকিত্বের অন্ধকারে ডুবে যায়।

'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ' গল্পের কথক, মুন্নির লাটুদার অবস্থাও অনেকটা এরকমই। বাইরের চাকচিক্য রয়েছে, বহু মানুষের তোষণ রয়েছে, কিন্তু সংসারে প্রবল অশান্তি, স্ত্রীর সঙ্গে মন-কষাকষি তার মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখে। মধ্যবিত্ত ভীরুতা, নৈতিকতার বোধ

তাকে সংসারে বেঁধে রাখে। স্বাচ্ছন্দ্যের অভ্যেস তাকে বহুতল অফিসের ঠান্ডা ঘরে কারারুদ্ধ করে রাখে কিন্তু মেকি আবরণহীন কিশোরী মুন্নির সতেজতা, অকৃত্রিম সান্নিধ্য তাকে বন্ধন-মুক্তির জন্য হাতছানি দেয়। মুন্নি যেন তার কাছে সমাজ-বহির্ভূত এক বেনামি নির্জন দ্বীপ, যেখানে প্রকৃতির বুক ভরা শীতল বাতাস আছে, অর্থ-প্রতিপত্তি-সম্মানের গরাদবিহীন মুক্তির আস্বাদ আছে। কিন্তু এরা কেউই সমাজের দায় থেকে আর কোনোদিন মুক্ত হবে না কারণ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সাফল্যের অভ্যেসের মধ্যে প্রবেশ করার পথ আছে, তবে মৃত্যু ব্যতিরেকে এই অভ্যেস থেকে বেরোনোর আর কোনও পথ নেই। তাই সবশেষে গল্পের কথক (মুন্নির লাট্টুদা) বলে—

> জানি, আজকের এই দেখা হওয়াটাও মিথ্যে। তোর সরল, নিষ্পাপ জগৎ থেকে আমি যে অনেক দূরে পড়ে আছি, মুন্নি![১৯]

মুন্নি যেন যান্ত্রিক জীবনের জটিলতা থেকে মুক্তির প্রতীক। কথক জানে স্বাচ্ছন্দ্য এবং অভ্যাসের এই যান্ত্রিক পরিসর থেকে তার মুক্তি নেই। সারল্যের সবুজ আভা তাকে এই বদ্ধতার মাঝে তাৎক্ষণিক শীতল বাতাসের আরাম দিতে পারে, কিন্তু চির-মুক্ত করতে পারে না। সামাজিক অবস্থান এবং দায়বদ্ধতার মাঝে তাকে মানসিক শূন্যতা নিয়ে এভাবেই চিরকাল গুমরে মরতে হবে। 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ' গল্পের কথক মধ্যবিত্ত ভীরুতা, নীতি–নৈতিকতা, লোক–লৌকিকতা, অসাড় দাম্পত্য জীবন, মানসম্মানের সামাজিক বন্ধনে জড়িয়ে কলে-পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করছে, কিন্তু ক্রমাগত বাইরের লোকেদের, কখনো-কখনো নিজেকেও ধাপ্পা দিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি জীবন চূড়ান্ত অসুখে ভুগে ক্লান্ত হয়ে গেলেও মানুষ মেক-আপের বহিরাবরণ দিয়ে নিজেকে যেভাবে সর্বজনসমক্ষে পেশ করে, তার দুর্দান্ত একটি উদাহরণ এই গল্পটি। এই আলোচনার স্বপক্ষে গল্প-কথকের কিছু স্বগতোক্তি তুলে ধরলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়—

ঘরে যেমনই থাকি না কেন, বাইরে আমি খুব সুখী।[২০]

প্রতিনিয়ত বাইরের লোকেদের বোকা বানানোর পাশাপাশি, নিজের মনকে শান্ত করে রাখার জন্য কথক নিজেকেও ভুল বোঝায়, মিথ্যে আশ্বাস দেয়—

আমার বুকের মধ্যে একটা ফাঁকা নিঃশ্বাস হইচই করে উঠল। ব্যাপারটা ভালো লাগল না। তখন চোখ বন্ধ করে, গতি আগলে, অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায় আমি ভাবলুম আমিই নায়ক, আমার দুঃখটা বড়োই আধুনিক, আজকের যে-কোনও লেখক আমাকে নিয়ে দৈনিক, সাপ্তাহিকে গল্প লিখতে পারে।[২১]

মাপা লেখনীর অসামান্য দক্ষতার পরিচয়বাহী প্রতিটি সংলাপ মর্মমূলে এসে আঘাত করে। ঠিক কতখানি মিথ্যের চাদরে মানুষ নিজেদের মুড়ে রাখে তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে যখন গল্প কথক লাট্টুদার সঙ্গে কিশোরী মুন্নির হঠাৎ করে রাস্তায় দেখা হয়ে যায়। মুন্নির তরতাজা সারল্যের সুবাস, নব যৌবনের স্নিগ্ধতা, ছোটো-ছোটো হ্যাংলামো, সহজতা লাট্টুদার মিথ্যের কঠিন আবরণকে নির্মমভাবে ভর্ৎসনা করে যায়, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদেরও—

মুন্নি আমার ঠিক সেই ব্যাথার জায়গাটায় ঘা দিল।...মুন্নি জানে না এই মুহূর্তে আমি কী ভীষণ অসহায়, আমি যা বলছি সবই বানিয়ে বলছি। বলছি জোর করে। আমার কোনও কথাই কথা নয়।[২২]

এই সামাজিক উপস্থিতির কোনও সারবত্তা নেই, কোনও ভিত্তিভূমি নেই, আছে শুধু মিথ্যার আস্ফালন, দেখনদারির নিষ্ফল প্রয়াস। অন্তরের সত্য অনুভবটি হল একাকিত্ব এবং অসহায়তা।

৫

‘চিঠি’ (১৩৭৫) গল্পে দিব্যেন্দু পালিত টাকা, সম্পর্ক এবং বিয়ের মধ্যেকার একটা অদ্ভুত সমীকরণ দেখিয়েছেন। সমাজে বেঁচে থাকার প্রাথমিক ভিত্তি যদি হয় টাকা, সেখানে বিয়ের মতো একটা সামাজিক বন্ধনও আবশ্যিকভাবে টাকার নিরিখেই তৈরি হবে। তার ওপরে এই সমাজ যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক, মেয়েদের মালিকানা যেখানে ছেলেরাই পায়, সেখানে ভালো দামি বাড়ি-গাড়ি পেতে গেলে যেমন সম্পত্তির মালিক হতে হয় তেমনি ভালো মেয়ে পেতে গেলেও মোটা টাকা রোজগার করতে হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে যাচাই করে নেওয়া হয়, মেয়েটি রূপের দিক থেকে আকর্ষণীয় কিনা, গৃহকর্মে নিপুণ কিনা আর উল্টোদিকে ছেলেটি আর্থিকভাবে সুরক্ষিত কিনা। গল্পের প্রথমেই দেখা যায়, নীলা চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছে কারণ সে গৃহ-শ্রমিকের স্থায়ী চাকরি পেয়ে গেছে তাও আবার এমন একজনের কাছে যে সরকারি অফিসার। সুতরাং, এমন শাঁসালো পাত্র ছাড়ার চেয়ে নিজের চাকরি এবং কম মাইনের পুরোনো প্রেমিককে ছাড়া অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ। সে মনকে প্রবোধ দিয়েছে এই বলে—

> আমার জীবনে সিকিউরিটির বড়ো অভাব। এছাড়া আর উপায় ছিল না।[২৩]

প্রথমাবস্থায় নীলার প্রাক্তন প্রেমিক দ্বিজেন সম্পর্কে পাঠকের মন রীতিমতো আর্দ্র হয়ে ওঠে। তারপর আচমকা দ্বিজেনের নীলাকে লেখা একটি চিঠি তাদের দুজনকেই এক সারিতে এনে দাঁড় করায়। দ্বিজেন তাকে জানায়, তার যা আর্থিক পরিস্থিতি তাতে নীলার দায়িত্ব নেওয়া তার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব ছিল না। নীলা তাকে এই দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে অন্য আরেকজনকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে, তাই সে নীলার প্রতি কৃতজ্ঞ। শুধু তাই নয়, তারা একই অফিসের সদস্য। নীলা না হয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে লোক-গঞ্জনার

হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে কিন্তু তাকে তো এই অফিসে থাকতে হবে। তাই সে নীলার ডেস্কের সামনে গিয়ে একটি নাটকীয় দৃশ্য রচনা করে নীলার ঘাড়ে যাবতীয় দোষ চাপিয়ে অফিসের সতীর্থদের সহানুভূতি আদায় করে, তারপর নিশ্চিন্ত হয়। দুজনেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মধ্যবিত্ত-মেকিপনার নির্ভেজাল দৃষ্টান্ত। এদের মধ্যে একাধারে সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ধনতান্ত্রিক প্রাচুর্যের প্রতি তীব্র লোভ। নারী-পুরুষের এই অবস্থানটিকেই বোধহয় সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) তাঁর *বিবর* (১৯৬৫) উপন্যাসে চিহ্নিত করেছেন—

> তুমোও যা, আমুও তাই। পরস্পরের পাপের সঙ্গে একটা আঙ্কিক কাটাকাটি খেলা খেলে, ইজিকাল টু সমঝওতা করে চলছে না?’[২৪]

এই পারস্পরিক ‘সমঝওতা’-ই মানুষে মানুষে মনের মিলনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। এই ‘সমঝওতা’ আসলে বিচ্ছিন্ন সামাজিক সহাবস্থান তৈরি করে মানুষকে একাকিত্বের পথে এগিয়ে দেয়।

‘চশমা’ (১৩৭৮) গল্পের মুখ্য চরিত্র অনীশ একজন সাধারণ কেরানি। তার অবস্থা অনেকটা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) ‘খাজাঞ্চিবাবু’ (১৩৪২) গল্পের অসহায় খাজাঞ্চিবাবুর মতো। তুখোড় স্মার্ট বসের হিসেবে এরা কাজে-কম্মে একেবারেই বেহিসেবি, এদের কাজ থেকে ‘স্যাক’ করা উচিত। অনীশ তার বসের আতঙ্কে আধখানা হয়ে ভাবে—

> ...বাঁচতে হলে চশমাটা এখনই পাল্টানো দরকার।[২৫]

খাজাঞ্চিবাবু অবশ্য চশমা বদলাবার পরেও কাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। কারণ ধনতন্ত্রের যুগে তিনি যে কেবল চশমা বদলে টিকে থাকতে পারবেন না, সে দূরদৃষ্টি তাঁর

ছিল না। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং বিধবা দিদির ভার একার কাঁধে নিয়ে পুরোদস্তুর সংসারী অনীশ বুঝেছে, টিকে থাকতে গেলে অনুনয়-বিনয়, ক্ষমা-প্রার্থনা এসব কিছুই কাজে দেয় না। তাই শেষপর্যন্ত সে নিজের বোনাসের পুরো টাকাটাই ঘুস হিসেবে দিয়ে দিয়েছে ওপরওয়ালা জহর দাসের কাছে। তারপর শূন্য হাতে পা দিয়েছে তালগোল পাকানো অনিশ্চিত জীবনের পথে। অনীশ এবং তার পরিবারের ভবিষ্যৎ-জীবন তার চশমার কাচের মতোই ঝাপসা, অনিশ্চিত, যেকোনো মুহূর্তে তার জীবন কাচের মতো টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। খানিক বাধ্য হয়েই তাকে ঘুস দেওয়ার গ্লানি অন্তরে নিয়ে সেই অনিশ্চয়তার শূন্যতায় পা বাড়াতে হয়।

'চাবি' (১৩৭৯) গল্পে মুখোমুখি হতে দেখা যায় দুই প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকাকে। বর্তমানে তারা দুজনেই বিবাহিত। প্রেম সম্পর্কে রোমান্টিকদের যে বিপুল আবেগ-উচ্ছ্বাস, তা একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন লেখক এই গল্পে। মণিময় পাঁচ বছর আগে রীতিমতো পাগল হয়ে উঠেছিল যখন বুলা তাকে ছেড়ে চলে যায়। সে উত্তেজনার বশে বুলার জন্য বারোশো টাকা খরচ করে একটা সোনার লকেটও কিনে ফেলে কিন্তু বুলাকে দিয়ে উঠতে পারে না। পাঁচ বছর পর মণিময় বুলাকে ভুলে গেছে কিন্তু বারোশো টাকার শোক ভুলতে পারেনি। গতিময় যান্ত্রিক সভ্যতায় পাঁচ বছরের পুরোনো প্রেমের স্মৃতিতে আশঙ্কা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আকর্ষণ থাকে না। মণিময়ের স্ত্রী মীনার ইচ্ছে, বুলার কথা মনে করে কেনা লকেট যেন সে বুলাকেই দিয়ে দেয়। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, আলমারির চাবি যথাসময়ে খুঁজে না পাওয়ার কারণে বুলাকে আর লকেটটা দেওয়া হয়ে ওঠে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার খেয়াল হয়, চাবিটা তার ওয়ালেটেই ছিল অথচ সে দিব্যি ভুলে গেছে। এককালে যে লকেট বুলাকে উপহার দেওয়ার জন্য সে পাগল হয়ে উঠেছিল আজ সেই উন্মাদনা কোথায় তলিয়ে গেছে—

মনে হচ্ছে সে যতটা ভেবেছিল বুলার সঙ্গে তার আজকের দূরত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি! তা না হলে, মীনার কথায় অন্তত, ওয়ালেট হাতড়ে চাবিটা কি আর সে ঠিক সময় খুঁজে পেত না![২৬]

মণিময় খুব সম্ভবত ইচ্ছে করেই লকেটটি বুলাকে দেয়নি। এককালে মানুষ হিসেবে বুলা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুলা, বুলার প্রতি মণিময়ের আবেগ ইত্যাদি গুরুত্ব হারিয়েছে বটে, কিন্তু টাকার গুরুত্ব হারায়নি। তাই বারোশো টাকার লকেটের গা থেকে বিচিত্র আবেগসম্বলিত স্মৃতিটুকু মুছে গেছে, কিন্তু লকেটটি সযত্নে লকারে গচ্ছিত রয়েছে। পণ্য-সভ্যতার কালে মানুষ, মানবিক গুণাবলী, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদির তুলনায় টাকা বা ধন-সম্পদ যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা সুস্পষ্ট করে দেয় এই গল্পটি।

৬

পণ্য-সভ্যতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল দেখনদারি। কোনও জিনিস থাকলেই হবে না, তা যদি আর পাঁচজনের চোখ টাটানোর ক্ষমতা না রাখে, তবে সে জিনিস উপভোগ করার পুরো আনন্দটাই মাটি। 'টিভি' (১৩৮২) গল্পটি এই ভাবধারার একটি চমৎকার নিদর্শন। টিভি নাম শুনেই বোঝা যায় যন্ত্র-সভ্যতার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু নিয়ে এই কাহিনি রচিত। ১৯২৬ সালের ২৬শে জানুয়ারি ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন লগি বেয়ার্ড (১৮৮৮-১৯৪৬) প্রথম টেলিভিশিন আবিষ্কার করেন। এরপর রুশ প্রকৌশলী আইজ্যাক শোয়েনবার্গ (১৮৮০-১৯৬৩) ১৯৩৬ সালে প্রথম টিভির সম্প্রচার শুরু করেন। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে টিভি চালু হয় ১৯৪০ সাল নাগাদ, মোটামুটি ৪৫-এ গিয়ে এর প্রচার অনেকাংশে পূর্ণতা লাভ করে। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের মাত্র সাতটি শহরে টিভি দেখার ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং ১৯৭৬ সাল নাগাদ টিভির দাম যে নেহাত কম ছিল না, সে কথা বলাই

বাহুল্য। এরই মধ্যে ট্রামে-বাসে চাপা হাজার টাকা মাইনের নিতান্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত কেরানি অতীশ বউয়ের গয়না বেচে টিভি কিনে আনে শুধুমাত্র ফিয়েট হাঁকানো, বিলিতি পাইপ ঠোঁটে নিয়ে ঘোরা প্রতিবেশী গুঁইবাবুর স্ত্রী মল্লিকার অপমানের জবাব দেবে বলে। অতীশের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক আদর্শে গড়া, যেখানে বাইরের কাজ করে সংসারে টাকা আনে অতীশ এবং তার স্ত্রী বুলা ঘর-সংসার, সন্তানদের সামলায়। অতীশের মুখের গোড়ায় খাবার না এনে দিলে সে যেমন খেতে পারে না, তেমনি টাকা-পয়সার যোগান হবে কীভাবে বা বাইরের জগৎ সম্পর্কে বুলা কোনও খোঁজ-খবর রাখে না। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই বুলার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় টিভি নামক বোকাবাক্সটি। সময় কাটানোর এই উপকরণটি যন্ত্র-সভ্যতার অন্যতম হাতিয়ার। বুলা প্রথম দিকে মল্লিকাদের বাড়িতে টিভি দেখতে যেত, হঠাৎ একদিন মল্লিকাদের বাড়ি থেকে আপত্তি আসায় সে ভীষণরকম অপমানিত বোধ করে এবং টিভি কেনার জন্য জেদ ধরে বসে। তুচ্ছ মান-অপমানবোধ, পণ্যজাত ক্ষণস্থায়ী সুখ, প্রতিযোগিতার স্পৃহা এইভাবেই ধীরে ধীরে যন্ত্রের প্রতি মানুষকে নির্ভরশীল করে তোলে। এই সুখের কাছে অনায়াসে বিকিয়ে যায় তাদের বাড়ির তিন পুরুষের সম্পদ, মায়ের স্মৃতিচিহ্ন—সীতাহার। পণ্য-সভ্যতার কাছে প্রাচীন ঐতিহ্য, মূল্যবোধের চূড়ান্ত পরাজয় দেখানো হয়েছে এই গল্পে। অন্তরের অনুভূতি বলতে এখানে আর কিছুই পড়ে নেই, সবটাই বাইরের জাঁকজমক, দেখনদারিতে পর্যবসিত হয়েছে। তাই অনীশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম টিভি ঘরে আনার সময় বলে উঠেছে—

> বাবা, ট্যাক্সিটা মল্লিকামাসিদের বাড়ির সামনে থামালে ভালো হত না!...দেখানো যেত![২৭]

এই দেখনদারির ভিড়ে মানুষে মানুষে প্রীতির, নির্ভরশীলতার ঐক্য বিলুপ্ত হয়েছে। শুভবোধ, শুভচিন্তা-চেতনার স্থান দখল করেছে প্রতিযোগিতার মানসিকতা। একে অপরকে টপকে যাওয়ার খেলায় ঈর্ষা, রেশারেশির মতো নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা ক্রমাগত একজন

মানুষের থেকে আরেকজনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। সাফল্য-লাভের এই প্রতিযোগিতায় সমস্ত প্রতিযোগীই আসলে একা এবং সাফল্য মনে করে তারা যা লাভ করছে, তা আসলে শূন্যতা। ‘টিভি’ গল্পের কয়েক বছর আগে রমাপদ চৌধুরী ‘ফ্রীজ’ (১৩৭৫) এবং ‘ডাইনিং টেব্‌ল’ (১৩৭৬) নামের দুটি গল্প লেখেন। উন্নত জীবনযাত্রার প্রতীক মনে করে মধ্যবিত্তের ‘আধুনিক স্ট্যাটাস সিম্বল’ প্রকাশক টিভি, ফ্রিজ, ডাইনিং টেব্‌ল, ড্রেসিং টেব্‌ল ইত্যাদির প্রতি অমোঘ বিকৃত আকর্ষণের চমকপ্রদ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে রমাপদ চৌধুরীর এই দুটি গল্প। কেবলমাত্র আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর সামনে মেকি সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শন করতে গিয়ে মধ্যবিত্তের দল কীভাবে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের মায়া কাটিয়ে পণ্য-সভ্যতার প্রলোভনের ফাঁদে পা বাড়াচ্ছে, তার বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে এখানে। ভোগবাদী মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হয়ে এরা যে কেবল আর্থিক সংকটে জড়িয়ে পড়ছে, তা-ই নয়। সাধ্যাতীত আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার পর আত্মসন্তুষ্টির অগভীর, লঘু অনুভূতির আস্তরণ ছেদ করে শীঘ্রই মানসিক দ্বন্দ্ব, দোলাচলতা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির চিরকালীন বিরোধের গুরুভার উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এই প্রচণ্ড মানসিক ভারের চাপে ক্লান্ত, জরাজীর্ণ মানুষ উজ্জ্বল, রঙিন বস্তুসমূহ দিয়ে বাইরেটুকু ভরিয়ে তুললেও অন্তরে ভয়ানক শূন্যতা নিয়ে বেঁচে থাকে।

‘সীমানা’ (১৩৮৩) গল্পে অবশ্য দিব্যেন্দু পালিত গ্রাম-শহরের টানাপোড়েনের মধ্যে শেকড়ের টানকে, প্রাচীন মূল্যবোধকেই জিতিয়ে দিচ্ছেন। ‘খেলা’ (১৩৮৪) গল্পে আবার ফিরে আসছে পণ্য-সভ্যতার কাছে মানুষের অসহায়তা এবং শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত পরাজয়। ‘খেলা’ গল্পের বিনয় খাটতে খাটতে কুঁজো হয়ে যায়, তবু কিছুতেই সংসারের হাঁ-মুখগুলো বন্ধ করার মতো টাকা যুগিয়ে উঠতে পারে না। সংসারকে কোনোরকমে টিকিয়ে রাখার জন্য দিনের পর দিন লড়তে থাকা ভারবাহী বলদের মতো জীবনে সন্তান ‘ভুতুর জন্ম’ এক আকস্মিক ঘটনা, যা বিনয়কে আনন্দে বিহ্বল করে। সে যেন নতুন করে ভুতুর মধ্যে

নিজেকে আবিষ্কার করে। ভুতুর যাবতীয় চাহিদা মেটানোর জন্য সে দ্বিগুণ উৎসাহে খাটতে শুরু করে কিন্তু এ যুগে তো আর কাজ করলেই যথাযথ ফল আসে না। ‘ঘুস’, ‘মিডিলম্যান’ এ সব তো পণ্য-সভ্যতারই দান। বেচাকেনার যুগে যেখানে মানুষই পণ্য, সেখানে মিডিলম্যানদের প্রকোপ এড়িয়ে কোনোকিছু করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় নিজের অবস্থানটিকে সুরক্ষিত করতে গেলে ক্রমাগত দৌড়োতে হবে, অন্যকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে, প্রয়োজনে দালালের সাহায্য নিতে হবে। ছেলেকে কাঠের ঘোড়া কিনে দেওয়ার সামর্থ্য নেই তার, তাই সে নিজেই ঘোড়া সেজে ছেলেকে পিঠে চাপিয়ে দৌড় দিয়েছে, হাঁফ ধরে গেছে, তবু থামেনি। বাস্তব জীবনেও সে এভাবেই গোটা সংসারকে পিঠে চাপিয়ে নভিশ্বাস তুলে দৌড়ে চলেছে। এমন এক খেলায় মেতেছে যেখানে সে আর মানুষ নেই, কাঠের ঘোড়ার মতোই একটা নির্জীব খেলনায় পরিণত হয়েছে।

‘বাবা’ (১৩৯১) গল্পে দেখতে পাওয়া যায় এরকমই একজন অসহায় বাবাকে। গল্পটি বলা হয়েছে একজন দশ বছরের কন্যা সন্তানের বয়ানে, যার বাবা চার-পাঁচ মাস ধরে লক-আউট চলায় বেকার হয়ে ঘরে পড়ে আছে। তার মা চাকরি করে সংসার চালায়। সমাজ এই উলট-পুরাণকে সচরাচর ভালো চোখে দেখে না। পুরুষ বাইরের কাজকর্ম করবে অর্থ-সমাগমের জন্য এবং নারীরা ঘর-কন্না সামলাবে এটাই সমাজের চোখে স্বাভাবিক। অর্থাৎ পিতৃত্বের মূল দায় টাকা রোজগার করা। এই গল্পে দেখা যায়, দশ বছর বয়সি বক্তা মেয়েটি কীভাবে তার বাবার মধ্যে মাতৃত্বের স্বাদ পায়। কিন্তু সে এই মাতৃত্বের স্বাদে তৃপ্ত হলেও তার বাবা নিজে, এমনকি তার মাও রোজগারের এই অক্ষমতাকে হজম করতে পারেনি। শারীরিক অসুস্থতা, স্ত্রীর বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের আভাস ইঙ্গিত পেয়ে পিতা হিসেবে তার অসহায় পিতৃত্ব একদিন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। মাতৃত্বের ভার বহন করেও শেষপর্যন্ত পিতা হিসেবে মাতৃত্বকে বরণ করে নিতে পারেনি মায়েটির বাবা।

এই মানুষটি প্রথমে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তারপর পুরুষ হয়ে ঘরে বসে মাতৃত্বের দায় বহন করার গ্লানি নিয়ে চিরন্তন সমাজ-চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে জীবন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

পণ্য-সংস্কৃতিতে সাফল্য লাভের জন্য, আরও ওপরের স্তরে উঠে আসার জন্য একটি কল্পিত মই রয়েছে। এই মই-কেন্দ্রিক সমাজবদ্ধ জীবগুলির ভবিতব্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিনয় ঘোষ মহাশয় বলেছেন—

> মইয়ের নীচের ধাপ থেকে উপরের ধাপে লাফ দিয়ে ওঠা যায়, আবার নামাও যায়। সমাজের সকল মানুষই 'ক্লাইম্বার' এবং মুনাফা, জীবিকা, প্রতিষ্ঠা সবকিছুর অবাধ প্রতিযোগিতা হল মই-মই খেলার মতো। ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সামাজিক 'মোবিলিটি'র এমনই মাহাত্ম্য যে সামান্য 'লেবার' বা 'ফার্মার' বা 'লোয়ার মিড্‌ল'—চেষ্টা ও লক্ষ্য থাকলে—স্বচ্ছন্দে ধনী-অতিধনী কর্পোরেট-ধনীর স্তরে (Wright Mills ২) আরোহণ করতে পারেন।[২৮]

এই বক্তব্যটির স্বপক্ষে একটি চমৎকার উদাহরণ হতে পারে 'সিঁড়ি' (১৩৮৬) গল্পটি। এই গল্পের শেষে দেখা যায়, নীলা তার চাকরিকে ঘিরে স্বামী অসীমের সঙ্গে দৈনন্দিন টানাপোড়েন এবং সংস্কারে আবদ্ধ মনকে একরকমভাবে জোড়াতালি মেরে বাক্সবন্দি করে এগিয়ে গেছে। সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারে ভেজা মন এবং পণ্য-সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মন, এই দুইয়ের মধ্যে জয়ী হয়েছে তার দ্বিতীয় মন। নীলা শেষকালে যাবতীয় সংকোচ এড়িয়ে অনুসরণ করেছে তার বস শ্যামলেন্দুকেই। নীলার স্বামী অসীম তাকে নিজের কাছে টেনে নিতে পারত কিন্তু পিতৃতন্ত্রের ছাঁচে গড়া মন নিয়ে তার পক্ষে সেটা করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। নীলা বিত্তগত অবস্থান থেকে উপরে উঠতে চেয়েছে, একা নয়, সপরিবারেই উঠতে চেয়েছে। কিন্তু নীলা আর্থিকভাবে যত এগিয়েছে, অসীম ততোধিক আত্মসর্বস্বতা (ইগো) নিয়ে তাকে পরিবার থেকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

নীলা তার সংসার এবং দাম্পত্যকে মেলাবার চেষ্টা করেছে বারবার কিন্তু মেলাতে পারেনি কারণ অবশ্যই পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং সমাজ। তাছাড়াও সে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হলেও মানসিকভাবে স্বনির্ভর নয়। তাই তার মনে সংশয় জেগেছে চাকরি নিয়ে—

> সত্যি-সত্যিই চাকরি কারও আশ্রয় হতে পারে![২৯]

অসীমের সংস্কারধর্মিতার ওপর নীলারও আস্থা রয়েছে। সেও সংস্কারের বেড়া টপকে এগিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করে—

> নীলা জানে, সংস্কার এমনিতে আসে না, সংস্কারও নির্ভরতা।[৩০]

সিঁড়ির মধ্যিখানে থমকে থাকার চেয়ে ওঠা-নামা করা ভালো, এই মনে করে সে পণ্য-সভ্যতার আদর্শে গড়া শ্যামলেন্দুকে অনুসরণ করেছে এবং মধ্যবিত্তের অবস্থান থেকে মেট্রোপলিটন ‘কর্পোরেট-ধনীর’ স্তরে নাম লিখিয়েছে। তবে একটা কথা না বললেই নয়, এগোনোর জন্য তার আরেকজন পুরুষকেই দরকার পড়েছে। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিজস্ব সংস্কার থেকে তার কোনোদিনই মুক্তি নেই। কারণ সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতা বহিরাঙ্গিক দিক থেকে পণ্য-সভ্যতার রূপ পরিগ্রহ করেছে ঠিকই, অথচ অন্তঃকরণে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার এবং বিশ্বাসকে মুছে ফেলতে পারেনি। অন্তরের দিক থেকে পণ্য-সভ্যতাও সেই একই পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ বহন করে চলেছে। এর ফলে নারী-পুরুষের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে, ভঙ্গুর দাম্পত্যের সংখ্যা বেড়েছে, দাম্পত্যে থেকেও নারী-পুরুষের মধ্যে একাকিত্ববোধ ক্রমবর্ধিত হয়েছে, কিন্তু তারা মানসিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। সামন্ততান্ত্রিক আচার-ব্যবহারে বদল এসেছে কিন্তু মানসিক সংস্কার-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি।

৭

দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যে নিম্নবিত্ত মানুষের খবর কমই পাওয়া যায়। তবু যে-কটি গল্পে তিনি নিম্নবিত্ত মানুষের কথা তুলে ধরেছেন, সে সবকটি গল্পই প্রমাণ করে তিনি নগরবাসী যেকোনো বিত্তের মানুষকেই নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'আবির্ভাব' (১৩৮৯), 'জাতীয় পতাকা' (১৩৯২), 'লোকসভা বিধানসভা' (১৩৯৮) এই গল্পগুলিতে ধরা আছে কলকাতা শহরের একেবারে নিম্নবিত্ত মানুষগুলির কথা। কোনও এক অভিজাত পাড়ায় মসৃণ, চকচকে গালে গজানো ব্রণর মতো বেখাপ্পাভাবে পড়ে থাকা প্রিয়নাথ ও তার পরিবারের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার গল্প 'আবির্ভাব'। পাড়ায় রটে যায় বিখ্যাত 'হ-বাবু' নাকি বিশেষ বন্ধুতার সূত্রে প্রিয়নাথের বাড়িতে আসছেন। হ-বাবুর সরাসরি কোনও পরিচয় লেখক দেননি। তিনি যে কেউ হতে পারেন, যেকোনো নামধারী হতে পারেন। তাঁর আসল পরিচয় তিনি ভয়াবহ বিত্তশালী, সমাজে বিপুল সম্মানের অধিকারী কোনও এক 'বড়ো মানুষ'। প্রসঙ্গত রমাপদ চৌধুরীর (১৯২২-২০১৮) *ছাদ* (১৯৮৫) উপন্যাসটির কথা মনে করা যায়। এই উপন্যাসে প্রৌঢ় সোমনাথ বাবুর পরিবারে স্বয়ং দেশের প্রেসিডেন্টের আগমন ঘটবে, এই সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ার পর যেমন হুলস্থুল কাণ্ড বেধে গিয়েছিল, অনেকটা সেইমতোই প্রিয়নাথের কুটিরে হ-বাবুর হঠাৎ আবির্ভাব নিয়ে হইহই-রইরই শুরু হয়ে যায় গোটা পাড়ায়। সোমনাথের বাড়িতে প্রেসিডেন্ট আসেননি, পরিবর্তে সোমনাথকে নিতে গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সোমনাথ সেই মোক্ষম সময়ে লেকে হাওয়া খেতে যাওয়ায় আর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। তাই শেষপর্যন্ত সোমনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন। কিন্তু প্রিয়নাথের পোড়া কপাল, প্রিয়নাথের আমন্ত্রণে বৃষ্টিমুখর একটি দিনে হ-বাবু ঈশ্বরের মতোই আকস্মিকভাবে তার ঘরে আবির্ভূত হন। অভিজাত পাড়ায় এতদিন প্রিয়নাথ ছিল করুণার পাত্র, অনুগ্রহ দেখিয়ে তৃপ্ত হওয়ার আদর্শস্থল।

সেখানে হঠাৎ স্টেপ জাম্প করে প্রিয়নাথের মতো হতদরিদ্র নিম্নবিত্তের সঙ্গে উচ্চবিত্ত হ-বাবুর মেলামেশা পাড়ার লোকের সইবে কেন! সেই আক্রোশ থেকে মধ্যবিত্ত-সম্ভ্রান্তের পাড়া প্রিয়নাথের পরিবারকে একেবারে একঘরে করে দেয়। আগে প্রিয়নাথের প্রতিবেশীরা দয়াপরবশ হয়ে তাদের পরিবারকে অল্পবিস্তর যেটুকু সাহায্য করত, তাও বন্ধ করে দেয় এবং তাদের সমাজ-বিচ্ছিন্ন করে। সুতরাং কদিন পরই প্রিয়নাথের পরিবার অনুগ্রহের জলটুকুর অভাবে লাশে পরিণত হয়। মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, নিম্নবিত্তকে ব্যবহার করার হীন প্রবণতার একটা নির্মম ছবি এঁকেছেন দিব্যেন্দু পালিত এই গল্পে। অন্যদিকে এটাও দেখিয়েছেন, নিম্নবিত্তের সকরুণ জীবনে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তদের মুখ্য ভূমিকা কী—মধ্যবিত্তেরা নিম্নবিত্তদের অনুগ্রহ করবে, বিনিময়ে ব্যবহার করবে আর উচ্চবিত্তেরা কেবল এক পলকের জন্য তাদের জীবনে ঈশ্বরের মতো আবির্ভূত হবে। অবশ্য এই আবির্ভাব ঈশ্বরের মতো না বলে যমদূতের মতো বলাই ভালো, কারণ এই আবির্ভাবের অর্থই হল এতদিনকার অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকা প্রাণটুকু কেড়ে নেওয়ার শমন জারি করা।

'জাতীয় পতাকা' গল্পে দেখা যায় কৃষক-কল্যাণ সমিতির নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ। কৃষক-কল্যাণ সমিতি নাকি নিম্নবিত্ত কৃষকদের জন্য গড়া মধ্যবিত্তদের সংগঠন, এমনটাই সকলের জানা বিষয়। পলিটিক্যাল পার্টিগুলির দ্বিচারিতার ভয়াবহ রূপ দেখিয়ে লেখক এদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। কৃষক-কল্যাণ সমিতির মিছিলে হাঁটলে হাতে-হাতে দশ টাকা খোরাকি দেওয়া হবে, সঙ্গে কলকাতার চিড়িয়াখানা এবং মনুমেন্ট দেখানো হবে—এই টোপ দিয়ে হাজারি মণ্ডল এবং তার স্ত্রী গোলাপের মতো বেশ কিছু গ্রামবাসীকে কলকাতায় আনা হয়, তারপর মিছিল শেষে কলকাতার চিড়িয়াঘরে জন্তুর মতোই তাদের একলা ছেড়ে দেওয়া হয়। কলকাতার ভিড়ে হাজারি হারিয়ে যায়, তার বউ গোলাপকেও

হারায়। কৃষক-কল্যাণ সমিতির কল্যাণে হাজারি মণ্ডলের ক্রমপরিণতি হয় এইরকম, কৃষক> দিনমজুর> ভিখারি> চোর> মৃত। প্রাণ হারানোর আগে পর্যন্ত সে কিন্তু হন্যে হয়ে তার বউকে খুঁজে গেছে, পেটে খাবার না পড়লেও বউয়ের প্রতি ভালোবাসার ঘাটতি হয়নি কখনও। খেতে না পেয়ে সে আবার গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষবাস শুরু করতে পারত, নতুন করে সংসার বাঁধতে পারত, যেমনটা সবাই করে কিন্তু গোলাপকে না নিয়ে সে ফিরবে না। গোলাপ হয়তো ততদিনে সোনাগাছিতে ঠাঁই পেয়েছে। হাজারির মালিক গুলুবাবুর বক্তব্য অনুযায়ী—

> ‘এটা কলকাতা শহর। বয়সের মেয়েমানুষ পেলেই ঝেড়ে দেবে।’[৩১]

কলকাতা হৃদয়হীন শহর। এখানকার ব্যবসায়ী মানসিকতায় ভালোবাসাবাসির দর সস্তা এবং মেয়াদ স্বল্পস্থায়ী—

> ‘একদিনের ভালোবাসা। রাত কাবার হলে বেচে দেয় অনেকে।’[৩২]

স্বাধীনতা-উৎসবের একদিনের ভালোবাসা, একদিনের উদ্‌যাপনের কাছে হাজারি মণ্ডলের চিরকালীন গভীর প্রেম পরাজিত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক এগিয়ে চলার যুগে হাজারি নির্দয়ভাবে বারবার সমাজ-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সমাজ তার মতো সর্বহারা শ্রেণির মানুষের প্রতিটি আবেদন, প্রতিটি অনুযোগ, প্রতিটি চিৎকার, প্রতিটি প্রয়াসকে কুকুরের ঘেউঘেউ ডাকের মতোই অবজ্ঞা করে গেছে।

নিঃস্ব, হতদরিদ্র, সর্বহারা মানুষদের সামাজিক অবস্থান আরও একবার জোরালোভাবে চিহ্নিত হয়েছে ‘লোকসভা-বিধানসভা’ গল্পে। ‘খানকির বাচ্চা’ আর ‘মানুষের বাচ্চা’-র জীবনযাত্রায় ঠিক কতখানি ফারাক, তা একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায় কলকাতার বস্তি-নিবাসী দেহ-ব্যবসায়ী পরীর বয়ানে উঠে এসেছে এই গল্পে। লোকসভা-

বিধানসভা নির্বাচনের প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ, চিত্তচাঞ্চল্যকর বিবরণী সরাসরি গল্পে নেই, তবে লোকসভা-বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের দিনের গল্প এটি। পৃথিবীর কোনও রাজনৈতিক দলই আদৌ সমাজ-পরিত্যক্ত, নিম্নবিত্ত মানুষদের জন্য ভাবে না। দলগত আদর্শ যতই নিম্নবিত্তের উন্নতির পরিকল্পনা করে তৈরি হোক না কেন, সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এর একশো শতাংশ বিপরীত প্রকাশ দেখা যায়। কারণ দেশের অধিকাংশ নিম্নবিত্তের না আছে কোনও পরিচয়পত্র, না আছে ভোটাধিকার। তাই ভোটকে ঘিরে আলাদা কোনও উত্তেজনা পরীর মতো একজন কাগজ-কুড়ানি দেহ-ব্যবসায়ীর মধ্যে দেখা যায় না। পরীর মতো দিন আনি-দিন খাই মানুষের কাছে ভোটের দিন আর পাঁচটা ছুটির দিনের মতোই অসুবিধেজনক, 'ধান্দা'র পরিপন্থী। তাদের ভোট নেই কিন্তু পেট ভরানোর দায় আছে। পেটের আগুন নেভানোর জন্য পরীকে বাধ্য হয়ে শরীরের আগুনকে কাজে লাগাতে হয়। ছুটির দিনে শরীরের আগুন বিক্রি করার মতো লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়। তার ওপর ভোটের উত্তেজনায় অনেকেই শরীরের উত্তেজনা নিয়ে আলাদা করে ভাববার ফুরসত পায় না। তাই এইসব দুর্দিনে পরীকে সতর্ক শিকারীর মতো খদ্দের খুঁজে বেড়াতে হয়—

> চটপট একটা ডুব দিয়ে পরী ভাবল, আর চান করে কাজ নেই। লোকটা গরম থাকতে থাকতেই একটা কিছু করে ফেলা দরকার। কেটে গেলেই ফক্কা। মনে হচ্ছে এ বাবুটারও ভোট নেই তাদের মতো, কিন্তু খিদে আছে শরীরে।[৩৩]

'ওষুধ' (১৩৯৭) এবং 'সোনার ঘড়ি' (১৩৯৪) গল্পে পাওয়া যায় তথাকথিত শিক্ষিত 'ভদ্দরলোকেদের' কদর্য অন্তরলোকের পরিচয়। 'ওষুধ' গল্পের বস্তিবাসী পারুলের মালিক এবং 'সোনার ঘড়ি'-র দেবদত্ত দুজনেই কলেজের প্রফেসর, শিক্ষিত, পরিশীলিত। পারুলের ভাষায়—

> এরা ভদ্দরলোক, বিদ্বান। এদের মনের হদিস আমি পাব কী করে!'[৩৪]

মনের হদিস সে সত্যিই পায়নি। জাতে ওঠার লোভে পারুল তার বিবাহিত মালিকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। মালিকের ছদ্ম-অনুগ্রহ পেয়ে সে আনন্দে শিহরিত হয়। পরে মালিকের স্ত্রী যখন তাকে কাজ থেকে বিতাড়িত করে, তখন তার হুঁশ ফেরে। 'পেট' (১৩৯৫) গল্পে দেখা যায় পারুলের মতো আরেক নিম্নবিত্ত যুবতী নয়নতারাকে। সেও পারুলের মতোই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্দরলোকদের' ফ্ল্যাটে কাজ করে। তার মতো অতি সাধারণ একজন কাজের মেয়ের পেট খারাপ বা বমি হচ্ছে —এরকম ছোটোখাটো শারীরিক অসুস্থতার খবর শুনে নিদারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে কেউ তার মাথায় হাত বুলিয়ে যাবে বা সত্বর ডাক্তারের কাছে ছুটবে, এমন আশা করাটাই অবান্তর। কিন্তু নয়নতারার অসুস্থতা দুশ্চিন্তার কারণ না হলেও নিন্দা-সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠতে বাধা নেই। একে ঘন ঘন বমি করা, তার ওপর অষ্টাদশী হওয়ার অপরাধে তার পেট হঠাৎ করে সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে গোটা ফ্ল্যাট জুড়ে। নয়নতারার পেটকে ঘিরে মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাট-কালচারের সব ধরনের কুৎসিত দিকগুলো এই গল্পে নিটোল বাস্তবতার সঙ্গে উঠে এসেছে। কাজের লোক মারফতই হোক, দুপুরের কর্মহীন মেয়েলি আড্ডার বিলাসী বৈঠকেই হোক বা ফ্ল্যাটের বাবু-বিবিদের একান্ত-যাপনের সময়ই হোক, প্রতিক্ষেত্রেই ফ্ল্যাটের বিভিন্ন পরিবারগুলির দুর্বলতার জায়গাগুলিতে খুঁচিয়ে ঘা না-বানালে মজলিস জমে ওঠে না। মধ্যবিত্তদের মধ্যেকার চিরন্তন মানসিক নিরাপত্তাহীনতা এবং দৈন্যতাবোধ অন্যের দুর্বলতাকে পাঁচকান করে সাময়িকভাবে আয়েশ-বোধ করতে চায়, কিন্তু শেষপর্যন্ত শান্তি পায় না। বরঞ্চ আরও গভীরতর দুশ্চিন্তায় ডুবে যায়। 'পেট' গল্পে দেখা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি শর্মিষ্ঠাকে তার কাজের মেয়ে নয়নতারার পেট ভাবিয়ে তুলেছে। প্রাথমিকভাবে পরচর্চার আড্ডাতে শর্মিষ্ঠা খবর পায়, নয়নতারার সঙ্গে ওপরের ফ্ল্যাটের মিস্টার ব্যানার্জীর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। এরকম চাঞ্চল্যকর গোপন খবর সংগ্রহ করে

পৈশাচিক উল্লাসে মেতে ওঠার আগেই শর্মিষ্ঠার মাথায় আসে সে যখন বাচ্চাকে নিয়ে তার মায়ের কাছে গিয়েছিল, তখন তার স্বামী পরাগও ফ্ল্যাটে একাই ছিল এবং সেই অবস্থাতেই নয়নতারা কাজ করতে আসত। মিস্টার ব্যানার্জী আর পরাগ একই শ্রেণিভুক্ত, একই বিত্তের অন্তর্ভুক্ত মানুষ আর নয়নতারা নিম্নবিত্ত কাজের মেয়ে। ফ্ল্যাটে নয়নতারাদের জন্য আলাদা বাথরুমের ব্যবস্থাও রয়েছে যাতে তারা কোনোভাবেই মালিকের বাড়ি নোংরা করতে না পারে। মধ্যবিত্তের রয়েছে উভয়সংকট। একদিকে জাতে ওঠার চেষ্টা অর্থাৎ উচ্চবিত্ত হওয়ার দুর্বার লালসা আর অন্যদিকে নিম্নবিত্ত হয়ে পড়ার সর্বগ্রাসী আতঙ্ক। সেই অস্তিত্বের সংকট আর নিরাপত্তাহীনতার বোধ শর্মিষ্ঠাকে ভীষণ অশান্ত করে তোলে। শর্মিষ্ঠা–পরাগের দাম্পত্য জীবনেও ঢুকে পড়ে সেই সন্দেহ আর ভয়ের অসন্তোষজনক অনুভূতি। অবশেষে দু-দিন পর খবর আসে নয়নতারার পেটে অ্যাবসেস হয়েছে। একশো টাকার আবেদন নিয়ে নয়নতারার মা তাদের দুয়ারে আসে। শর্মিষ্ঠা আর পরাগ পরম নিশ্চিন্ত হয়ে নয়নতারার মায়ের প্রতি একশোর জায়গায় দুশো টাকার করুণা ছুঁড়ে দেয়। সন্দেহ আর অবিশ্বাসে দীর্ণ, একাকিত্বের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া মধ্যবিত্ত পরাগ নিজের মানসিক দৈন্যকে আড়াল করতে তড়িঘড়ি গলায় মেকি আবেগ ঢেলে হৃদয়বান হয়ে ওঠার ভাব করে বলে—

‘একশো কেন! দুশোই দাও। আফটার অল, গরিব মানুষ!’[৩৫]

পরাগের এই অনুগ্রহ আসলে তার দরাজ হৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রকাশ নয়। এটি আসলে পরাগ-শর্মিষ্ঠার সম্পর্কের শূন্যস্থানটিকে পূর্ণ করার ব্যর্থ প্রয়াস।

‘সোনার ঘড়ি’ গল্পের আটচল্লিশে পৌঁছোনো শিক্ষিত, মার্জিত, প্রবল আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন দেবদত্ত ব্যানার্জির অন্দরমহলও অনেকটা এই ধারাতেই গড়া। সে

তার স্ত্রীর মাসতুতো বোন সোমাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার বিনিময়ে যৌনপণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। সোমা তার কুপ্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় দেবদত্ত তার অধ্যাপকসুলভ ভালোমানুষির মুখোশ ত্যাগ করে প্রতিশোধপরায়ণ দাঁত-নখ প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। সোমার ছেলের ঘাড়ে তার সোনার ঘড়ি চুরি করার মিথ্যে দায় চাপিয়ে তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বার্থান্বেষী মধ্যবিত্তের দল নিজেদের সামাজিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে নীচে থাকা মানুষটিকে আর্থিক সাহায্য করার নাম করে তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে প্রদত্ত অর্থ সুদে-আসলে উসুল করে নিতে চায়। একজন মধ্যবিত্ত শিক্ষক, যে কিনা শুদ্ধ চরিত্রের বিকাশ ঘটানোর জন্য ছাত্র পড়ায়, তার এই নির্লজ্জ প্রকাশ, এই দ্বিচারিতা আরেকবার সকলকে মনে করিয়ে দেয়, সুবিধেবাদী মধ্যবিত্তের জন্য যথোপযুক্ত শ্লোগান হল, ‘আমরা মুখে হরি বলি, কাজে অন্য করি’।

জন্মাবধি মধ্যবিত্ত একজন মানুষ দিব্যেন্দু পালিত তাঁর আরও অনেক গল্পে-উপন্যাসে এভাবেই আত্মসমালোচনা করে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন মধ্যবিত্তের দল কীভাবে কেবলমাত্র মেধাকে সম্বল করে পণ্যের যুগে প্রতিনিয়িত নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিক্রি করে শিল্পোৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গেছে, কীভাবে আত্মবিক্রয়ের প্রতিযোগিতায় নেমে মানবিকতার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতেছে। মধ্যবিত্তের এই অসহায় আস্ফালনের ইতিহাস অঙ্কিত হয়েছে দিব্যেন্দু পালিতের লেখায়—

> একদিকে জীবনকে সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য অনেক মানবিক দায়ের দিকে পেছন ফিরে থাকা, আবার কখনও পুরোনো সংস্কার ও মূল্যবোধের আকস্মিক উদ্ভাসে নিজেদের দাঁড়াবার

জায়গাটুকু চিনে নেওয়া – এই দোলাচলতার মধ্যে নগরমনস্ক সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা ক্রমশই করুণ হয়ে উঠেছে।

> প্রাক্-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা-উত্তর কালে বেড়ে ওঠা এইসব মানুষেরা প্রত্যক্ষ করেছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একাগ্রতা, মন্বন্তরের দিনে দেখেছে পথের পাশে জমে ওঠা মানুষেরই শব, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নৃশংসতা দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে তারা। দেশবিভাগের পর ছিন্নমূল মানুষের স্রোত নেমেছে কলকাতায় – জীবনধারণের ন্যূনতম তাগিদে তাদের জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে হারিয়ে গেছে সুপ্রচল সব আদর্শ। শোচনীয় কালের বিপাকে বিপর্যস্ত মূল্যবোধে আমাদের সামাজিক জীবনেরই দুর্দিন। অর্থক্লিষ্ট উদ্‌বাস্তু মানুষগুলো তখন আর পুরুষকারে বিশ্বাস করছে না, সতীত্ব-মাতৃত্ব-নারীত্ব প্রভৃতি যেসব স্নিগ্ধ সুকুমার শুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলিকে তারা এতদিন বড়ো মূল্য দিয়েছে সেই বিশ্বাস অপহৃত হয়ে গেল কলকাতার রাস্তায়, বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে। ধনবানেরা খুব সহজেই বিবেককে উপড়ে ফেলল, নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীরা অর্থের জন্য যে কোন রাস্তাই বেছে নিল, শুধু মধ্যবিত্তরা ঝুলে রইল ত্রিশঙ্কু অবস্থায় – বিমুখ বর্তমান আর বিশূন্য ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নিজেদের সাধ আর সাধ্যের মধ্যে ব্যবধানকে ক্রমশ বাড়তে দেখে একধরনের নিরুপায়ত্বের বোধে পঙ্গু হয়ে গেল তারা। যারা আপস করল, হৃদয়ের দিক থেকে নিঃস্ব হয়েও আপাত স্বচ্ছল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে চাইল তারা; যারা করল না পুরোনো সংস্কার আঁকড়ে থাকল, তারা ক্রমশ সমাজের একপ্রান্তে সরে গেল।[৩৬]

হতাশা এবং বিপুল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে প্রতিনিয়ত যে মানসিক লড়াই নাগরিক মানুষদের, বিশেষত মধ্যবিত্তদের স্বীকার করে নিতে হল, তাতে তারা ক্রমশ আরও অসহায় এবং আরও নিঃসঙ্গতার মধ্যে ডুবে গেল। কারণ এই লড়াই তাদের একান্ত ব্যক্তিগত, নিজস্ব লড়াই, নিজের বিবেক এবং আজন্মলালিত সংস্কারের সঙ্গে নিজের লড়াই।

দিব্যেন্দু পালিত খুব অল্প বয়সে তাঁর বাবাকে হারান। ফলে পরিবার এবং সংসারের অনেকখানি দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। দিব্যেন্দুর স্ত্রী কল্যাণী দেবী জানিয়েছেন, লেখক ব্যক্তিজীবনেও অত্যন্ত দায়িত্ববান ছিলেন। সাধারণত কবি-সাহিত্যিকদের সাধারণ মানুষেরা যেমনভাবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে—তারা সংসারবিচ্ছিন্ন, হুজুগে, উড়নচণ্ডী, ভাবালু, আবেগে ভাসমান, নিজের কল্পনার জগতে মজে থাকা দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ, দিব্যেন্দু পালিত কিন্তু সেই ধরনের সাধারণীকরণের একেবারে বাইরের একজন লেখক। ছোটো থেকে সংসার সামলানো, বন্ধুত্ব-পালন, দায়িত্ব-পালনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। সংসার সামলানোর জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেকোনো একজনকে নির্দ্বিধায় অধিকাংশ দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়। দায়িত্ব নেওয়ার যে গল্প প্রতিটা সংসারের পিছনে লুকিয়ে থাকে, সেই বহু পরিচিত অথচ অবজ্ঞাভরা গল্পগুলোকে তিনি সযত্নে তাঁর বহু গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। 'মাছ' (১৩৬৪) গল্পটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গল্পটি একটি অত্যন্ত সাধারণ, সমাজের চোখে গুরুত্বহীন, অবহেলিত মেয়ে নিরুপমার গল্প। সে বৃদ্ধ বাবা, শয্যাশায়ী মা, দুটি ছোটো-ছোটো ভাই এবং একটি অবিবাহিত বোনের সাংসারিক দায়ভার বহন করতে করতে ক্লান্ত। বিষাদময় সকরুণ প্রাণহীনতা এই গল্পের প্রাণ। নিরুপমা তার পেটের ক্ষুধা, মনের ক্ষুধা, যৌন ক্ষুধা সবকিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে সংসারের ক্ষুধা মিটিয়ে চলেছে কেবলমাত্র দায়িত্ববোধ থেকে। প্রেমের হাতছানি, বিয়ের স্বপ্ন তার জীবনেও এসেছিল তার দাদার বন্ধু বিজনের হাত ধরে। কিন্তু পরিবারের মুখ চেয়ে সে নিজের স্বপ্নের সলিল সমাধি তৈরি করেছে নিজে হাতে, সুখের রঙিন চশমা খুলে চোখ ঝলসে নিয়েছে সংসারের দাবদাহে। গল্পটি একটি উদ্‌বাস্তু পরিবারের গল্প। অর্থাৎ, ১৯৪৭-এর অব্যবহিত পরের তপ্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে এই গল্পের পশ্চাতে। তবে গল্পের

কোথাও খুব সুস্পষ্টভাবে রাজনীতির প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়নি। দিব্যেন্দু পালিতের গল্পগুলি অধিকাংশই এরকম প্রত্যক্ষ-রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে লেখা। বহিরাঙ্গিক উত্তপ্ত রাজনৈতিক ঘটনার চেয়ে ঘটনার ফলাফলকে নিরীক্ষণ করার ক্ষেত্রেই দিব্যেন্দুর উৎসাহ বেশি ছিল। রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান পরিবারতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির চর্চা করায় তিনি অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর গল্পে ছড়িয়ে থাকে অন্তঃপুরের রাজনীতির কথা। আর এই দেশের অন্তঃপুর মূলত নারীমনের অন্তঃপুর। 'মাছ' গল্পেও প্রধানত নিরুপমার মনের খবর দেওয়ার সূত্রে পরিবেশিত হয়েছে উদ্‌বাস্তু পরিবারগুলির সামাজিক অবস্থান। নিরুপমার মনকে কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে তার এক অদ্ভুত উত্তরণ লেখক দেখিয়েছেন। অন্ধকার জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দু-দণ্ড নিরিবিলি সময় কাটানোর জন্য অন্ধকার একটি জায়গায় নিশ্চিন্তে বসেছিল নিরুপমা এবং তার প্রেমিক বিজন। আকস্মিকভাবে চোখের সামনে নিরুপমাদের মতো নিম্ন-মধ্যবিত্ত একটি পরিবারে এক টুকরো মাছ নিয়ে একটি বাচ্চা ছেলে এবং রাক্ষুসে চেহারার এক বৃদ্ধার মধ্যেকার মারপিট দেখে নিরুপমার মনের সাংঘাতিক পরিবর্তন ঘটে যায়। সে তার বিজনদার সুখ আর নিরাপত্তার নিশ্চিন্ত আশ্রয় ত্যাগ করে, এতদিনকার স্বপ্নের মোহ-ভঙ্গ করে লড়াই জারি রাখবার পথটিকেই বেছে নেয়। অন্ধকারে বসে অন্ধকার থেকে উত্তরণের স্বচ্ছ, দৃঢ় পথ বেছে নেয় নিরুপমা। সে বোঝে বিজন তার একার আশ্রয়স্থল আর সে নিজে পরিবারের পাঁচটি মানুষের আশ্রয়, ভরসাস্থল। তাই তাকে হতে হবে শক্ত, দায়িত্ববান। সে নিজের সমস্ত বেদনাকে পাথরের মতো বুকে জমিয়ে তার মাকে জানায়—

> ...'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, মা। আমার বিয়ে দিও না। আমি বিয়ে করতে পারব না।'[৩৭]

দিব্যেন্দু পালিত অধিকাংশ সময়ই কলকাতাকে বেছে নিয়েছেন তাঁর গল্পের প্রেক্ষাপট হিসেবে। বহু নদ-নদী এসে যেমন মহাসাগরের বুকে মিলিয়ে যায়, তেমনি কলকাতা

এমন এক বিচিত্র শহর যা পুষ্ট হয়েছে বাংলার সব আচার–বিচার, সংস্কার, রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য, শিল্পকলা, রুচিবোধ এবং মানবিকতাকে শুষে নিয়ে। ঐতিহাসিক লুই মামফোর্ড মহানগর সম্পর্কে বলেছিলেন—

> This metropolitan world, then, is a world where flesh and blood is less real than paper and ink and celluloid. It is a world where the great masses of people, unable to have direct contact with more satisfying means of living take life vicariously, as readers, spectators, passive observers: a world where people watch shadow-heroes and heroines in order to forget their own clumsiness or coldness in love, where they behold brutal men crushing out life in a strike riot, a wrestling ring or a military assult, while they lack the nerve even to resist the petty tyranny of their immediate boss: where they hysterically cheer the flag of their political state, and in their neighborhood, their trades union, their church, fail to perform the most elementary duties of citizenship.
>
> Living thus, year in and year out, at second hand, remote from the nature that is outside them and no less remote from the nature within, handicapped as lovers and as parents by the routine of the metropolis and by the constant specter of insecurity and death that hovers over its bold towers and shadowed street—living thus the mass of inhabitants remain in a state bordering on the pathological. They become the victims of phantasms, fears, obsessions, which blind them to ancestral patterns of behavior.[৩৮]

মহানগরের এই কুৎসিত দিকগুলির সমালোচনা করে দিব্যেন্দু পালিত যেন একপ্রকার কলকাতাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে কড়া মাস্টারমশাইয়ের মতো শাসন করে গেছেন তাঁর গল্পগুলিতে। যেমন ধরা যাক ‘সিগারেট’ (১৩৭৯) গল্পে দেখতে পাওয়া যায় একজন মধ্যবিত্তকে যার দামি সিগারেট ছাড়া দিন চলে না। সিগারেট তার কাছে এক বিকৃত ‘obsession’। মধ্যবিত্তের মতো বাসে-ট্রামে চড়ে দিন কাটালেও রাজা–রাজড়ার মতো মৌজ করে সে যখন দামি ধোঁয়া টানে তখন সে উচ্চবিত্তের ভূমিকায়

অভিনয় করে কিছুক্ষণের জন্য পরম তৃপ্তির আবেশে মজে যায়। এই লোকটিই একদিন সিগারেটের বসন্ত-বাতাস শুষতে শুষতে বাস ধরতে গিয়ে একজন 'কুলি–চেহারার লোকের' সঙ্গে ধাক্কা খায়। সিগারেটের ফুলকিতে তার টেরিলিনের দামি শার্ট বুকের কাছে সিকি ইঞ্চি পুড়ে গেছে দেখে বেদম তর্জন–গর্জন করতে যায় লোকটির ওপর কিন্তু দেখে তার ছাইসুদ্ধ জ্বলন্ত সিগারেটটি রাজকীয় মেজাজে লোকটির চোখের নীচের চামড়ায় চেপে বসে আছে। অথচ সমগ্র ঘটনার নিরিখে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে নিম্নবিত্ত লোকটি। সিগারেট টেনে উচ্চবিত্ত হওয়ার ক্ষণিক সম্মোহনের জালকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দেয় এই দৃশ্য। বিত্তগত অবস্থানজনিত অসম্মান, মেকিপনার মুখোশ টেনে খুলে দিয়েছেন দিব্যেন্দু পালিত একজন নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর প্রতি একজন মধ্যবিত্ত শ্রমজীবীর নিদারুণ আচরণের ছবি তুলে ধরে।

দিব্যেন্দু পালিত কোনোদিনই খুব বিখ্যাত হওয়ার জন্য লেখেননি। যেমনটি তাঁর স্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি বহির্মুখী ছিলেন না। তাই হয়তো তাঁর রোমাঞ্চকর আত্মজীবনীর কিয়দংশেরও সদ্ব্যবহার করেননি তাঁর রচনায়। আনন্দবাজারসহ কত নামিদামি পত্রিকার ক্ষমতাবান এডিটর ছিলেন তিনি। চাইলেই জনপ্রিয়তার পথ বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর বিনম্র, একরোখা মন লোকরঞ্জনের মোহমুক্ত গভীর জীবন-দর্শন খুঁজে ফেরার পথেই অগ্রসর হয়েছে। গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত ব্যক্তি জীবনে যেমন সৎ, দৃঢ় মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন, তেমনই ছিলেন তাঁর লেখার প্রতি। তাঁর গল্পগুলিও প্রায় একগামী, যার একমাত্র কাজ শহুরে মনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, মানবিকতা, সততার পাশাপাশি দ্বিচারিতার কুৎসিততম দিকগুলি আয়নার মতো করে পাঠকের সামনে তুলে ধরা। তিনি লেখেন মূলত শহরবাসী বা মফঃস্বলবাসী মধ্যবিত্ত পাঠকদের জন্য। তাদের জন্যই তাঁর একগামী নিরলস সাধনা। তাঁর পরিচিত জগতের ক্ষেত্র যতই বড়ো হোক না কেন তিনি শহরের পরিধির বাইরে

যাবেন না, গেলেও বড়োজোর মফঃস্বল বা রহস্যময় নামহীন, ভৌগোলিক অস্তিত্ববিহীন কোনও জায়গা। এই প্রসঙ্গে দুটি গল্পের কথা বলা যায়, 'নিয়ম' (১৩৬২) এবং 'অন্ধকার পেরিয়ে' (১৩৬৩)। প্রথমটি রসুলগঞ্জ এবং দ্বিতীয়টি বেগমগঞ্জ নামের কোনও এক রহস্যময় জগতের কাহিনি। সেসব জায়গার রোজকার ছায়াছবি অনেকটা এইরকম—

> ...এক রহস্যময় অন্ধকার ক্রমশ বিস্তৃত ও ঘন হচ্ছে চারিদিকে। হয়তো রোজই হয়, এইভাবে। এত অন্ধকার জীবনে কখনো দেখিনি।[৩৯]

এই অন্ধকার কুহকের বিবর জুড়ে রয়েছে দুর্বোধ্যতার অন্ধকার। অনিন্দ্যসুন্দর প্রকৃতির মধ্যেকার এই অন্ধকারে গল্পকার কিন্তু মুক্তির আস্বাদ পাননি, পেয়েছেন 'প্রেতলোকের জঘন্য সংকেত'। 'নিয়ম' গল্পে আবার তিনি দেখিয়েছেন শহর কীভাবে গ্রামের নিষ্পাপ সারল্যকে নির্লজ্জের মতো গ্রাস করছে। এই গল্পটির কথা বলতে গিয়ে গল্পকার স্বয়ং জানিয়েছেন—

> বিষয় ও বক্তব্যের মিল না থাকলেও 'নিয়ম' গল্পটির ভাষাবিন্যাসে সুবোধ ঘোষের প্রভাব ছিল স্পষ্ট।[৪০]

দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম জীবনে লেখা এইরকম কয়েকটি গল্পে অন্যান্য বিখ্যাত গল্পকারদের প্রভাব থাকার পাশাপাশি প্রেক্ষাপট হিসেবে ভাগলপুরের মতো মফঃস্বল এবং মফঃস্বলের নির্জনতাকে পাওয়া যায়। তবে মোটামুটি ১৯৬০-এর পর থেকে সাহিত্যিক হিসেবে দিব্যেন্দু পালিত ক্রমশ স্বকীয়তায় ভাস্বর হয়ে উঠতে থাকেন। গল্পের ক্ষেত্রে তিনি নাগরিক মধ্যবিত্তদের নিয়ে সাহিত্য রচনায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যবিত্তদের জন্য অনেকেই লেখেন কিন্তু দিব্যেন্দু পালিতের লেখার হাত কোথাও যেন আলাদা। তাঁর পরিমিতিবোধ বিজ্ঞানধর্মী, যা সাহিত্যক্ষেত্রে বিরল।

নগরবাসীদের নিয়ে লেখা গল্পগুলি কিন্তু নগরস্তুতি নয়। নগরের বৈভব, প্রলোভন, চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষণ, মিথ্যার বেসাতির প্রতি তীক্ষ্ণ সমালোচনা, ধিক্কার দিব্যেন্দু পালিতের লেখার বিষয়বস্তু। নগরায়নের ফাঁদে পড়া মানুষগুলোর আর্তচিৎকার, মুখ-ব্যাদন, সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা, অমানবিকতা, সর্বোপরি অনন্ত একাকিত্ব নির্মাণ করে তাঁর গল্পের মেরুদণ্ড। যেসব নাগরিক অসঙ্গতি তথাকথিত সভ্য মানুষের দল অন্তরালে রাখার চেষ্টা করে, সেগুলিকে প্রকাশ্যে আনাই তাঁর কাজ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভূমেন্দ্র গুহ (১৯৩৩-২০১৫) দিব্যেন্দু পালিত সম্পর্কে লিখেছিলেন—

> দিব্যেন্দু নিজেকে নিয়ে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকত : কোনও গূঢ় ব্যক্তিগত কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়ার সুবাদেও আমার কাছে কখনও ভেঙেছে ব'লে আমার মনে পড়ে না।[৪১]

সংযমী, মিতভাষী গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত মুখে গূঢ় ব্যক্তিগত সত্যগুলি না-বললেও একটু সতর্কভাবে তাঁর লেখা পড়লেই বুঝতে পারা যায়, কী অমোঘ সত্যের ভাণ্ডার সেগুলি। সেইসব গূঢ় সত্যের মুখোমুখি হলে পাঠককে চমকে যেতে হয়, স্বরূপ-দর্শন করে আঁতকে উঠতে হয়, লজ্জায়, হতাশায় চোখের কোণ আর্দ্র হয়ে ওঠে। 'তিনকড়ির মা ও বোন' (১৩৭৪) গল্পে দেখা যায় দুবেলা গীতা পাঠ করা ধার্মিক প্রকৃতির ইংরেজি জানা শিক্ষিত সংস্কৃতের মাস্টারের স্ত্রী তৃপ্তিবালার করুণ পরিণতি। বিশ বছর সংসার করার পর তার স্বামী যখন মারা যায়, তার পরপরই মান–অপমানের টনটনে বোধযুক্ত তৃপ্তিবালা হয়ে যায় তিনুর মা। অর্থাৎ, এদ্দিন সে একজনের স্ত্রী হিসেবে পরিচিত ছিল, এখন তার দ্বিতীয় ধাপের পরিচয় হয় ছেলে তিনকড়ি ওরফে তিনুর মা হিসেবে। তার একটি মেয়েও আছে, নাম সুধা। কিন্তু সে যত না সুধার মা, তার চেয়ে অনেক বেশি তিনুর মা। কারণ

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বামীর পর সংসারের পরবর্তী কর্তা তার ছেলে তিনকড়ি, মেয়ে সুধা নয়। তিনকড়ি বেকার, সংসারে টাকাকড়ি যা আসে সবটাই সুধা মারফত তবু, সুধা যেহেতু মেয়ে সমাজের নিয়মে সে একদিন পরের বাড়ি চলে যাবে। তখন অল্পবিস্তর যা-ই রোজগার করুক, সেই ছেলের রোজগারের ওপরই তৃপ্তিবালাকে নির্ভর করতে হবে। সংসারের এই ক্লেদাক্ত একচোখোমিকে সে অস্বীকার করতে পারেনি। বরঞ্চ এই স্বার্থপরতাকে মেনে নিয়েই সে মেয়েকে ধমক-ধামক দিয়ে, রাত–দিন গালমন্দ করে একজন যথোপযুক্ত ছেলেধরা বানানোর চেষ্টা করে যায়, আর ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ছেলেকে খাতির-যত্ন করে। স্বামী মারা যাওয়ায় তাদের সুনিশ্চিত রোজগারের পথ বন্ধ হয়েছে। তারপর থেকে প্রখর অপমানবোধসম্পন্ন তৃপ্তিবালা নিজের মেয়েকে লুকিয়ে–চুরিয়ে বাড়িওয়ালার ছেলের ঘরে পাঠানোর মতো অবমাননাকর কাজ করতেও পিছপা হয়নি। তেইশ বছরের যে মেয়েকে পণ্য বানিয়ে সংসার-নির্বাহ করে তৃপ্তিবালা, সংসারে সেই মেয়ের অবস্থান কিন্তু সবচেয়ে নীচু থাকে। মধ্যবিত্তের এই দ্বিচারিতা, চাদরের আড়ালে কুৎসিত লোভ–লালসা, পঙ্কিল জীবনযাত্রা, অভাব-অনটন থেকে মুক্তির পথ হিসেবে হীনতা, ক্লিন্নতার পথ বেছে নেওয়ার নিদারুণ বাস্তবতার ছবি এই গল্পে তুলে ধরেছেন দিব্যেন্দু পালিত। মেয়েদেরকে তিনি বরাবরই তাঁর সাহিত্যে বিশেষ জায়গা দিয়েছেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি সরাসরি জানিয়েছেন, নারী-মন গভীরতা এবং দুর্বোধ্যতার কারণে তাঁর কাছে খানিক বেশি গুরুত্ব পায়। তাঁর অধিকাংশ লেখাই সেই গুরুত্ববাহী। দিব্যেন্দু পালিত তাঁর রচনায় সবল, দুর্বল, সরল, জটিল, দৃঢ়চেতা, পরনির্ভরশীল সব ধরনের মহিলাদের অবস্থান দেখানোর চেষ্টা করে গেছেন। তিনি মহিলা চরিত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ নৈপুণ্য এবং পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এই গল্পেও সমাজের সেইসব গৃহবধূদের একজনকে পাওয়া যায় (তৃপ্তিবালা), যারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের

চাবিকাঠি, যাদের কাজে লাগিয়ে সমাজ তার নিয়ামক শক্তি জারি করে, যারা মেয়ে হয়ে মেয়েদের শত্রুর ভূমিকা পালন করে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের (১৯৫০-২০১৫) *দহন* (২০০১) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত মেয়েদের শারীরিক শুচিতা সম্বন্ধে একটি চমৎকার বক্তব্য রয়েছে—

> —আমাদের মধ্যবিত্তদের এই দোষ। আগেই মেয়েটার সম্মান, শরীর এসব নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে দিই। আরে বাবা, ছেলেরা নিজেদের দরকারে মেয়েদের শরীরের সম্মান বাড়ায়। নিজেদের দরকারেই আবার তাকে বিবস্ত্র করতে ছাড়ে না।...—আমরা ছেলেরা চাই বলে মূল্য (শারীরিক শুচিতার) আছে। আমরা না চাইলেই নেই। চেস্টিটিটা কী জানেন ম্যাডাম? আমার যে ছেলেটা জন্মাচ্ছে সেটা যে আমারই, মানে আমিই যে তার বাবা, সেটা নিশ্চিত করে রাখার একটা অস্ত্র। ও অস্ত্রটা আমরাই চালাই। আমি যে সম্পত্তি বানাব, টাকা জমাব, সেটা একটা কোকিলের ছানা এসে ভোগ করবে এতো হতে পারে না!...নিজের কাছে সৎ থাকাই সতীত্ব। সে ছেলেদের ক্ষেত্রেই হোক বা মেয়েদের ক্ষেত্রে।[৪২]

এই কথাগুলিকে মাথায় রেখেই দিব্যেন্দু পালিতের ‘ধর্ষণের পরে’ (১৪০৫) গল্পটি নিয়ে আলোচনা করা যায়। ছত্রিশ বছর বয়সি জয়িতা এই গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে। সে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতার, ফর্সা রঙ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক যুবতী। তার স্বামী, বছর চুয়াল্লিশের শোভন সওদাগরি অফিসে একটি মাঝারি মাপের চাকুরিরত কর্মচারী। তাকে সবাই ‘বিবেকবান’ পুরুষ হিসেবেই চেনে। সৎভাবে সমাজ-সেবা করার জন্য সে পার্টির লোকাল কমিটির সঙ্গে যুক্ত, তবে সে রাজনৈতিক কেরিয়ার নিয়ে কোনও উচ্চাশা পোষণ করে না। একটি দশ বছরের ছেলে ও একটি সাত বছরের মেয়ের মা-বাবা তারা। একদিন রাতে বাড়ি ফেরার পথে আকস্মিকভাবে তাদের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। কিছু দুষ্কৃতকারীর দল শোভনকে আহত করে এবং জয়িতাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে

যায়। শোভন পুলিশে রিপোর্ট করে। ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার তিনদিন পর সকালে সোনারপুরের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে জয়িতাকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে গ্রেফতার হওয়া দুজন দুষ্কৃতী ছাড়াও আরও দুজন তাকে ধর্ষণ করে। এই নৃশংস ধর্ষণের ঘটনার পর কী কী ঘটে, সমাজ জয়িতাকে কীভাবে ফিরিয়ে নেয়, আদৌ ফিরিয়ে নিতে পারে কিনা, জয়িতার শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী, সন্তানেরা জয়িতাকে নিয়ে স্বাভাবিক হতে পারে কিনা, গণ-ধর্ষণের পর সমাজ তাকে কীভাবে গ্রহণ করে, আদৌ করে কিনা সেটা নিয়েই গল্প। বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং বস্তুবাদী, ভীতু, অসহায়, স্বার্থপর সমাজ যাকে জায়গা দিতে পারে না তাকে সমাজ-সম্ভূত বৈবাহিক প্রতিষ্ঠান জায়গা দেবে কী করে! জয়িতার শ্বশুর-শাশুড়ি চিত্তরঞ্জন এবং রেবা অন্তঃকরণ থেকে কামনা করে গেছেন 'পাঁচ পুরুষের এঁঠো' জয়িতা যেন আর তাদের সংসারে না ফেরে, সে যেন অত্যাচারের দরুন মারা যায় বা লজ্জায় গলায় দড়ি দেয়। অসুস্থতার কারণে বা অন্য যেকোনো দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা আত্মীয়-পরিজনদের দুঃখিত করে, সত্যকারের না হোক দেখানো সহানুভূতির আবেগে আপ্লুত করে। কিন্তু ধর্ষণজনিত দুর্ঘটনা আত্মীয়, পাড়াপড়শি, গোটা সমাজের কাছে একটা বিশ্রী কৌতূহলের সঞ্চার করে। জয়িতার পরিবার একজন ধর্ষিতার পরিবর্তে লক্ষজনের সমাজকেই বেছে নেয়। 'বিবেকবান' শোভন প্রাথমিকভাবে জয়িতার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত সে নিজের ভেতরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত পিতৃতান্ত্রিক শিকড়কে উপড়ে ফেলতে পারেনি। সেও শারীরিক শুচিতা-পবিত্রতার অশুচি ধারণাগুলির দ্বারা গ্রস্ত হয়ে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে কলুষিত করে ফেলে। শোভনের সর্বজনবিদিত সততা-নৈতিকতা তার নিজের স্ত্রীর ক্ষেত্রে সঠিকভাবে কাজ করেনি। শোভন-জয়িতার দাম্পত্যে বিচ্ছিন্নতার সূচনা কেবল এই দুর্ঘটনাটির কারণে নয়। পুরুষশাসিত সমাজের নিষ্ঠুর, অনৈতিক,

অশোভনীয়, একপেশে ধ্যান-ধারণাগুলির কাছে শেষপর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে শোভন। তার সৎ এবং বিবেকবান হয়ে ওঠার সচেতন প্রয়াসকে গ্রাস করে ফেলে সামাজিক বিশ্বাসের আগ্রাসন—

> গা তারও গুলোচ্ছে, আজ নয়, আগে থেকেই। কিন্তু, সে জয়িতার স্বামী—এ সব কথা ওইভাবে বলতে পারে না। রেবার কথাগুলোর মানে বুঝে তখন একটি কথাই ভেবেছিল শোভন, জয়িতাকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য কেন এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে! নিজের জন্যে? ছেলেমেয়েদের জন্যে? না কি নিজের সম্পর্কে তার যা ধারণা সেটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে? এর একটাও কিংবা সব কারণগুলোই যদি সত্যি হয়, তাহলে কাল রাতে আলমারি খুলে জয়িতার কাপড়-জামা বের করতে করতে কেন সে ভেবেছিল, যারা ওকে ধর্ষণ করেছিল তাদের কারও যে এডস বা আরও কোনও সংক্রামক যৌনরোগ নেই তা সে জানছে কী করে! নিজেকে বাঁচানোর জন্যে কাল থেকে কি সে আলাদা বিছানায় শোবে? কিংবা, যে-জয়িতাকে সে ভালবাসত বলে জানত—অপহৃত হবার পরে এবং গণধর্ষণের খবর পাবার আগে যার জন্যে সে কেঁদেছিল—এখন আর তার জন্যে কোনও টান অনুভব করছে না কেন?
>
> প্রশ্নগুলো নিজেকেই। কিন্তু, উত্তর ধরা দিচ্ছে না এখনও। বরং কেমন যেন হাত-পা ছাড়া লাগছে। কিছুটা অসহ্যও। এমনও মনে হচ্ছে, জীবিতের চেয়ে সে যদি মৃত জয়িতাকে আনতে যেত, সেটা অনেক বেশি সহনীয় হত।[৪৩]

সমাজের কাছে জয়িতারা নির্যাতিত বা অত্যাচারিত নয়, তারা শুধুই 'নষ্ট', 'বহুভুক্ত', কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের মানুষ হিসেবে নয়, বস্তুসামগ্রী হিসেবে দেখে। *দহন* উপন্যাসে এইরকমই এক দম্পতিকে দেখতে পাওয়া যায়। রমিতা আর পলাশ, তারা সদ্য বিবাহিত। ফুরফুরে মেজাজে কেনাকাটা করতে বেরিয়ে রমিতাকে এক দল ছেলে আক্রমণ করে। পলাশকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে রমিতাকে তারা গাড়িতে তুলতে যাচ্ছিল সেই সময় শ্রবণা সরকার নামক একজন অত্যন্ত সাহসী মেয়ে শুধুমাত্র

ব্যাগ দিয়ে দুষ্কৃতীদের নাস্তানাবুদ করে। রমিতার শ্লীলতাহানি হয় বটে তবে সে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পায়। তা সত্ত্বেও তার জীবন আর কোনোদিন স্বাভাবিক হয়নি। ‘ধর্ষণের পরে’ গল্পে জয়িতার শ্বশুর-শাশড়ি যেমন শোভনের থানা-পুলিশ করা নিয়ে প্রবল আপত্তি করেছিল, ঠিক তেমনি শ্রবণা কেন রমিতাকে নিয়ে পুলিশে গেল, কেন রমিতা নিজের ছেঁড়া ব্লাউজ ছেড়ে থানার বড়ো বাবুর মেয়ের ব্লাউজ গায়ে চড়াল, তা নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনেদের আপত্তির অবধি ছিল না। থানা-পুলিশ মানেই কোর্ট-কাছারি, লোক-জানাজানি আর তাতেই নাকি তাদের শ্বশুরবাড়ির দীর্ঘদিন ধরে লালিত বনেদিয়ানা, মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অর্থাৎ, দুষ্কৃতীদের শাস্তি পাওয়া নিয়ে সমাজ বা সমাজের প্রতিনিধিদের কোনও মাথাব্যথা নেই, সমাজের আপত্তি এরকম কদর্য ঘটনা চাউর হওয়া নিয়ে। এক্ষেত্রে সমাজ নির্মমভাবে নির্যাতিত মেয়েটিকে সমাজ-দেহ থেকে বিয়োগ করবে কিন্তু সমাজের অভিভাবক পুরুষদের আঁচলের তলায় নিরাপদ আশ্রয় দেবে। ২০১৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ‘পিঙ্ক’ নামের একটি হিন্দি ছবি মুক্তি পায়। তাতেও দেখানো হয়েছে মেয়েটির পোশাক, তার কুমারীত্ব আদৌ বহাল আছে কি নেই, সে মাদকাসক্ত ছিল কিনা, তা নিয়ে সমাজ যতখানি চিন্তিত, সেই তুলনায় দুষ্কৃতীদের দুষ্কর্ম নিয়ে মোটেই ভাবিত নয়। সিনেমায় অবশ্য শেষপর্যন্ত মেয়েটি সুবিচার পায় কিন্তু আলোচ্য গল্পে জয়িতা সুবিচার পেয়েছিল কিনা তা জানতে পারা যায় না। তবে এটুকু বোঝা যায়, পুরুষশাসিত সমাজ জয়িতাদের জীবিত অবস্থায় আগের মতো করে কোনোমতেই ফিরিয়ে নেবে না। শারীরিক ধর্ষণের ঘটনার পর সমাজ তাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না, ক্রমাগত মানসিকভাবে ধর্ষণ করে যাবে। ধর্ষিতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় মরে গিয়ে বেঁচে যায় অথবা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ক্রমাগত মানসিক নির্যাতন করে তিলে-তিলে তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

নগর-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, এখনও ঘটে চলেছে। অথচ নগরবাসীরা আদৌ সভ্যতার পথে অগ্রগামী হচ্ছে নাকি অসভ্য-অভব্য, কলুষিত চিন্তা-চেতনার পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বিনয় ঘোষ মহানগর এবং নাগরিকদের চরিত্র লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন—

> মহানগর যেন মহাসমুদ্র। বাইরের নদনদী যেমন শতসহস্র ধারায় প্রবাহিত হয়ে মহাসমুদ্রের বুকে মিলিত হয়, তেমনি বাইরের গ্রাম ও গ্রাম্য সমাজ, বাহির-বিশ্বের লোকজন, তাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভালোমন্দ আদর্শ সব এসে মিলিত হয় মহানগরের বুকে।...নগরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, নগরের সংস্কৃতিসম্ভার, নগরের সজীবতা সক্রিয়তা ধীরে ধীরে নগরের উপকণ্ঠে, পারিপার্শ্বে, সারা দেশে প্রভাব বিস্তার করে। ঠিক তেমনি নগরের অর্থনৈতিক অবনতি ও অপচয়, নগরের দুর্নীতি স্থবিরতা ও নিষ্ক্রিয়তা, সারা সমাজদেহকে বিষাক্ত করে তোলে। বড়ো বড়ো শান-বাঁধানো রাজপথ ও অ্যাশফেল্টের অ্যাভিনিউয়ের উপর দিয়ে যান্ত্রিক যানবাহনের মতন তীব্রবেগে মহানগরের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত যেমন নতুন ভাবধারা, নতুন আদর্শ, নতুন রুচি ও নীতি চলাফেরা করে, বিদ্যুদ্‌বেগে যেমন সকলের মনে সেই ভাবধারা সংক্রমিত হয়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে, সকল রকমের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে মন্থন করে তোলে, তেমনি দুর্নীতি ও ব্যভিচারও মহানগরের বুকে দ্রুতগতিতে ব্যাপক ভয়াল মূর্তি ধারণ করে। সমাজদেহের শিরা-উপশিরা জড়িয়ে থাকে মহানগরে। মানুষ থাকে মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে, অথচ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও সম্পর্কশূন্য। মহানগরের রাজপথে, ইট-পাথর-লোহায় যেমন মানুষের মহান আদর্শের, জীবনের মহান সত্যের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, তেমনি মহানগরের কদর্যতা তুচ্ছতা ব্যস্ততা হীনতা নীচতা দীনতা সব যেন ইট-পাথরে-লোহার গায়ে একেবারে খোদাই করা থাকে, সহজে মলিয়ে যায় না। মহানগর তাই নিঃসন্দেহে মানুষের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলেও আজ তার উল্লেখযোগ্য অপকীর্তিও বটে।[৪৪]

এই ‘শ্রেষ্ঠ-অপকীর্তির’ মাঝে দিনাতিপাত করা মানুষগুলোর জীবন-যাত্রার নির্মম সত্য তুলে ধরেছেন দিব্যেন্দু পালিত। গল্প মানে শুধুই বানানো কিছু গাঁজাখুরি, মনোরঞ্জনকারী সংরূপ নয়, গল্প হতে পারে জীবনের অমোঘ সত্য-দর্শনের, নিজেদের স্বরূপ-দর্শনের নিখুঁত কাহিনি। সেই ভাবনার দায়ভার বহন করেছেন গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত। কলকাতার নাগরিক হিসেবে তিনি এই নগরের এবং নাগরিকদের অখণ্ড সত্যকে সাহিত্যে পেশ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১। দিব্যেন্দু পালিত, 'মর্মকথা', *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), জানুয়ারি—মার্চ ২০০৩, গল্‌ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ১২২

২। বিনয় ঘোষ, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* দীপ প্রকাশন, ২০৯-এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম দীপ সংস্করণ জুন ২০২০, পৃ. ২

৩। সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা ৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ২০-৩৫

৪। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭-এ কলেজস্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৩, পৃ. ১১

৫। বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০০৬, পরিমার্জিত দীপ সংস্করণ আগস্ট ২০২০, পৃ. ৬৩

৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আমার মন', *কমলাকান্তের দপ্তর,* অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী (সম্পা.), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ১৯

৭। তদেব, পৃ. ২০-২১

৮। তদেব, পৃ. ২১

৯। বিনয় ঘোষ, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* দীপ প্রকাশন, ২০৯-এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম দীপ সংস্করণ জুন ২০২০, পৃ. ১৪।

১০। দিব্যেন্দু পালিত, 'ছন্দ-পতন', *গল্পসমগ্র ১*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ১৯।

১১। দিব্যেন্দু পালিত, 'মায়াতরু', *গল্পসমগ্র ১*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ৩৭।

১২। তদেব, পৃ. ৩৪

১৩। দিব্যেন্দু পালিত, 'কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান', সাগরময় ঘোষ (সম্পা.), *দেশ সাহিত্য সংখ্যা*, ১৩৮৩, এবিপি প্রাঃ লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ২০০

১৪। দিব্যেন্দু পালিত, 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি', *গল্পসমগ্র ১*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ৫১

১৫। তদেব, পৃ. ৫৬

১৬। তদেব, পৃ. ৫৭

১৭। দিব্যেন্দু পালিত, 'পলাতকা', *গল্পসমগ্র ১*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ১০৪

১৮। দিব্যেন্দু পালিত, 'অপমান', *গল্পসমগ্র ১*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ১৮১

১৯। দিব্যেন্দু পালিত, 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ', *গল্পসমগ্র ১*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ১৮৭

২০। তদেব, পৃ. ১৮২

২১। তদেব, পৃ. ১৮৩

২২। তদেব, পৃ. ১৮৬

২৩। দিব্যেন্দু পালিত, 'চিঠি', *গল্পসমগ্র ১*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ২১২

২৪। সমরেশ বসু, *বিবর*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৬, পৃ. ১৪

২৫। দিব্যেন্দু পালিত, 'চশমা', *গল্পসমগ্র ১*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ৩০১

২৬। দিব্যেন্দু পালিত, 'চাবি', *গল্পসমগ্র ১*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ৩২৮

২৭। দিব্যেন্দু পালিত, 'টিভি', *গল্পসমগ্র ১*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ৪০৮

২৮। বিনয় ঘোষ, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ*, দীপ প্রকাশন, ২০৯-এ বিধান সরণি কলকাতা ৭০০০০৬। প্রথম দীপ সংস্করণ জুন ২০২০, পৃ. ১৫২

২৯। দিব্যেন্দু পালিত, ‘সিঁড়ি’, *গল্পসমগ্র* ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ. ৩৬

৩০। তদেব, পৃ. ৩৬

৩১। দিব্যেন্দু পালিত, ‘জাতীয় পতাকা’, *গল্পসমগ্র* ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ. ২০৬

৩২। তদেব, পৃ. ২০৯

৩৩। দিব্যেন্দু পালিত, ‘লোকসভা-বিধানসভা’, *গল্পসমগ্র* ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ. ৪০০।

৩৪। দিব্যেন্দু পালিত, ‘ওষুধ’, *গল্পসমগ্র* ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯ পৃ. ৩৯০।

৩৫। দিব্যেন্দু পালিত, ‘পেট’, *গল্পসমগ্র* ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ পৃ. ৩৪২।

৩৬। শ্রাবণী পাল, ‘নগর দর্পণে আমাদেরই মুখ: দিব্যেন্দু পালিতের ছোটো গল্প’, *প্রিয়দর্শিনী*, দিব্যেন্দু পালিত সংখ্যা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৩, পৃ. ১৫৭।

৩৭। দিব্যেন্দু পালিত, ‘মাছ’, *গল্প সমগ্র* ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭, পৃ. ৪৭

৩৮। Lewis Mumford, *The Culture of Cities*, New York: Harcourt, Brace and Company, 1938, P. 258

৩৯। দিব্যেন্দু পালিত, 'অন্ধকার পেরিয়ে', *গল্প সমগ্র ১*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ৩৩

৪০। দিব্যেন্দু পালিত, 'কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান', সাগরময় ঘোষ (সম্পা.), *দেশ সাহিত্য সংখ্যা*, ১৩৮৩, এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ২০০

৪১। ভূমেন্দ্র গুহ, 'দিব্যেন্দু', *প্রিয়দর্শিনী*, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), জানুয়ারি – মার্চ ২০০৩, গল্ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ৩৭

৪২। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, *দহন*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৮, পৃ. ৬৬

৪৩। দিব্যেন্দু পালিত, 'ধর্ষণের পরে', *গল্পসমগ্র ২*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ. ৫৩০

৪৪। বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, দীপ প্রকাশন, ২০৯-এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬, পরিমার্জিত দীপ সংস্করণ আগস্ট ২০২০, পৃ. ২-৩

(পঞ্চম অধ্যায়)

নাগরিক নিঃসঙ্গতার কণ্ঠস্বর

নগর জীবনের বাহ্যিক এবং অন্তর্গত বিবিধ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যের ভাষা। কেবল বিষয়ের দিক থেকে নয়, ভাষাগত দিক থেকেও তাঁর কথাসাহিত্যের চলন রীতিমতো নাগরিক। নগর জীবনের বহিরাঙ্গিক নির্মেদ রূঢ়তা, কাঠিন্য, তীক্ষ্ণতা, ধারালো অবস্থান বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর কলমে। বলা বাহুল্য, নগর বলতে বিশেষভাবে কলকাতা তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের একটি সাধারণ চরিত্র। তিলোত্তমার মোহময় রূপ এবং জটিল মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান সর্বাঙ্গীণভাবে ধরা দিয়েছে দিব্যেন্দু পালিতের লেখনীতে। মুখ্যত বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছরের কলকাতার সামাজিক রূপ এবং কলকাতার সামাজিক প্রাণীগুলির জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি এঁকেছেন লেখক। রাজনৈতিক ঘটনা পরম্পরার প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গ কমই এসেছে তাঁর উপন্যাসে। *আমরা* (১৯৭৩), *উড়োচিঠি* (১৯৭৮), *সহযোদ্ধা* (১৯৮৪), *ঢেউ* (১৯৮৭), *গৃহবন্দী* (১৯৯১)-এর মতো কিছু উপন্যাসে লেখক সরাসরি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর লেখক-মন যে সবসময়ই রাজনীতির জাঁতাকলে পড়া সমাজ-মনের জটিল অসহায়তাকে তুলে ধরতে ব্যগ্র সে কথা পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন। এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কেন্দ্রে অবস্থান করছে একাকিত্ব এবং তজ্জনিত ব্যর্থতার করুণ ইতিহাস। সেই ইতিহাসের সযত্ন উপস্থিতি রয়েছে দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যের বাঁকে বাঁকে। কোন কোন বিশেষত্ব নিয়ে নাগরিক

একাকিত্ব তাঁর সাহিত্যে বিদ্যমান, সেটা উদাহরণসহ তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

কলকাতা দিব্যেন্দু পালিতের অধিকাংশ উপন্যাসের মেরুদণ্ড নির্মাণ করেছে। শহর বলতে দিল্লি, মুম্বাই বা বেঙ্গালুরু নয়, বা বিদেশের অন্য কোনও শহর নয়, চির পরিচিত এই কলকাতা শহরই ফিরে ফিরে আসে তাঁর আখ্যানে। সুতরাং বাংলা ভাষা এবং কলকাতাকেন্দ্রিক সংস্কৃতির নাগরিক চর্চাই দিব্যেন্দু পালিতের রচনার প্রাণকেন্দ্র। গল্পের ঘনঘটার বিপুল আয়োজন করে পাঠক মজানো লেখা তিনি লিখতেন না। স্বভাবজ অন্তর্মুখিনতা তাঁকে বারবার টেনে নিয়ে গেছে নিত্তনৈমিত্তিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ, একঘেয়ে ঘটনাপ্রবাহকে নিবিড়ভাবে কাটাছেঁড়া করার দিকে। সেই কাজ করতে গিয়ে তিনি পৌঁছে গেছেন মানুষের মনের নিবিড়তম কোণায়, যেখানে একক মানুষের একাকিত্বের আঁধার-যাপন। এই প্রসঙ্গে দিব্যেন্দু পালিতের স্ত্রী শ্রীমতি কল্যাণী পালিত তাঁর অন্দরমহল-প্রেমী স্বামী সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলি পোষণ করেছেন সেই কথা স্মরণ করা যেতে পারে—

> দিব্যেন্দুর সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে একদম বহির্মুখী নয়। খুবই ইন্ট্রোভার্ট। এটা আমার খুব ভালো লাগে। তাছাড়া খুবই অনেস্ট। কখনও কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে দেখিনি। আর খুব পাংচুয়াল। যাকে যে সময় দেয় তার নড়চড় করে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজটুকু করার চেষ্টা করে।[১]

দিব্যেন্দু পালিতের গল্প, উপন্যাসের প্রতিটি গলি-ঘুঁজি পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী-কথিত এই অন্তর্মুখী স্বভাবটুকুর সাক্ষ্য বহন করে। সংসারের কিছু চিরন্তন সত্য, মানুষের অনুভূতিপ্রবণতা, মানসিক অশান্তি, দ্বন্দ্ব ও তজ্জনিত সুতীব্র দহন এবং শেষপর্যন্ত কখনও প্রবৃত্তির কাছে, কখনও আবেগের কাছে মানুষের করুণ পরাজয়ের গ্লানিরঞ্জিত রক্তাক্ত মনের অলিগলি

এবং একাকিত্বের অসহায়তার পথে ভ্রমণ করেছেন লেখক। সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে দিব্যেন্দু পালিত বলেছিলেন—

> মনে পড়ে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বুদ্ধদেব বসু একবার কোনও এক প্রসঙ্গে আমায় বলেছিলেন যে, কল্পনাশক্তি, কাহিনিবয়নের ক্ষমতা, চরিত্র – নির্মাণ ও সংলাপ – রচনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে যে – কেউ একটু চেষ্টা করলেই লেখক হতে পারেন। তবে 'সাহিত্যিক' হতে গেলে দ্রষ্টা হতে হয়। কথাগুলি সেই থেকে আমার মননে গ্রথিত।[২]

বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত দিব্যেন্দু পালিত কোনোদিনই লেখক হতে চাননি, চেয়েছিলেন 'সাহিত্যিক' হতে। তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে রয়েছে সেই সুরে ধ্বনিত নিবিড় পর্যবেক্ষণ, মর্মস্থল থেকে তুলে আনা গভীর দর্শন। কলকাতা এবং তার নিভৃতচারী মননের জটিল ভাষা যে প্রতাপ নিয়ে দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যের ভাষায় উঠে এসেছে, তাতে তাঁর সাহিত্যকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত সময়কালের কলকাতা শহরের মনস্তাত্ত্বিক দলিল হিসেবে পড়া যেতেই পারে। নাগরিক একাকিত্বকে চিহ্নিত করবার জন্য দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যের মূলত ১৬ টি দিক নিয়ে আলোচনা করা জরুরি—

- ভাবাবেগের সূক্ষ্মতা এবং মানসিক দ্বন্দ্বের অন্তর্লীন বর্ণনা।
- স্বগত চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ও স্বগতোক্তির ব্যবহার।
- শব্দ এবং নৈঃশব্দ্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার।
- বৃষ্টির অনুষঙ্গের পুনঃপ্রয়োগ।
- একাকিত্ব-প্রকাশক প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা।
- মুহুর্মুহু স্মৃতিবিধুরতার প্রকাশ।
- প্রসাধনহীন অন্তর্গত আলাপচারিতা এবং দীর্ঘ সংলাপের উপস্থিতি।

- পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা।
- গভীর আত্মানুভূতি এবং আত্মানুসন্ধান।
- পুনরাবৃত্তি।
- শূন্যতাবোধের প্রাধান্য।
- নির্ভার, নির্মেদ নাগরিক ভাষার ব্যবহার (প্রয়োজনানুযায়ী অনানুষ্ঠানিক ভাষার ব্যবহার)।
- নগরকেন্দ্রিক মৌখিক মিশ্র ভাষার ব্যবহার (code-switching)
- কলকাতার হৃদয়াবেগ তুলে ধরার সূত্রে সরাসরি কলকাতা শহরের অলিগলি, দ্রষ্টব্য স্থান, হোটেল, বাড়ি ইত্যাদির নামোল্লেখ।
- ঋতুপরিবর্তন অনুযায়ী কলকাতার ভাবোচ্ছ্বাসের গতি-প্রকৃতির পরিবর্তনের বিবিধ প্রকাশ।
- কলকাতা শহরের বহিরাঙ্গিক উৎসব-অনুষ্ঠান এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পরিবর্তে অন্তর্মুখীনতার ব্যাপ্তি।

১

দিব্যেন্দু পালিতের লেখায় বিষয় বৈচিত্র্য নেহাতই কম। কেবলমাত্র নগর জীবনের মধ্যেই বিষয়ের আনাগোনা বলে নয়, ঘটনা-প্রবাহও মন্থর। ঘটনাবহুলতার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরিত্রের মনের গভীর থেকে গভীরতম জায়গায় প্রবেশ করে তাদের চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, ভাবাবেগের সূক্ষ্মতা এবং মানসিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ করাই তাঁর লেখার ধর্ম। উপন্যাস এবং গল্পের উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করা যায়। যেমন, *সম্পর্ক* (১৯৭২) উপন্যাসে দেখা যায় কলকাতা শহরে স্টারলেট হিউম নামের এক

সুপ্রতিষ্ঠিত ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রামতনু সোম ত্রিশ বছর ধরে একটা শান্ত, সুস্থির দাম্পত্য কাটিয়ে আসার পর পঞ্চান্ন বছর বয়সে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে আচমকা নীরা নামের এক যুবতীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন। সেই অনাকাঙ্ক্ষিত আকর্ষণের এমনিই তীব্রতা যে তার কাছে হার মানে রামতনুর এতদিনকার কর্মদক্ষতা, স্থিতিশীল মন, সংসারে চূড়ান্ত দায়িত্ববান হওয়ার সুখ্যাতি। রামতনু সামাজিক নিয়মের ছক ভেঙে অকালে প্রেমে পড়েছেন অথবা এক যুবতীর প্রতি আকর্ষণবোধ করেছেন, এই ঘটনাকে ঘিরে পরিবার-পরিজন, রামতনুর পারিপার্শ্বিক মানুষজনের ক্ষোভ-যন্ত্রণা, নীরার মানসিক অভিব্যক্তি এবং সর্বোপরি আকর্ষণ ও দায়িত্ববোধের মাঝে পড়ে ঘরে-বাইরে রামতনুর অসহায়তা, দ্বন্দ্ব, আকস্মিক অস্থিরতা ইত্যাদির প্রকাশ এগিয়ে নিয়ে গেছে উপন্যাসকে। এখানে চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের বাদানুবাদ, ঘটনার ঘনঘটা খুবই কম, পরিবর্তে এক-একটি চরিত্রের নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার অবকাশ বেশি। কেবল নীরার প্রতি দুর্বলতাকে ঘিরে নয়, রামতনু পঞ্চান্ন বছর বয়সে এসে যখন নিজের সুদীর্ঘ কর্মজীবন এবং দুর্দান্ত সাফল্যের কথা ভাবেন, তখন সেই সাফল্যের আলোকোজ্জ্বল পরিবেশনার পশ্চাতে যে আত্মক্ষয় এবং দুর্নীতির সাধনা রয়েছে, সেই সাধনালব্ধ অন্ধকারে ছেয়ে যায় তাঁর অন্তর। ব্যবসায়িক ‘পলিসি’কে মান্যতা দিয়ে রামতনুকে মেনে নিতে হয় তিনটি কারখানা বন্ধ হওয়ার ঘটনা, আড়াই হাজার কর্মীর নিরন্ন হওয়ার বন্দোবস্ত। জীবিকাজনিত এই মানসিক ক্লেদ এবং অপরাধবোধ অন্য কোনও মানুষের কাছে নয়, নিজেই নিজের বিবেকের সামনে তুলে ধরেছেন রামতনু—

> আর, সব জেনেশুনেও, উদাসীন সঙ্গমে বেশ্যার মতো নিজেকে ব্যাপৃত রাখবেন রামতনু। সম্ভবত আজ, এই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে গেল তাঁর কাজ। প্রেস হ্যান্ডআউট তৈরি করা, যতো দূর সম্ভব ভুল সংবাদ দিয়ে মধুর জনসংযোগ গড়ে তোলা; সাংবাদিকদের তুষ্ট করার জন্যে ডেকে

আনা মদ্যপানের আসরে! এই সব, প্রায় সবই। মাঝে মাঝেই মনে হয় কী অসম্ভব ভুল পথে চালিত করছেন নিজের বিবেক ও নীতিকে—কথাগুলো একই থাকছে, কিন্তু অর্থ পাল্‌টে যাচ্ছে প্রত্যেকটি কথারই! এই কি জনসংযোগ![৩]

নীরাকে ঘিরে রামতনুর গোপন প্রণয় যখন উন্মুক্ত হয়ে পড়ে সর্বত্র, এমনকি স্ত্রী-পুত্রের কাছেও, তখন তাঁর মধ্যে তৈরি হয় অনুভূতির আশ্চর্য বৈচিত্র্য। এটা দিব্যেন্দু পালিতের লেখনীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঘটনার বৈচিত্র্য না থাকলেও রয়েছে অনুভূতির বৈচিত্র্য। বিশেষত, অব্যক্ত, অঘোষিত, গূঢ় অথচ প্রচণ্ড শক্তিশালী যেসব অনুভূতির কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করা যায় না, যা ভেতর থেকে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে অথচ কখনোই উপরের স্তরে উঠে আসে না, সেইসব গাঢ়, ভারি অনুভূতির বৈচিত্র্যময় রূপের বিকাশ ঘটে দিব্যেন্দু পালিতের রচনায়। অন্তরের ক্লেদের ওপর দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রলেপ দিয়ে রামতনু এতদিন ধরে নিজের ব্যক্তিত্বের যে বাহ্যিক প্রতিমূর্তি পরিপাটিভাবে গড়ে তুলেছিলেন সর্বজনসমক্ষে, আদিম রিপুর চোরাস্রোতের টানে সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রকাশিত হয় তাঁর অন্তরের লালসা এবং দারিদ্র। আকস্মিকভাবে ধরা পড়ে যাওয়ার ফলে তার মধ্যে দুরকম সত্তার সংঘাত বাধে। একদিকে তিনি হয়ে ওঠেন শিশুর মতো খামখেয়ালি এবং পবিত্রতা অর্জনের বৃথা চেষ্টায় মগ্ন একজন প্রৌঢ়। আরেকদিকে, হঠাৎ অসামাজিক গোপনীয়তা প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় লজ্জায়, আক্রোশে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। বিচিত্র এই অনুভূতি-মালার মাঝে পড়ে তার মানসিক শূন্যতা একাকিত্বের অন্ধকারে প্রবাহিত হয়—

শরীর থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে দুই পৃথক অস্তিত্বকে একই সঙ্গে সক্রিয় করে তুললেন রামতনু। আলোছায়ায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় ক্ষুর টানতে টানতে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করলেন হঠাৎ, মুহূর্তের অপেক্ষার পর দেখলেন সরু কালো সুতোর মতো একটার পর একটা

রক্তের দাগ ফুটে উঠছে। ক্ষুরটা হাতে রেখে অনেকক্ষণ সেই রক্তের প্রতি লক্ষ রাখলেন রামতনু। বিদ্যুচ্চমকের মতো হঠাৎ একটি চিন্তা উঁকি দিল মাথায় : ভূমিকা প্রস্তুত, এই অপমানের পর যদি আত্মহত্যা করি, ক্ষুরটা চেপে ধরি কণ্ঠনালীর ওপর আর একটু শক্তি দিয়ে, তাহলে কেমন হয়! চমৎকার; যেন প্রকৃতই একটা পথ খুঁজে পেয়েছেন—প্রত্যূষ সমাগমে নিরুপদ্রব বাথরুমে আত্মহত্যা—আঃ! রামতনুর ঠোঁটের কোণে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটল।

এ ভাবনাও সাময়িক; চেতনায় ফিরতে সময় লাগল না। এখন আত্মহনন, আত্মহত্যার অর্থ ওদের ধারণাকে সত্য স্বীকৃতি দেওয়া। ওরা দুঃখিত হয়তো হবে, আকস্মিক বিপর্যয়ে হয়ে পড়বে হতবাক, সঙ্গে সঙ্গে রামতনুর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কেও আর সন্দেহ থাকবে না। তা হয় না, হতে পারে না।[৪]

দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যের পাতায় পাতায় রামতনুর মতো নিঃসঙ্গ মানুষদের সমাবেশ। নাগরিক কোলাহলের মাঝে দাঁড়িয়েও তারা একা, তারা নিজেদের সঙ্গে নিজেরা কথা বলতে অভ্যস্ত। চরিত্রেরা নিজেদের সঙ্গে নিজেরা সময় কাটাচ্ছে দীর্ঘক্ষণ, এটি তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, প্রেমিক-প্রেমিকা থাকা সত্ত্বেও তারা নানা কারণে নিজেদের প্রাণ-মন মেলে ধরতে পারে না একে অপরের সামনে। কোনও এক অদৃশ্য বাধা, সংকোচ তাদের মধ্যেকার মানসিক দূরত্বকে বহাল রাখে। তাই তারা নিয়ত নিজেদের সঙ্গে নিজেরা দীর্ঘক্ষণ সময় কাটায়, নিজেদের বিবেকের কাছে নিজেরাই সোচ্চার হয়ে ওঠে। উপন্যাসের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে থাকে সেইসব স্বগতোক্তি এবং অন্তর্বর্তী চিন্তা-ভাবনার দীর্ঘ প্রকাশ। উদাহরণস্বরূপ *আমরা* (১৯৭৩) উপন্যাসের প্রিয়নাথ মজুমদার আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে যেসব কথা বলেছে, সেসব কথা তুলে ধরা যায়—

আগে অর্থে পাঁচ-ছ' বছর আগে, তনুশ্রী আসবার আগে, এ নিয়ে খুব আক্ষেপ হতো মাঝে মাঝে : শালা কী একটা চাকরিই না করছি! মারো গোলি! একদিন ছেড়ে দেবো! ইত্যাদি ভাবতে

ভাবতে ছুটির কিছু আগে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম বহু দূর; কিন্তু কার্জন পার্কের ভিতর দিয়ে বাঁয়ে মোহন বাগানের তাঁবু আর ডাইনে ইডেন গার্ডেন্স পেরিয়ে গঙ্গার দিকে নয়; জাহাজের বাঁশি, নদীর জল বা সূর্যাস্তের লাল সম্পর্কে কোনো দিনই কোনো দুর্বলতা নেই আমার। হাঁটতাম সোজা রাস্তায়, চলমান ভিড়ের গায়ে গায়ে, ঘাম ও বেঁচে থাকার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে। নিজেকে বলতাম, প্রিয়নাথ, নামটার মতোই তুই একটা বর্ন বেঙ্গলি রয়ে গেলি, যাকে বলে জীবনটা নিয়ে হেগে-মুতে একাকার হয়ে থাকা, তোর কি কিছু হবে? ধর, আজ না হোক, দু' বছর বা পাঁচ বছর পরে, ঊনচল্লিশ, চল্লিশে? ওইটাই তো পুরুষমানুষের শেষ এফিসিয়েন্সি বার! নাকি চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত টাকি মহকুমার স্বর্গত শিবনাথ মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র ও অধুনা কলকাতার ভবানীপুর নিবাসী শ্রী প্রিয়নাথ মজুমদার হয়েই থাকবি? এই সব প্রশ্নে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে আমার খুব পেচ্ছাপ পেত ও খেয়াল হতো অনেকটা হেঁটেছি; তলপেট সিরসির করত, শরীর গরগর করত রাগে। রাগটা বিশেষত আশেপাশে তাকিয়ে। প্রিয়নাথ, নিশ্চিন্তে পেচ্ছাপ করার মতো একটা নিরাপদ জায়গা পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছিস না! এতো বড়ো কলকাতা শহর বলে কথা, তুই একটা চিজ্ মাইরি! সঙ্গে সঙ্গে হাসি পেত।[৫]

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই স্বগত চিন্তা-চেতনা বা স্বগতোক্তির মধ্যে রাগ, ক্ষোভ, হতাশা, বিরক্তি ইত্যাদি ক্লেদাক্ত নেতিবাচক অনুভূতি প্রকাশ পায়। কারণ এই ব্যস্ত শহরের বুকে আনন্দ-উল্লাসের ভাগ-বাঁটোয়ারা করার মতো লোক যত সহজে মেলে, ক্ষোভ-দুঃখ-হতাশা বিনিময়ের লোক তত সহজে মেলে না। এ শহরের বহিরাঙ্গিক সাজ যতটা আলোকোজ্জ্বল রূপের ছটা মাখা তিলোত্তমার মত, অন্তর ততটাই অন্ধকার, নিঃসঙ্গ। এ শহরের প্রতিটা মানুষ তীব্র কলকল্লোলের মাঝে থেকেও নিরালা, নিঃঝুম হতাশায় দীর্ণ অন্তরের অধিকারী। বাইরের চিৎকার, ঝংকার এতোটাই তীব্র যে সেখানে ব্যক্তি মানুষের মৃদু হতাশা, হাহাকার বিবিধ শব্দের ভিড়ে হারিয়ে যায়। তাই নাগরিক জীবনের বাহ্যিক নানাবিধ অনুশীলনের পাশাপাশি অন্তরের ক্ষোভ, অভিমান, দুঃখগুলোও ধীরে ধীরে মনের

অন্দরমহলের একান্ত যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অন্তরের সেই নিরালা একাকিত্বের মাঝেই তাদের যাবতীয় উচ্ছ্বাস এবং স্ফুরণ।

২

কলকাতাকেন্দ্রিক জীবনে বহুবিধ শব্দের সমাবেশ, বহু মানুষের কোলাহলের তীব্রতা একজন ব্যক্তি মানুষের একাকিত্বকে, তার নিঃসঙ্গ, নিরালা জীবনকে যেন আরও অসহায় করে তোলে। চোখে আঙুল দিয়ে বারবার দেখিয়ে দেয় সবার মাঝে বসে 'নিজের মুদ্রাদোষে' সে সবার থেকে আলাদা, বিচ্ছিন্ন। এই শব্দ বিষয়টা দিব্যেন্দু পালিতের রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শব্দ-নৈঃশব্দ্যের বিবিধ খেলা, রোজকার চেনা-অচেনা নানান শব্দের ভিড় জড়ানো অভ্যেসের মাঝে হঠাৎ নৈঃশব্দ্য কীভাবে মানুষের একাকিত্বের আতঙ্ককে উস্কে দেয়, তার একটা জোরালো বুনন থাকে দিব্যেন্দু পালিতের আখ্যানের মধ্যে। *আড়াল* (১৯৮৬) উপন্যাসের সোমেনের ভাবনা-চিন্তার সূত্রে এই ধরনের বিষয় উঠে এসেছে—

> সোমেনের হাতে সিগারেট, জানলায় মুখ, গা পিছনের সীটে হেলানো—বেলা দশটার ব্যস্ত রাস্তায় চোখ মেলে ভাবল রাস্তা বদলালেই দৃশ্য বদলায় না তেমন, যদি না এমন কোথাও এসে পড়ে যেটা সম্পূর্ণ নতুন, প্রতিদিনের দেখার সঙ্গে মেলে না একেবারে। এখনও তেমনি, সেই একই লোকজন, সেই একই ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি, যেটা এখানে দেখছে খানিক পরেই সেটা গিয়ে পৌঁছবে চেনা রাস্তা বলতে সে যা বোঝে সেখানে। সেই একই জটপাকানো শব্দ। এক সময়, যখন ছোটো ছিল, খেলাচ্ছলে মাঝে মাঝে কানে আঙুল দিয়ে দেখত শব্দে তারতম্য ঘটে কি না। কান খুললেই একই শব্দ ঝপ্ করে ঘা মারত পর্দায়। চাকরি ছেড়ে ইদানীং নিজের অডিও-ভিস্যুয়াল ইউনিট খুলেছে নীলাদ্রি; নয়েজ পল্যুসনের ওপর ডকুমেন্টারি তুলেছে একটা—সেদিন বলছিল, দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে শুধু সাউন্ড ট্র্যাকে মনোনিবেশ করলে যে-কোনও সুস্থ মানুষ পাগল

হয়ে যেতে পারে। তবে, সোমেন ভাবল, পাগল হবার জন্যে সবসময় বাইরের উপলক্ষ দরকার হবে কেন! নৈঃশব্দ্যের আক্রমণও কি কম জোরালো।[৬]

শব্দ অনেকক্ষেত্রেই অনুভূতি প্রকাশক হয়ে উঠেছে দিব্যেন্দু পালিতের লেখায়। 'ঘৃণা' (১৯৭৩) গল্পের শুরুতেই তার প্রমাণ মেলে—

সকালে ব্যস্ত হাতে উৎপলের জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছিল পলা। এমন সময়ে কোঁ কোঁ শব্দে ডোরবেল বেজে উঠল।

পলার হাত জোড়া। রান্নার লোক পূরণও পাঁউরুটির স্লাইস কেটে স্যান্ডুইচ বানাতে ব্যস্ত। পলা তাড়া দিয়ে বলল, 'যাও, দেখে এসো কে—'

যে এসেছে সে নিশ্চয়ই খুব ব্যস্তবাগীশ; একবার বেল বাজিয়ে অপেক্ষা করার সাধারণ রুচিটুকু পর্যন্ত নেই। পূরণ যেতে না যেতেই শব্দ উঠল আবার। শব্দটা বিশ্রী। কালই উৎপলকে বলেছিল অফিসের ইলেকট্রিসিয়ানকে বলতে বেলটা পালটে দিয়ে যেতে। আজকাল কত রকমের বাহারে শব্দের বেল বেরিয়েছে। ধ্বনি বৈচিত্র্যে তাদের কোনো কোনোটা কান জুড়িয়ে দেয়; সেরকম কিছু একটা লাগিয়ে দিলেই তো হয়! তা নয়, শব্দ শুনে মনে হবে একটা ছাগলের গলা টিপে ধরেছে কেউ![৭]

গল্পের মধ্যে দীপঙ্কর এবং পলার সম্পর্কের যে তিক্ততা এবং ঘৃণা, তার সুর বেঁধে দিয়েছেন দিব্যেন্দু পালিত শুরুর ওই কলিং বেলের কর্কশ শব্দের মাধ্যমে। পলা এবং উৎপলের দাম্পত্যের অভ্যাসের মাঝে যেমন আকস্মিকভাবে পলার প্রাক্তন প্রেমিক দীপঙ্করের আবির্ভাব দাম্পত্যের দৈনন্দিন সুরের মাঝে বেসুরো হয়ে বাজে, তেমনিই দৈনন্দিন কর্ম-ব্যস্ততার সুরে হঠাৎ কলিং বেলের অনাকাঙ্ক্ষিত, অযাচিত শব্দ দৈনন্দিন পরিচিত সুরের তাল কাটে। গল্পের মূল সুর বিরক্তি এবং ঘৃণার ধুয়ো ধরিয়ে দেয় এই বিশ্রী সুরটুকু।

৩

দিব্যেন্দু পালিতের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে ঘুরেফিরে বৃষ্টির অনুষঙ্গ আসে। বৃষ্টির সঙ্গে মানব মনের একাকিত্বের একটি গভীর সংযোগ রয়েছে। একটানা বৃষ্টির শব্দ, আর্দ্রতা এবং পরিবেশের পরিবর্তন মনের উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে, যেটা কখনও আনন্দের বা মুক্তির, কখনও গভীর বিষাদের, কখনও একাকিত্বের বা নিঃসঙ্গতার দ্বার উন্মুক্ত করে। বৃষ্টির আর্দ্র পরিবেশ অনেক সময়ই মনের গভীরে তলিয়ে যাওয়া চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিগুলোকে মনের উপরিতলে ভাসিয়ে দিয়ে নতুন করে সেসব অনুভূতির ওপর মনসংযোগ করবার সুযোগ করে দেয়। আসলে বাইরের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের বিবেকের সঙ্গে নিজের একান্ত সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারে একটি বর্ষণমুখর দিন। তখন মানুষ নিজের থেকে নিজে পালিয়ে যাওয়ার, নিজেদের সত্যকারের অনুভব-ভাবাবেগের থেকে পালিয়ে যাওয়ার আর সুযোগ পায় না। যাচিত বা অযাচিত যাবতীর ভাবাবেগের সম্মুখীন হওয়ার পর, সেসব নিয়ে গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করার পর অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের প্রকৃত চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছে-অনিচ্ছেগুলো অজ্ঞানতার খোলস ভেদ করে স্বচ্ছ রূপ নেয় মানুষের নিজেদের কাছে। নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে বৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করে অথবা মেঘাচ্ছন্ন গুমোট পরিবেশ রচনা করে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর চরিত্রদের বিবেকের সম্মুখীন করেছেন, মানব-মনের গভীর থেকে গভীরতর অপ্রকাশ্য আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তবে বলা জরুরি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব অনুভূতিগুলি মুক্তির আস্বাদ এনে দেয় না, প্রশান্তি বহন করে না। দীর্ঘ দাবদাহের পর ঝমঝম করে ঝরে পড়া বৃষ্টি মানুষকে যে শান্তির আরাম দেয়, সেই প্রশান্তিবাহক ঝমঝমে বৃষ্টির বর্ণনা কিন্তু তাঁর উপন্যাসে খুব বেশি পাওয়া যায় না। যে বৃষ্টি গুমোট আবহাওয়াকে আরও গুমোট, আরও দম বন্ধ করে তোলে, সেই বৃষ্টির প্রসঙ্গই বারবার আসে। তার কারণ

সম্ভবত, কংক্রিটের অনভিপ্রেত খাঁচায় নিত্যযাপন করার ফলে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রাণ ভেতরে-ভেতরে দিবারাত্র যে আর্তনাদ করে, সেটা তুলে ধরাই লেখকের মূল লক্ষ্য। তাই বৃষ্টির ফলে তৈরি হওয়া বিষণ্ণতা, একাকিত্ব, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, ক্লান্তি, অবসাদ, কর্মক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদির জটিল মানসিক চলন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাঁর উপন্যাসে। ধরা যাক, *স্বপ্নের ভিতর* (১৯৮৮) উপন্যাসের কথা। সেখানে দেখা যায় অর্পিতা একজন সুশিক্ষিত, আত্মনির্ভর, দৃঢ় মানসিকতার মেয়ে, যে স্বেচ্ছায় নিজের প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে মা হতে চলেছে। কিন্তু তার প্রেমিক অনুপ অন্য একজন অসহায় মহিলার স্বামী। অর্পিতার সন্তান ভালোবাসার সন্তান অথচ সে তো সমাজের নিয়ম মেনে মা হয়নি। তাহলে সে ক্ষেত্রে তার সন্তানকে কি আদৌ অবৈধ সন্তান বলা যায়? ভালোবাসা যে প্রাণের জন্ম দিয়েছে, তা কি অবৈধ হতে পারে? যেহেতু সমাজ এই নবীন প্রাণকে অবৈধ তকমা দেবে, তাই অর্পিতা এই নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করতে পারে না, নিজের কাছের বন্ধু বিশাখার কাছেও নয়। নিজের মধ্যেকার ভ্রূণের উপস্থিতি নিয়ে সে যখন ভাবনা-চিন্তা করে তখন সে স্বভাবতই জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়—

> ক্রমশ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল অর্পিতা। আকাঙ্ক্ষায় ভুল নেই কোনও, তবু কিছুদিন থেকে নিজেকে এত একা লাগছে কেন! মাঝে মাঝে কেন মনে হচ্ছে এমনকী অনুপের সান্নিধ্যেও এসে গেছে এক ধরনের যান্ত্রিকতা, আশ্বাস সত্ত্বেও ফিরে পেতে ইচ্ছে করছে নিজের সেই অচেনা অস্বস্তিকে, যার রূপ কোনও দিনই প্রত্যক্ষ করতে পারেনি সে!
>
> বিশাখা চলে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। তখন বৃষ্টি ছিল না। আবার নেমেছে। ঠিক ঝিরঝিরে নয়, দু'চার মিনিট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেই ভিজে যেতে পারে। তবু এই বৃষ্টিতে শব্দ নেই কোনও। আকাশের ঘোর দেখে মনে হয় আজ এইরকমই চলবে।

এমন বিচ্ছিরি আবহাওয়ার দিকে তাকিয়ে সারাক্ষণ বসে থাকতে হবে না কি? শরীর খারাপের জন্যে কাল সে অফিস যায়নি। অনুপ আজকাল ঘন ঘন ট্যুরে যাচ্ছে, কেন কে জানে! এখনও বাইরে। এই অবস্থায় এক দুদিন ছুটি নিতেই পারে। এখন ঠিক করল, অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, তবু যাবে।

জোর করেই শরীরে প্রতিক্রিয়া আনল অর্পিতা। উঠে দাঁড়াল। যতটা সম্ভব দ্রুত নিজেকে তৈরি করে নিয়ে রাস্তায় নামল। হাতে জাপানি ছাতা ধরা, তবু হাওয়ার দমকায় বৃষ্টির ছাট লাগছে গায়ে। ফুটপাথ ধরে হাঁটলেও প্যাচপেচে কাদা থেকে শাড়ির পাড় বাঁচানো যায় না। এদিক ওদিক গাড়ির ছুটোছুটিতে রাস্তার খোঁদলে জমে থাকা জল ছিটকে আসতে চাইছে গায়ে। অফিসের সময় যেমন হয় এখন তা নয়, রাস্তায় লোকজন কম। দোকানের গায়ে কিংবা বাড়ির ঝুলবারান্দার নীচে আশ্রয় নিয়েছে কেউ কেউ। ওরই মধ্যে একটি শিশুকে আড়াআড়ি বুকে জড়িয়ে রোগা চেহারার মাঝবয়েসি একটি মেয়েকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে যেতে দেখল উল্টোদিকে। কাদায় লুটোচ্ছে নোংরা শাড়ির আঁচল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কোনও। সম্ভবত পাশের বস্তি থেকেই ছুটে এল। শিশুটি কি অসুস্থ? ইতিমধ্যেই মৃত? কোথায় যাচ্ছে! যেতে যেতেই একবার পিছনে তাকিয়ে ফুটপাথ বদল করল অর্পিতা...আরও একটু এগিয়ে মোড় থেকে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে করতে বৃষ্টির নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ক্রমশ আরও এক শব্দের অনুরণন শুনতে পেল সে; অস্ফুট, অদেখা অন্ধকারের মধ্যেই কিছু একটা কেঁপে যাচ্ছে যেন![৮]

অর্পিতার চোখ দিয়ে পাঠক বৃষ্টির পরিবেশ দেখে। নিজেকে সমগ্র জগৎসংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে তবেই এমন নিবিড় একাগ্র পরিদর্শন সম্ভব। সন্তান কোলে ছুটে যাওয়া একটি মেয়ে ছাড়াও নিশ্চয়ই আরও মানুষ ছিল রাস্তায় কিন্তু অর্পিতার চোখ গেছে তার ওপরেই। সে যে প্রাণকে নিজের মধ্যে বহন করে চলেছে, তাকে নিয়ে তৈরি হওয়া দুশ্চিন্তা আরোপিত হয়েছে বস্তির ওই মেয়েটির কোলের সন্তানের ওপর। অনেক সময় উপন্যাসের চরিত্রদের মানসিক অস্বচ্ছতা, দ্বন্দ্ব, অস্বস্তির প্রেক্ষাপট নির্মাণ করবার জন্য উপন্যাসের

শুরুতেই ঘোলাটে আকাশের একটা বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। তাঁর উপন্যাসের আকাশ যেন উপন্যাসের চরিত্রগুলির মানসিক প্রতিচ্ছবি, যাতে খুব কমই রৌদ্রকরোজ্জ্বল ফুরফুরে বাতাস বয়, অধিকাংশ সময়ই সেখানে ঘোলাটে রঙ বিষণ্ণতার ছবি আঁকে। উদাহরণ হিসেবে *সিনেমায় যেমন হয়* (১৯৯০) উপন্যাসের শুরুর অংশটুকু দেখে নেওয়া যায়—

> মার্চ মাসের এক বুধবার ভোরে আকাশের দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল গার্গীর। অদ্ভুত ঘোলাটে হয়ে গেছে চারদিক, আলো ফুটলেও অস্বচ্ছতা কাটেনি, আশপাশের ঘরবাড়ি গাছপালা কেমন যেন থম মেরে আছে বিষণ্ণতায়। একটু খেয়াল করতেই বুঝল বৃষ্টিও পড়ছে, তবে থেমে থেমে, এক দু ফোঁটায়। এমন বৃষ্টি নৈঃশব্দ্যে চিড় ধরায় না এতটুকু।[৯]

বৃষ্টির প্রতি লেখকের গহীন আকর্ষণ এতোটাই তীব্র যে, *যখন বৃষ্টি* (১৯৯৮), বা *বৃষ্টির পরে* (১৯৭৪)-এর মতো কিছু উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র বা চালিকা শক্তিই হয়ে উঠেছে বৃষ্টি। বৃষ্টিই যেন নির্ধারণ করেছে গল্পের পরিণতি এবং চরিত্রগুলির নিয়তি। একাকিত্বকে জোরালোভাবে পরিস্ফুট করার জন্য দিব্যেন্দু পালিত অনেক সময়ই বৃষ্টি বা মেঘলা আকাশের অস্বস্তিকর পরিবেশের বর্ণনা করা ছাড়াও নানান রকম প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, যা শূন্যতার সপক্ষে ধুয়ো তোলে। *মধ্যরাত* (১৯৬৭) উপন্যাসেই তপতীর চোখ দিয়ে এমন একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি লেখক তুলে ধরেছেন, যা তপতীর নিজের সম্পর্কে নিজের অনুভবটিরই অলংকরণ করে—

> গতি বৃদ্ধি করার আগে তপতী নিজেকে গুছিয়ে নিল। কপালে রুমাল ঘষে ঘাম মুছল, চুলে হাত দিয়ে দেখল খোঁপা ঠিক আছে কিনা। ম্লান গোধূলির আলোয় আকাশ ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে। একটা তারা চোখে পড়ল। নিঃসঙ্গ বলেই সম্ভবত দ্যুতিহীন, অত্যন্ত নিষ্প্রভ মনে হল।[১০]

৪

সাধারণভাবে মোটা দাগে একাকিত্বকে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, একজন মানুষ যখন সামাজিক সংযোগের অভাব বোধ করে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা বোধ করে, এমনকি নিজের সামাজিক সত্তার সঙ্গে নিজের অন্তর্নিহিত গূঢ় সত্তার মেলবন্ধন ঘটাতে পারে না, তখনই সে একাকিত্বের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। দীর্ঘমেয়াদী একাকিত্বের বোধ যখন সমাজের কাছে আশ্রয় পায় না, তখন সে স্মৃতির ছত্রছায়ায় আশ্রয় খোঁজে। বর্তমানে বাস করেও কিছু মানুষের মন বারবার স্মৃতির কোঠায় হানা দেয়। তার ফলে বর্তমান এবং স্মৃতির এক অদ্ভুত কোলাজ বানানোর খেলায় ডুবে আত্মমগ্ন হয়ে কাটিয়ে দেয় তারা। এই সব আত্মমগ্ন মানুষের একান্তে নিজের মনে বলে চলা দীর্ঘ সংলাপের উপস্থিতি প্রায়ই চোখে পড়ে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে। *বিনিদ্র* (১৯৭৬) উপন্যাসে দেখা যায় দীপ্ত একদিন ঘুম থেকে উঠে আধো ঘুমে, আধো জাগরণে নিজের শরীরের মধ্যে আবহাওয়ার তারতম্য টের পায়। বর্ষা এবং শীত এই দুই ঋতুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে দুই ঋতুর বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যের আমেজ অনুভব করে নিজের স্বভাব-চরিত্রে। মফঃস্বলে মধ্যবিত্ত ভাবাবেগ এবং আদর্শের মাঝে ছেলেবেলা কাটানো দীপ্ত বড়ো হয়ে কলকাতা শহরে এসে লেখাপড়া করে ধোপদুরস্ত সাহেবি কেতা রপ্ত করে একটি বড়ো মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানির হর্তা-কর্তা হয়ে উঠেছে। দীপ্ত বাইরে থেকে হিন্দুস্থান ফস্টারের বিজ্ঞাপন বিভাগের রূঢ়, কেতাবান প্রধান হয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু অন্তরে এখনও ছোটোবেলার সরল, শিশু দীপ্তকে বহন করে চলে। সেই সারল্যমাখা স্মৃতিটুকু সে বারবার ঝেড়ে ফেলতে চায়, কিন্তু কখনও অস্বস্তিকর গুমোট আবহাওয়ায়, ঊষার আধো অন্ধকারে সেই অস্বস্তিদায়ক অতীত অবচেতন ফুঁড়ে চেতনায় মিশে যেতে চায়। তখন সে তার বর্তমানের অসৎ, লোভী এবং ভয়ানক মাত্রায় সফল চেহারাটা দেখে ক্লেদজনিত শূন্যতায় আত্মবোধ হারিয়ে ফেলে। দীপ্ত

নিজেও সন্তানের পিতা, সুতরাং সন্তানের সরল মুখখানার দিকে তাকিয়ে তার তখন মনে পড়ে যায় তার আদর্শবান ডাক্তার বাবার মৃত্যুদিনের কথা। সে হয়ে ওঠে স্মৃতিকাতর নস্টালজিক—

> রাস্তা একটাই, দু'জন দীপ্ত। প্রত্যূষের আবহে বহু দিন পরে দৃশ্যটা আবার সে ফিরিয়ে আনতে পারল, চোখের এতো কাছে যে মনেই হয় না ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছে কুড়ি-একুশটা বছর।
>
> সেদিনও রাস্তা ফাঁকা ছিল এমনি, অন্ধকার আরও একটু বেশি। পালা করে মা'র সঙ্গে রাত জাগছিল সে। অলিপ্ত ছোটো তখন, অনিচ্ছের মধ্যেও ঘুমিয়ে পড়ত তাড়াতাড়ি। সেও কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? আজ ঠিক মনে নেই। শুধু মনে পড়ে মা'র সেই কণ্ঠস্বর : 'খোকা, একবার যা বাবা। হরেন ডাক্তারকে নিয়ে আয়। আমি যেন নাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না!' ঘুম চোখে তখনই লক্ষ করেছিল বাইরে বিষম রাত—ভয়ে সেঁধিয়ে এসেছিল হাত-পা। তবু মফঃস্বলের সেই অন্ধকার, নির্জন রাস্তা এমনিতে ভীতু ছেলেটিকে অসম্ভব সাহসী করে তুলেছিল সেদিন। আজ বুঝতে পারে জীবনে সেই প্রথম অসহায় শরীরময় অন্ধ আক্রোশ নিয়ে সময় ও গতির বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু করেছিল সে—এক দমে দেড় মাইল রাস্তা ছুটে এসে অনুভব করেছিল এক রকম সাফল্য—তীব্র আহ্লাদে ঘেমে উঠেছিল শরীর। তখন জানত না, আরো এক প্রতিপক্ষ আড়ালে পিছনে টেনে রেখেছিল তাকে, স্তব্ধ করে দিয়েছিল সময় ও গতি। জানত না, শরীর-মনের প্রবণতা ছাড়িয়ে আছে আরো এক শক্তি, যার প্রবল আবির্ভাবে আকণ্ঠ অসহায়তা ছাড়া আর কিছু বোধ করা যায় না।
>
> 'ব্রাহ্ম মুহূর্তে মৃত্যু মানুষের পুণ্যের পরিচয়!' বাবার নাড়ি দেখে বলেছিল হরেন ডাক্তার, 'এসে কোনো লাভ হলো না!'
>
> ব্রাহ্ম মুহূর্ত; কথাটা গেঁথে গিয়েছিল বুকে। আকাশে তাকিয়ে সেদিনও সপ্তর্ষি পেয়েছিল দীপ্ত; হঠাৎ পাখির গলায় ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল কান। ক্রমশ ফুটে উঠেছিল আলো। আজ বহু দিন পরে আবার সেই প্রত্যূষের দিকে তাকিয়ে জলে ভরে উঠল চোখ।[১১]

কুড়ি-বাইশ বছর আগের সেই মৃত্যুর ঘটনা দীপ্তর মনের অতলে রয়ে গেছে। সন্তানের পিতা দীপ্ত সন্তানের মুখের দিকে চাইলে মাঝেমধ্যে স্মৃতির নির্জনতায় ফিরে যায়। দীপ্তর পিতার মৃত্যু যেন সারল্য এবং সততার মৃত্যু। মফঃস্বলের নির্জনতা ছেড়ে আসার পাশাপাশি সে ঝেড়ে ফেলেছিল তার বাবার আদর্শ, নীতি-নৈতিকতাবোধকে কিন্তু বাবার স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে পারেনি। তার সন্তান পাপু, যার মধ্যে সে নিজের কৈশোরকে এখনও খুঁজে পায়, সেও হয়তো একদিন কালের নিয়মে দীপ্তকে ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যাবে—এইসব সাত-পাঁচ ভাবনা দীপ্তকে সাময়িকভাবে দুঃখে আর্দ্র করে রাখে। স্মৃতির খেয়া বেয়ে ঊষার মায়াবী একাকিত্ব পার করে, সকালের ঝকঝকে আলোর মাঝে এসে পৌঁছলেই দীপ্ত আবার বর্তমানের প্রখরোজ্জ্বল 'দীপ্ত রে'-তে ফিরে আসে।

৫

নিঃসঙ্গতার চোরাস্রোতে ডুবে যাওয়া অতীতচারী নস্টালজিক মানুষগুলির চিন্তা-ভাবনার স্রোত এমন এক অবারিত দ্বার লাভ করে দিব্যেন্দু পালিতের লেখায়, যে সেইসব অবরুদ্ধ আবেগানুভূতি নির্দ্বিধায় ফল্গুধারার মতো তাঁর লেখনীতে বেগবান হয়ে ওঠে। একাকিত্বের ঘোরে ডুবে থাকা একটা মানুষের মনের গভীরে, যেখানে চেতন-অচেতন মিলে মিশে একাকার, সেখানে ভাবনার নিরবচ্ছিন্নতা নিঃসংকোচে ডানা মেলে দেয়। সেই এলোমেলো ভাবনার বিস্তারে ঝেড়ে, বেছে, ছেঁকে কথা সাজানোর প্রয়োজন পড়ে না। মাথার ভেতর পরপর যা আসে, তাকে প্রসাধনহীনভাবে বসিয়ে দেওয়া যায়। কারণ নিঃসঙ্গতার মাঝে তো অপর কোনও ব্যক্তির উপস্থিতি নেই। সেখানে কেবলই নিজের সঙ্গে নিজের অন্তর্গত আলাপচারিতা। এই ধরনের অন্তর্গত দীর্ঘ চিন্তা, দীর্ঘ সংলাপের উপস্থিতি প্রায়ই চোখে পড়ে দিব্যেন্দু পালিতের লেখায়। প্রসঙ্গত *অবৈধ* (১৯৮৯) উপন্যাসের কথাই ধরা যায়।

সেখানে দেখা যায়, জিনা নিজের স্বামী অসীমের সঙ্গে শুষ্ক, একঘেয়ে, নিরুত্তাপ দাম্পত্য কাটিয়ে ক্লান্ত। তাদেরই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা গায়ত্রীর স্বামী পার্থর সঙ্গে নতুন করে সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার পর সে বুঝতে পারে, যৌবনের উদ্দাম চাহিদাগুলো এতদিন তার মধ্যে ছাই-চাপা পড়া আগুনের মতো রয়ে গিয়েছিল, পার্থর স্পর্শ পেয়ে তা পুনরায় দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে। অসীমের অনুপস্থিতির সুযোগে সে পার্থর সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায়। উচিত-অনুচিত, নৈতিকতা-অনৈতিকতার টানাপোড়েনে জিনা প্রায় সারাক্ষণই নিজের মধ্যে নিজে ডুবে থাকে। অসীমের সঙ্গে নীরস দাম্পত্যের অভিঘাতই অনেকাংশে এই একাকিত্বের কারণ। কিন্তু পার্থর সঙ্গে যৌন মিলনের উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় মেতে ওঠার পরও সেই মানসিক শূন্যস্থান আদৌ পূরণ হয় না। হোটেলের ঘরে পার্থর সঙ্গে গোপন মিলনের সময় হঠাৎ পায়ের চেটোয় একটি পিঁপড়ে দেখে সে মনে মনে ভাবনার গভীরে ডুবে যায়—

> পার্থ উঠে যেতে চাইলেও ওকে উঠতে দিল না জিনা। চোখ বন্ধ করে নিজের বুকের ওপরেই ধরে রাখল ওকে। বাঁ পায়ের গোড়ালি থেকে চেটোর দিকে হেঁটে যাচ্ছে শিরশিরে একটা অনুভূতি—সম্ভবত পিঁপড়ে, পা-টা অল্প নাড়তেই খসে পড়ল সেটা। নিঃশ্বাস সহজ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের আলস্য ছড়িয়ে যেতে চাইছে সর্বাঙ্গে। একই সময়ে, অনধিকার প্রবেশের মতো, প্রশ্নটা ফিরে এল মাথায়, এটা কি ঠিক? একবারের ভুল পরের বারের ইচ্ছায় অবৈধ হয়ে ওঠে না কি? যদি এমন হয় যে এইভাবেই অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল তারা, অবৈধের ভাবনা থেকে বিষটিষ খেয়ে এইভাবেই মরে গেল দুজনে, তাহলে অনেকক্ষণ পরে সন্দেহবশত দরজা ভেঙে যারা ঢুকবে, এই অবিন্যস্ত, লজ্জাকর দৃশ্য দেখে নিশ্চিত অস্বস্তিতে পড়বে তারা, কিন্তু সে কিংবা পার্থ দুজনের কেউই তা জানতে পারবে না। কটেজ থেকে তাদের বডি সরিয়ে নিয়ে যাবার আগে পুলিশ ছবি তুলবে হয়তো, ঠিক এই পোজে, সে-ছবি কি চোখে পড়বে অসীম বা

গায়ত্রীর? কী ভাববে ওরা! এভাবে মরে না গিয়ে যদি সরাসরি বিদেয় হত দুটোতে, বিয়ে করত, তাহলে এতটা অস্বস্তিতে পড়তে হত না![১২]

একাকিত্ববোধের অনুষঙ্গ হিসেবে অনিবার্যভাবে নিজের অস্তিত্বকে ঘিরে তৈরি হওয়া প্রশ্ন মনের আনাচ-কানাচ থেকে উঁকি দেয়। জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য, মূল্যবোধকে ঘিরে তৈরি হওয়া মানসিক সংগ্রাম মনের অতলে সর্বক্ষণ আত্মানুসন্ধান করে চলে। নগরকেন্দ্রিক জীবনে সবসময় দৌড়ে বেড়ানো রণক্লান্ত মন জীবনের অন্তঃসারশূন্যতায় জর্জরিত হয়ে বঁড়শিতে গাঁথা মাছের মতো ছটছট করে ওঠে। নিরন্তর যন্ত্রণায় ডুবে থেকে একসময় আসাড় হয়ে আসা মন আর জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। যান্ত্রিক জীবন একদিন গল্পহীন, নিষ্প্রাণ যন্ত্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। *আমরা* উপন্যাসের প্রিয়নাথের স্বরে সেই নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক জীবনের কথাই ধরা পড়ে—

সত্যি বলতে, তনুশ্রী থাকা সত্ত্বেও তারপর বহু দিন পর্যন্ত আমার এই একা ভাবটা কাটে না। আমাদের বিয়ে হয় না—তেতে-ওঠা মাংস শিথিল হয়ে আসে ক্রমশ।...এক একদিন গভীর ডুব-সাঁতারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তনুশ্রী, পাশাপাশি যেতে যেতে অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ বলে, 'কিছু বলছিলে?' তখন মনে হয় প্রিয়নাথ মজুমদার বলে সত্যিই কেউ নেই, আসলে সে আর ল্যাম্প-পোস্ট আর ট্রামের লাইন ইত্যাদি এক এবং অভিন্ন—হৃৎপিণ্ডহীন এক গণতন্ত্রের অংশ। বুক চিরলে গড়িয়ে পড়বে মরচের গন্ধময় অদ্ভুত এক তেল, আর কিছু কাচের টুকরো, বিস্কুটের টিনের ঢাকনা কিংবা অকেজো ট্রানজিস্টারের পুরো যন্ত্রপাতি। এই রকম, ভাবতে ভাবতেই তো পুরনো হয়ে যাচ্ছি, গ্রীষ্ম থেকে এসে পড়ছি কনকনে শীতে।[১৩]

৬

নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন মানুষ স্বভাবতই শব্দ এবং দৃশ্যে আক্রান্ত হয়। শহরের বিচিত্র শব্দের সমাবেশ, রঙিন দৃশ্যের প্রাচুর্য আলাদা আলাদাভাবে গাঢ়তর রূপে ধরা দেয় তার ইন্দ্রিয়ে।

দীর্ঘকালীন বিচ্ছিন্নতাবোধ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে আরও সংবেদনশীল করে তোলে। *সম্পর্ক* উপন্যাসে দেখা যায় প্রৌঢ় রামতনু বাইরে দীর্ঘ কর্পোরেট জীবন এবং ঘরে ত্রিশ বছরের সংসার জীবন পালন করে গেছেন। হঠাৎ নীরা নামক এক যুবতীর প্রতি দুর্বার প্রেমের অনুভব তাঁর পঞ্চান্ন বছরের নিয়মানুবর্তিতায় ফাটল ধরায়। তার সব এলোমেলো হয়ে যায়, তিনি জীবনের খেই হারিয়ে 'অদ্ভুত এক আঁধারে' ডুব দেন—

> নিজের গলার স্বর নিজের কানেই নতুন শোনাল। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—যেন তিনি প্রকৃতিস্থ নেই, স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন...রাত যতো গভীর হয় প্রতিটি শব্দই যেন ধ্বনি বদলায়। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে রামতনু নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব্দ শুনলেন। মন্থর পা ফেলার শব্দ শুনলেন। প্রতিটি শব্দই অন্য রকম। এ ছাড়াও আরো কিছু শব্দ ছিল। দ্রুত ধাবমান মোটরের শব্দ, অসুখী বিড়ালের কান্নার শব্দ, দূরাগত রেডিওর শব্দ, রামভরস গ্যারাজে গাড়ি তুলছে, গ্যারাজ বন্ধ করল, সেই শব্দ। এই মুহূর্তে প্রতিটি শব্দই তাঁর অসহায়তা ঘন করে তোলে। ওপরের শেষ সিঁড়িতে পৌঁছে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিলেন রামতনু। এক সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা যেন তাঁকে শূন্য করে গেছে।[১৪]

পৃথিবীতে বসবাস করে পৃথিবীটাকে যেমন দেখতে লাগে, অন্য কোনও গ্রহ বা উপগ্রহ থেকে পৃথিবীকে কিন্তু সেরকম লাগে না। একেবারে ভিন্ন একটা রূপে ধরা দেয় পৃথিবী। সেরকমই সকলের মাঝে থেকে সকলের থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর চির-পরিচিত শব্দ, দৃশ্য সবকিছুই অন্য স্বাদে ধরা দেয় রামতনুর ইন্দ্রিয়ে। *আমরা* উপন্যাসের প্রিয়নাথের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটনা ঘটে। তবে তার বিচ্ছিন্নতার কারণ আলাদা। নতুন কিছু ঘটা দূরের ব্যাপার, বরঞ্চ জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব, একঘেয়েমি, জীবন সম্পর্কে হতাশা ও বিরক্তির কারণে চারপাশের বিচিত্র শব্দ ঘনীভূত হয়ে তার মস্তিষ্কে ঘা দেয়—

> মাথায় ভোঁ ভোঁ এক রকম শব্দ হচ্ছে টের পাই, যেন কাছেই কেউ ছুরি কাঁচি শান দিচ্ছে মেশিনে, আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ছে আমার গায়ে। ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে আমার কান। অফিস ভর্তি লোকজন, তাদের কথাবার্তা, চেয়ার ঠেলা ও টাইপরাইটারের ক্রমাগত শব্দ চলে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে।[১৫]

এই প্রিয়নাথ নিজের মধ্যবিত্ত একঘেয়েমির খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু একঘেয়েমির মধ্যে রয়েছে এক ধরনের চিন্তাহীন আরামের আয়াশ। একঘেয়ে দৈনন্দিনতায় রোমাঞ্চ নেই বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত জীবনের করুণ অভ্যাসের দাসত্ব থেকে বেরোনোও তো সহজ কথা নয়। তাই প্রিয়নাথ হাজার বিরক্তি সত্ত্বেও একই কেরানির জীবন এবং একই মধ্যবিত্ত সৌন্দর্যবোধের ছাঁচে গড়া প্রেমিকা তনুশ্রীকে ছেড়ে বেরিয়ে আসার কথা ভাবতে পারে না। কিন্তু জীবন যদি ক্ষণিক রোমাঞ্চের লোভ দেখায়, তাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা প্রিয়নাথের নেই। হতাশাগ্রস্ত মানসিক রিক্ততা তাকে তার উচ্চবিত্ত বন্ধু কৌশিকের জীবনের প্রতি প্রলুব্ধ করে কিন্তু কৌশিকের জীবন বেছে নেওয়ার মতো দুঃসাহস যোগাতে পারে না। এই বিচিত্র টানাপোড়েনের মাঝে হঠাৎ একদিন প্রিয়নাথের জীবনেও এসে পড়েছিল একটু বেপরোয়া হওয়ার সুযোগ। বিয়ের আগে তনুশ্রীর মধ্যবিত্ত নীতিবোধ যে প্রিয়নাথকে যৌবনের সম্পূর্ণ আস্বাদ পেতে দেয়নি, সেই প্রিয়নাথ বিনা প্রস্তুতিতে আকস্মিকভাবে এক নির্জন দুপুরে সেই আস্বাদ সম্পূর্ণরূপে লাভ করে তনুশ্রীর বৌদির কাছে। তনুশ্রীর প্রস্তাবেই প্রিয়নাথ তনুশ্রীর অনুপস্থিতিতে, তার অসুস্থ দাদার জন্য বৌদি সুধাকে আর্থিক সাহায্য করতে গিয়েছিল। সুধা কৃতজ্ঞতাবশতই হোক, বা দীর্ঘদিনের উপোসী দেহের ক্ষুধার কারণেই হোক, আত্মসমর্পণ করে প্রিয়নাথের কাছে। মিলনের আগের মুহূর্তে প্রবল উত্তেজনায় সজাগ হয়ে উঠেছিল প্রিয়নাথের পঞ্চেন্দ্রিয়—

> ইতিমধ্যে দুলে উঠল তার পা, সুধা লক্ষ করেনি শাড়িটা কিছুটা বিছানায় চাপা পড়ায় বেরিয়ে পড়েছে তার ডান পায়ের ঊর্ধ্ব গোড়ালি ও গোছ, আলোর স্বল্পতা সত্ত্বেও মৃদু রোমগুলি চিকচিক করছে বালির মতো...কাপে চুমুক দিয়ে আমি শরীর থেকে নির্গত এক প্রাকৃতিক গন্ধ টের পেলাম—তীব্র অথচ চাপা, অস্বস্তিকর সেই গন্ধ সুধাকেও স্পর্শ করার ভয়ে সংযত করলাম নিজেকে।...বস্তুত, কিছুক্ষণ আগে হারিয়ে যাওয়া সেই বিচিত্র গন্ধটা ফিরে আসছিল আমার মধ্যে। মধ্যরাতের স্বপ্নে বিচরণশীল মাছের মতো রক্তে ঘাই মেরে সুধা চলে যাচ্ছে জল থেকে জলে, তার শরীরের পিচ্ছিল ও আমিষ গন্ধে থরথর করে কেঁপে উঠল মেরুদণ্ড। সুধা সম্ভবত আমার অস্থিরতা টের পেয়েছিল।[১৬]

৭

সামাজিক বা পারিবারিক সংযোগের অভাব থাকলে অনেক সময়ই মানুষ নিজেকে নিজের সঙ্গী করে তোলে, নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলে। তখন আত্মানুভূতি, আত্ম-পর্যবেক্ষণ আরও গভীর হয়ে ওঠে। স্ব-সচেতনতায় পরিপূর্ণ একটা অস্তিত্বের বোধ ঘনীভূত হয়ে ওঠে ব্যক্তি-চেতনায়। *আড়াল* উপন্যাসের রুচির ক্ষেত্রে এরকমই একটা বিষয় লক্ষ করা যায়। বাথরুমের একান্তে আয়নার সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করার ত্রিশ বছরের অভ্যেস রুচির। একসময় রুচি কেবলই রুচি ছিল, পরে সমাজের নিয়মে সোমেনের স্ত্রী হয়েছে, ক্রমান্বয়ে ফলবতী হয়ে শ্রীময়ী ও কৌশিকের মা হয়েছে। চব্বিশ বছরের দীর্ঘ দাম্পত্যে সোমেন এবং তার সন্তানদের খুঁটিনাটি খেয়াল রাখতে রাখতে নিজের দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ পায়নি। বিয়ের পর সোমেনের বন্ধু-বান্ধবেরাই হয়ে উঠেছে তার বন্ধু। রুচির নিজস্ব সত্তাটুকু বিয়ের পর 'আড়ালেই' থেকে গেছে। সে সবার খেয়াল রাখলেও তার খেয়াল কেউ কখনও রাখেনি। হঠাৎ এক সন্ধ্যেয়ে মদের আসরে সোমেনের বন্ধু রুচির প্রতি বাড়তি আকর্ষণ থেকে মদ্যপ অবস্থায় রুচির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। রুচি সেদিন দীপঙ্করের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়নি কিন্তু নতুন করে নিজের বিয়াল্লিশ বছরের আড়ালে

থাকা আসল সত্তাটির সঙ্গে পুনরায় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সে আবিষ্কার করে তার সুদীর্ঘ দাম্পত্যে ভালোলাগা বা ভালোবাসার তুলনায় অভ্যেসটাই বেশি। একসঙ্গে থাকার এই অভ্যেসটাই হয়ে উঠেছে তার আশ্রয় এবং নির্ভরতা, যেটাকে সে ভালোবাসার জন্য ঠিক নয়, হারানোর ভয়ে আগলে রাখে। সোমেনই ছিল তার জীবনের একমাত্র পুরুষ। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আকস্মিকভাবে নতুন একজন পুরুষ মানুষের (দীপঙ্করের) স্পর্শ তার দৈনন্দিন অভ্যাস-যাপনকে বিভ্রান্ত করে তোলে। যৌবন প্রাপ্তির পর থেকে ত্রিশ বছর ধরে স্নানঘরের একান্তে নিজেকে আয়নার সামনে মেলে ধরার অভ্যাসেও সেই বিভ্রান্তির প্রভাব পড়ে। একাকিত্বের অবসরে সে নতুন করে অনুভব করে তার সৌন্দর্যকে—

> জল যেভাবেই প্রবাহিত হোক, স্রোত থেকে শরীরটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে অসুবিধে হয় না কোনও। বয়স বেয়াল্লিশে পৌঁছলেও, রুচি ভাবল, পূর্ণতায় টান পড়েনি এখনও। এই শরীর এখনও যে-কাউকে টানবে। মেদহীন কোমর পেটের কাছে ঈষৎ উঁচু হয়ে সাহসে ছড়িয়ে পড়েছে জঙ্ঘার দু দিকে, সেখানে শাঁখের দাগ জলেও আড়াল হয় না—বরং স্পষ্ট করে মাংসের টান-টান ভঙ্গিমা। একই জায়গা থেকে ওপরেও বিন্যস্ত সে। ঈষৎ লম্বাটে গলা সমান ভাবে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে সামান্য পরিস্ফুট কণ্ঠার হাড় দুটিকে—প্রায় সেইখান থেকে যেভাবে নামা উচিত সেইভাবে নেমে গেছে দুটি বাহুল্য বর্জিত স্তন। নিজের মুখ নিজে দেখা যায় না, তবু, রুচি জানে, লাবণ্য যা দিতে পারে তার অনেকটাই সে পেয়ে গেছে কপাল, ভুরু, নাক, ঠোঁট ও চিবুকে। আরও কী পেতে পারত তা ভেবে আক্ষেপ হয়নি কখনও। এখনও হল না। তবে, শাড়ি, সায়া, ব্লাউজের আড়াল কি চেনায় এভাবে![১৭]

রুচির এই নিখুঁত পরিদর্শন তার অন্তরের অপূর্ণতাজনিত একাকিত্বকেই তীব্রতর করে। প্রসঙ্গত, এই একান্ত স্নানের দৃশ্য পাঠক মাত্রেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর (১৯১২-১৯৮২) 'গিরগিটি' (১৯৫৬) গল্পের মায়ার নিভৃত স্নান-দৃশ্যের কথা মনে করায়।

একাকিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ, নিজের সত্তার অন্বেষণে নিয়োজিত হয়ে নিজের চাওয়া-পাওয়া, অপূর্ণতা, আক্ষেপ, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের প্রসঙ্গ কখনও স্মৃতিবাহিত হয়ে, কখনও কোনও ঘটনা প্রসঙ্গে বা বর্তমান অবস্থার সাপেক্ষে তুলে আনা এবং বারবার করে তুলে আনা। অতীত এবং বর্তমানের গমনাগমন যেখানে মিলেমিশে যায় সেখানে প্রত্যাগমন থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল ধরে জীবন যদি একই একঘেয়ে স্রোতে বয়ে যায় এবং সেই জীবনে যদি পূর্ণতার অভাব থাকে, তখন মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়ে দাঁড়ায় অতীতচারণা। কখনও সামাজিক সংযোগের অভাবে, প্রকৃত বন্ধুর অভাবে জীবনে নতুনত্বের অভাব দেখা দেয়। সেই বিচ্ছিন্ন, স্থাণু, নিশ্চল জীবন একই ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে থাকে। *আড়াল* উপন্যাসে দেখা যায় রুচি সেই ঘূর্ণাবর্তে আটকে পড়েছে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে নতুনত্বের স্বাদ তাকে বিভ্রান্ত করে, দ্বিধান্বিত করে কিন্তু নিজস্বতার প্রচণ্ডতা নিয়ে স্বকীয় উপস্থিতি গড়ে তুলতে সাহস যোগায় না। তাই উপন্যাসের শুরু যে আড়াল চিনে নেওয়ার কথা দিয়ে, শেষও অন্য আরেক আড়াল খুঁজে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে—

> এতকালের চেনা আড়াল আজ আবার তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নতুন এক আড়ালে। কাউকে বোঝানো যাবে না এ অনুভূতি কেমন, কতখানি অসহায়তা এই আড়াল থেকে আরও আড়ালে ফিরে যাওয়ায়।[১৮]

চব্বিশ বছরের অন্তর্নিহিত বিদ্রোহ আড়াল থেকেই বারবার উঁকি দেয় কিন্তু প্রকাশ্য ঘোষণার আকারে উঠে আসে না। প্রকাশ্যে বা অন্যের সঙ্গে বাক্যালাপ করার সময় নিশ্চুপ থাকা বা শব্দহীন, সংলাপহীন হয়ে থাকা একাকিত্বের আরেকটি দিক। একাকিত্ব আসলে এমন একটি অভ্যাস, যা মানুষকে একমাত্র নিজের কাছে ছাড়া অন্য আর কারও কাছে

উন্মুক্ত হয়ে সপ্রতিভভাবে ভাব প্রকাশ করতে দেয় না। সেইজন্যই সম্ভবত এত মানসিক ওঠা-পড়ার মাঝেও রুচি তার চব্বিশ বছরের শিক্ষাকেই মাথা পেতে গ্রহণ করেছে—

> রুচি সাড়া দিল না। প্রশ্নের ভিতরেই আছে উত্তরটা; চব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা তাকে যা শিখিয়েছে, কী করে আরও বেশি নিঃশব্দ থাকা যায় তার একটি।[১৯]

মধ্যরাত উপন্যাসেও দেখা যায় তপতী সর্বক্ষণ বৈচিত্র্যহীন অবসাদে বুঁদ হয়ে থাকে। তার বিশ্বাস, দুঃখের আধার সুবিশাল এবং এক জীবনে তা শেষ হওয়ার নয়। সে মা-বাবাকে হারিয়েছে কিন্তু তার জীবনে কখনও স্নেহের অভাব ঘটেনি। সাধন কাকার অপরিমেয় স্নেহ এবং আত্মীয়তা সত্ত্বেও সে নিজেকে অপূর্ণ এবং বঞ্চিতই মনে করে এসেছে। ত্রিশ বছর বয়সের দোরগোড়ায় এসে সে একজন শিক্ষিত, পরিশীলিত যুবক নীতীশের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করে এবং তার সুবাদে একটি কলেজে অধ্যাপনা করার সুযোগও লাভ করে। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পরও তার মনের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। নীতীশ তাকে বিশেষভাবে পছন্দ করে এবং তপতীও তাকে পছন্দই করে। এমনকি নীতীশকে ঘিরে তপতীর জল্পনা-কল্পনার অন্ত্য নেই। তবু নীতীশের সম্মুখীন হলে সে তার স্বভাবসিদ্ধ নীরবতা পালন করে। নীতীশের সুপারিশে তপতীর চাকরি হয়েছে বলে সে নীতীশের স্নেহকেও তার প্রতি অনুগ্রহ বলে মনে করে। শেষাবধি নীতীশ তার দিকে প্রায় সরাসরি হাত বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু তপতী তার অদ্ভুত দুঃখবিলাসিতার অভ্যেস থেকে বেরিয়ে নীতীশের হাত ধরতে পারে না। নীতীশকে কেন্দ্র করে তার মনের মধ্যে নির্মীয়মাণ আন্দোলন মনের গভীরেই রয়ে যায়। অপ্রকাশ্য অনুভূতির সংলাপহীন উপস্থিতি শেষপর্যন্ত তপতীর একাকিত্ব বোধেরই জয় ঘোষণা করে—

> স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে নীতীশকে দেখল তপতী। ঠোঁট দুটো ঈষৎ কাঁপল। কিছু বলতে পারল না।

নীতীশ আরও একটু কাছে এগিয়ে এল, দরজার শার্সিতে হাত রাখল।

'কিছু বলবেন?'

'না...'[২০]

নিঃসঙ্গতার সঙ্গে শূন্যতাবোধের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এই শূন্যতাবোধের পুনরাবৃত্তি রয়েছে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে। উদাহরণ হিসেবে *বহুদূর অভিমান* (২০০২) উপন্যাসের কথা বলা যায়। এখানে দেখা যায়, ব্রতীন এবং অনিশার তেরো বছরের দাম্পত্য ভেঙে যায়। ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণা ব্রতীন এবং অনিশার মধ্যে তো ছিলই, কিন্তু এই ভাঙন সবচেয়ে বেশি পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে তাদের সন্তানের কাছে। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার দু-বছর পর অধ্যাপিকা অনিশা আবার বিয়ে করবার সিদ্ধান্ত নেয়। মায়ের নতুন বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানোর খবর পাওয়ার পর থেকে চোদ্দ বছরের রাজদীপ আরও অসহিষ্ণু হয়ে পড়তে থাকে, নানারকম অসংলগ্নতা দেখা দেয় তার মধ্যে। রাজদীপ যে ক্রমশ বিচ্ছিন্নতার কৃষ্ণগহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে, তা তার কাছের বন্ধু পরমহংসের বয়ান থেকে টের পাওয়া যায়—

> শুধু এটুকু বুঝল পরমহংস, একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে রাজুর জীবনে—মা যে তার, তারই সারাক্ষণের, অহঙ্কারের, অধিকারের জায়গা, এই বোধটা কি আর আগের মতো কাজ করবে ওর মনে? পরমহংসের মনের যেমন অবস্থা হয়েছিল মা মারা যাওয়ার পর—সবই শূন্য-শূন্য, শূন্যের পর শূন্য, তার পরেও শূন্য, তারপরেও শূন্য, আর কিছু নেই, ওর মনেরও কি সেইরকম অবস্থা হবে? পরমহংস জানে না।[২১]

বারংবার 'শূন্যের' ব্যবহার রাজদীপের অস্বাভাবিক অবস্থাকে, বিচ্ছিন্নতার অন্ধকার অসহায়তাকে বিশেষভাবে দেগে দিয়েছে। *সহযোদ্ধা* উপন্যাসের কিছু পঙক্তি তুলে ধরলে বৃষ্টির পটভূমিতে স্মৃতির ঝাপটায়, চেতন-অচেতনের সংযোগস্থলে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো

একা হয়ে যাওয়া অসহায় মানুষের 'শূন্যতাবোধ' কীভাবে তার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করে নেয়, তা অনেকখানি টের পাওয়া যাবে—

> মাঝরাতের বৃষ্টি বড়ো একা করে দেয়। একটানা অঝোর শব্দে জড়িয়ে থাকে এক ধরনের শূন্যতা—স্মৃতি ও ভবিষ্যতের মাঝখানের ব্রিজটা কখন যে জায়গা বদল করে চলে যায় অন্যত্র, হারিয়ে যায় এদিক ওদিকে, হাজার ছুটোছুটি করেও তার হদিশ পাওয়া যায় না কোনও। পারাপার বন্ধ। আর বন্ধ যাওয়া কিংবা ফেরা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে মনে পড়ে দ্বীপ—চেনাজানা পৃথিবীর শেষ জীবিত মানুষ তুমি, জলভুক্ত আত্মীয়তার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছ এখনও। একে সৌভাগ্য মনে কোরো না। অদৃশ্যের ইচ্ছা বড়ো ভীষণ। সে আসছে, প্রস্তুত থাকো তার আবির্ভাবের জন্যে। শূন্যতাবোধের ভিতর সময় থাকে না।[২২]

৯

দিব্যেন্দু পালিতের রচনায় একাকিত্ব যেহেতু নাগরিক একাকিত্ব, তাই তার ভাষাও আদ্যোপান্ত নাগরিক। নির্ভার, নির্মেদ, ক্ষুরধার শব্দ-চয়ন করে যে অনানুষ্ঠানিক ভাষার (informal language) চর্চা তিনি তাঁর সাহিত্যে করেছেন, তাতে সরাসরি কলকাতার মুখের ভাষা উঠে এসেছে। এমনকি বিভিন্ন শ্রেণির, বিত্তের মানুষের বিচিত্র মুখের ভাষাকে তিনি সরাসরি তাঁর রচনা-সংলগ্ন করেছেন।

'ওষুধ' (১৯৯১) গল্পে দিব্যেন্দু পালিত বলেছেন, বস্তিবাসী পারুলের কথা। সে বাড়ি-বাড়ি কাজ করে, সুতরাং তার বয়ান তার ভাষাতেই তুলে ধরেছেন লেখক। মধ্যবিত্ত 'ভদ্দরলোকদের' বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে সে। 'ভদ্দর লোকটি' স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে পারুলকে যথাসম্ভব ভোগ করে তার হাতে 'ওষুধের' নাম করে গর্ভনিরোধক বড়ি ধরিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে বাড়ির মালকিন ফিরে এসে যখন পারুলকে চোর সন্দেহ করে বাড়ি থেকে তাড়াতে যায়, তখন হঠাৎ বাগ্‌বিতণ্ডা, টানা-হ্যাঁচড়ার মাঝে ওই বড়ির

প্যাকেটটি মালকিনের সামনে বেরিয়ে পড়ে। মালকিন যথারীতি আমিষের গন্ধ পেয়ে গর্জে উঠে প্রশ্নবাণ ছোঁড়েন পারুলের দিকে। পারুলও প্রতারিত হয়ে রাগে-অপমানে ক্ষোভ উগরে দেয় তার নিজের ভাষায়—

> ‘কে দিয়েছে! যা, তোর ভাতারকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর কে দিয়েছে!’[২৩]

নিজেদের অসঙ্গতিকে আড়াল করতে কত সহজেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তার থেকে কম ক্ষমতাবান, অনুগত, নিম্নবিত্ত একজন মানুষকে ‘চোর’ অপবাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক করে দেয়, কর্মচ্যুত করে দেয়। মধ্যবিত্তের এই ভাঁওতাবাজির বিরুদ্ধে কোনোরকম রাখ-ঢাক না করেই নিজস্ব ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছে পারুল।

সুবিধেবাদী মধ্যবিত্তের দল যে কতোখানি তাচ্ছিল্যের চোখ দিয়ে নিম্নবিত্তদের দেখে, তার প্রমাণ মেলে ‘জাতীয় পতাকা’ (১৯৮৬) গল্পে। গ্রাম থেকে কটা টাকার লোভে কৃষক হাজারি মণ্ডল তার স্ত্রীকে নিয়ে লাল ঝাণ্ডা হাতে মিছিলে হাঁটতে কলকাতায় আসে। তারপর হাজারো মানুষের ভিড়ে স্ত্রী গোলাপকে হারিয়ে ফেলে। হন্যে হয়ে খুঁজেও সে আর তার স্ত্রীর সন্ধান পায়নি। হাজারি মণ্ডলের স্ত্রীর মূল্য সমাজে কতোটুকু, হাজারি মণ্ডলের মতো রোগা, হাড় জিরিজিরে, খেতে না-পাওয়া পোড়া কপালে লোকটারই বা সমাজে স্থান কোথায়, তা নিজেদের কথায়-বার্তায় বুঝিয়ে দিয়েছে মধ্যবিত্ত বাবু শ্রেণির লোকেরা। তারা যে সমাজে নিতান্তই অপাঙক্তেয় এবং মূল্যহীন সেই বিশ্বাসই ধ্বনিত হয় গুলুবাবুর মতো মালিক শ্রেণির কথায়। গোলাপকে হারিয়ে ফেলার করুণ কাহিনি শোনার পর সে হাজারি মণ্ডলকে বলেছে—

> ‘সোনাগাছিতে গিয়ে খোঁজ কর। দ্যাখ, রাণ্ডি হয়ে গেল কি না!’[২৪]

গল্পের শেষে দেখা যায়, স্ত্রীকে ফেলে রেখে গ্রামে একা ফিরে যেতে পারে না হাজারি মণ্ডল। কলকাতায় থেকে রোজ স্ত্রীর খোঁজ চালায় আর দিন আনে, দিন খায়। স্বাধীনতা দিবসের মতো ছুটির দিনে উঁচু শ্রেণির বাবুরা ছুটি পেয়ে ঘরে আরাম করে, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আহ্লাদে বিলাসিতা করে। কিন্তু হাজারির মতো দিনমজুরের ছুটির দিনে কাজ মেলে না, ফলে উপোস করে কাটাতে হয়। তাই সে খানিক অন্ন-সংস্থানের জন্য পতাকা চুরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বাধীনতা দিবসের আগের রাতে সিল্কের একখানা পতাকা চুরি করতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে যায় সে। তার বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়া নিয়ে কেউ চিন্তিত নয়। তাছাড়া চোর বনে যাওয়ার পর সে সমাজ থেকে বাদ পড়েছে, অসামাজিক হয়ে উঠেছে। সমাজে প্রায় খরচের খাতায় পড়ে, এরকম একজন মানুষকে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে দেওয়ার কথাই সমাজবদ্ধ জনগণের আগে মাথায় আসে। সুতরাং, একজন সামাজিক প্রতিনিধির কণ্ঠে হাজারি মণ্ডলের সমাজ-বিচ্ছিন্নতার কাহিনি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ঘোষিত হয়—

> ‘হারামির বাচ্ছা ঝাণ্ডাটা ধরে আছে কেমন! যেন কত বড়ো শহিদ!’[২৫]

সহযোদ্ধা (১৯৮৪) উপন্যাসে সংবাদপত্রে চাকুরিরত শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত, বিশিষ্ট লেখক হিসেবে পরিচিত আদিত্য রায় তার মেয়ে পৃথার সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে বলেছিলেন—

> আমি আমার চরিত্রদের ভাষায় কথা বলি না—পৃথাকে বলা যেত, চরিত্ররাই কথা বলে আমার ভাষায়। আমারই অভিজ্ঞতা, অভিমান, আবেগ ও দুঃখ থেকে জন্ম নেয় তারা, ক্রমশ গড়ে ওঠে আমারই ভালবাসা ও ঘৃণায়, গুপ্তঘাতকের চক্রান্তে—যা আমি পেতে পারতাম কিন্তু পাইনি, এইভাবে।[২৬]

আদিত্য রায়ের চরিত্রেরা যেমন তার ভাষায় কথা বলে, তেমনি *সহযোদ্ধা* উপন্যাসের আদিত্য রায়ও যে তার স্রষ্টা দিব্যেন্দু পালিতের মনের ভাষায় কথা বলে গেছে, একজন সৎ লেখক হিসেবে তাঁরই চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, ভীতি ও দ্বন্দ্বকে বহন করেছে গোটা উপন্যাস জুড়ে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। নকশালবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই উপন্যাসে দেখা যায়, নকশাল-আন্দোলনকারী শৈবাল মজুমদারকে পুলিশ যেদিন গ্রেফতার করে, সেই রাতেই সে নিহত হয়। পুলিশের তরফ থেকে সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার যথাযথ আয়োজন চলতে থাকে। এদিকে আদিত্য রায় শৈবাল মজুমদারের মৃত্যুর দিনেই চোখের সামনে পুলিশের গুলিতে একটি মৃত্যু সংঘটিত হতে দেখেন কিন্তু তিনি শৈবাল মজুমদারকে চিনতেন না। তাই মৃত ব্যক্তিই শৈবাল কিনা তা শনাক্ত করতে পারেননি। আদিত্য পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার দুশ্চিন্তা এড়িয়ে, যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে দূরে ঠেলে একজন দায়িত্ববান সাংবাদিক ও সৎ বুদ্ধিজীবী হিসেবে সংবাদপত্রে মৃত্যুর ঘটনাটিকে নিয়ে একটি খোলা চিঠি লেখেন। সত্যে অবিচল থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পরও একদিকে পুলিশ-প্রশাসনের চাপ, আরেকদিকে নকশালদের তরফ থেকে 'শ্রেণীশত্রু'র তকমা পেয়ে একজন সুশিক্ষিত, নির্ভীক, আদর্শবান মানুষের সামাজিক স্থান চিহ্নিত করেছে আদিত্য। নিজের এবং পরিবারের জীবন বিপন্ন করে সমাজের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হওয়ার পরও, সে যে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং একা তা নির্দেশ করে তার বক্তব্য—

> উটকো গলায় শ্রেণীশত্রু বলে চ্যাঁচালেই নির্দিষ্ট হয় না মানুষের শ্রেণী। বুদ্ধি পাকলে বুঝতে, আমি কোনও ক্লাসে বিলং করি না; আমি একা—ভীষণ একা। কিংবা আমি একাই একটি ক্লাস। হয়তো আরও কেউ কেউ আছেন আমার মতো, আমি তাদের চিনি না।[২৭]

দিব্যেন্দু পালিত দীর্ঘদিন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগে কাজ করেছেন। সুতরাং বিজ্ঞাপন জগতের, বাণিজ্যিক জগতের বড়ো বড়ো মাথাদের ভাষার সঙ্গেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বেশ কিছু গল্পে-উপন্যাসে সেইসব ক্ষমতাবান উচ্চবিত্তদের একাকিত্বের কথা উঠে এসেছে একেবারে তাদের ভাষায়। এদের ক্ষেত্রে মনোজগতের ভাষা আর বহির্জগতের ভাষার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, দিব্যেন্দু পালিতের লেখায় বিত্তের দিক থেকে, শ্রেণিগত অবস্থানের দিক থেকে যত ওপরের দিকে ওঠা যায়, দেখা যায় মানুষের অন্তর্লোকের ভাষা আর বহির্জগতের কথোপকথনের ভাষার, বক্তব্যের ব্যবধান তত বাড়তে থাকে। *বিনিদ্র* উপন্যাসের দীপ্ত যখন নিজের বিবেকের সঙ্গে নিজে কথা বলে, তখন তার ভাষা, কথাবার্তা একরকম—

> কর্মহীন, ক্লান্ত দিনযাপনে অসম্ভব নির্বান্ধব মনে হয় নিজেকে। এতো দিন ধরে যেসব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দিয়েছে সবার ওপরে, যেন নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই তাদের—লতানে গাছের মতো খুঁটি ছাড়া উঠতে পারে না আকাশে। জীবিকা থেকে দূরে, আলস্যে, কাণ্ড-শুকনো ডালপালা নিয়ে নেতিয়ে পড়ে দীপ্ত। বাড়িতে টেলিফোন আছে, তবু খুঁজে পায় না এমন কোনো সম্পর্ক, যেখানে ডায়াল করে বলতে পারে—দীপ্ত বলছি। নাম ভাবতে মনে পড়ছে সমীরণ, সিন্‌হা, মুস্তাফী, রবি, বিমল, যোশী, সুনীতা—জীবিকার সুতোয় জড়ানো সব নাম, একটিকে টানলেই এসে পড়ে আর একটি, তারতম্যহীন স্লাইডের মতো। কেউই ব্যক্তিগত নয়। কবরখানার ফলকে নাম পড়ার ধরনে একে একে তাদের পেরিয়ে যায় দীপ্ত, দাঁড়ায় না—আকস্মিক চিন্তায় খাড়া হয়ে ওঠে রোমকূপ। ভয় হয়; একদিন হয়তো সে নিজেকেও পেরিয়ে যাবে এইভাবে।[২৮]

বাইরের যেকোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় কিন্তু এই ভাবপ্রবণ, চিন্তাশীল, ভীত দীপ্ত উধাও হয়ে যায়। তখন একজন তীক্ষ্ণ, ধারালো, নিষ্ঠুর, বিবেকহীন, স্বার্থান্বেষী, তথাকথিত স্মার্ট দীপ্তের আবির্ভাব ঘটে। তখন সে নিজের স্বার্থে বঁড়শির চার ব্যবহার করার মতো কৌশল করে অফিসের বিভিন্ন মহিলাকে, এমনকি নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত প্রলুব্ধ

করে। তার অফিসের সহকর্মী সুনীতার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে দিব্যি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কুৎসিত রসালাপ জমিয়ে তোলে—

> ‘ধরো, যদি হঠাৎ লোড-শেডিং হয়?’
>
> সরবার জায়গা নেই। সেটা শোভনও নয়। আঁচলটা ব্লাউজের ফাঁকে গুঁজে নিয়ে সুনীতা বলল, ‘হঠাৎ তা হবে কেন!’
>
> ‘যদি হয়! কী করবে?’
>
> ‘জানি না।’ অপ্রস্তুতভাবে হাসল সুনীতা, ‘আপনি কী করবেন?’
>
> ‘আমি! গেস?’
>
> ‘কী করে বলব!’
>
> স্টপ-স্যুইচে হাত দিল দীপ্ত। একটা ঝাঁকুনি। আশঙ্কায় দেওয়াল আঁকড়ে ধরার বৃথা চেষ্টা করল সুনীতা।
>
> ‘আই’ড প্রেফার টু চেঞ্জ মাই ওয়াইফ্।’[২৯]

১০

প্রতিটি ক্ষেত্রেই দিব্যেন্দু পালিতের রচনার একটি বিশেষ দিক লক্ষণীয়। তিনি সমাজ-পরিবেশ অনুযায়ী, মানুষের মানসিক ও সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী তাঁর লেখার ভাষার মধ্যে সাধারণের মুখের ভাষা, প্রবাদ-প্রবচন, গ্রামের মানুষের মুখে বা শহরের মানুষের মুখে ব্যবহৃত ভাষা, মৌখিক মিশ্র ভাষার ব্যবহার করেছেন। এই ‘code-switching’ টি করবার মতো যথেষ্ট ঔদার্য এবং নমনীয়তা তাঁর ভাষায় রয়েছে। তাছাড়া তাঁর উদ্দেশ্য যে মূলত নাগরিক ভাবধারা বা নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রাকে চিহ্নিত করা, সেটা তাঁর লেখার ভাষা প্রমাণ করে। তিনি নিজেও বেশ কয়েকবার কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, তিনি নগর

এবং নাগরিকতাকে তুলে ধরতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কলকাতা তাঁর লেখার প্রাণ। সব মিলিয়ে দেখলে, কলকাতাকে তাঁর সমূহ রচনার একটি সাধারণ চরিত্র হিসেবেও দেখা যায়। তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে সরাসরি কলকাতার বিচ্ছিন্ন রাস্তাঘাট, নানান জায়গা, পুরোনো হোটেল, দ্রষ্টব্য স্থানের নাম উঠে আসে। অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে *উড়োচিঠি* (১৯৭৮) উপন্যাসের কয়েকটি পঙক্তি তুলে ধরা যেতে পারে—

> গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের উল্টো দিকে বাস থেকে নেমে পল্লব দেখল কেউ কোথাও নেই। তখন সাতটা বাজতে পাঁচ। সাতটা থেকে সোয়া সাতটার মধ্যে সকলেরই এসে পৌঁছনোর কথা। এখান থেকেই দুটো গাড়িতে যাওয়া হবে রাজপুরে পিকনিক স্পটে।[৩০]

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কলকাতার রাস্তাঘাট, কলকাতার মন খারাপ, কলকাতার ঋতু-পরিবর্তন অনুযায়ী কলকাতার মানুষের মনের হদিস যতটা গভীরভাবে দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে-উপন্যাসে ধরা পড়েছে, সেই অনুপাতে কলকাতার উৎসব-অনুষ্ঠান, বা কলকাতার নিজস্ব সাংস্কৃতিক উদযাপনের কথা প্রায় আসেইনি। ঘটনা প্রসঙ্গে কলকাতার রাস্তায় চলে যাওয়া মিছিল, মিটিং, রাজনৈতিক আড্ডা, রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের আলাপচারিতা, মানসিক আন্দোলনের কথা এসেছে কিন্তু সরাসরি রাজনৈতিক ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা তাঁর লেখায় চোখে পড়ে না। দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যে রাজনীতি অত্যন্ত গভীর থেকে নেপথ্যে অবস্থান করে চাপা গলায় ঘটনা ও চরিত্রদের নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতির উপস্থিতি এক্ষেত্রে অনেকটা *রক্তকরবী*-র (১৩৩১) রাজার মতো। অন্তরালে থেকে রাজনীতি চাপা স্বরে ধ্বনি তোলে, কিন্তু তার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ উপস্থিতি দেখা যায় না। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদেরও বাহ্যিক বর্ণনা রয়েছে কিন্তু তা কেবল অন্তরের অবস্থান দেখানোর তাড়নায়। দিব্যেন্দু পালিতের স্ত্রী শ্রীমতী কল্যাণী পালিতের কথার সূত্র ধরে বলা যায়, তাঁর স্বভাবজ অন্তর্মুখীনতার ব্যাপ্তি ঘটেছে তাঁর

লেখার সর্বত্র। তিনি মানুষের বাহ্যিক রূপবৈচিত্র্য, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, আনন্দ-উৎসব ইত্যাদি তুলে ধরার চেয়ে মানুষের মনের গভীর, গূঢ় প্রদেশে কী চলছে, সেইটা দেখানোতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। ঘটনার তুলনায় ঘটনার প্রভাব তাঁর লেখায় অধিক গুরুত্ব পায়। তাই কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনার ঘনঘটা না দেখিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, সেইসব ঘটনার নিরিখে তাঁর চরিত্রদের মানসিক চলন, মানসিক গড়ন, তাদের মানসিক বিচ্ছিন্নতার কাহিনি। এই প্রসঙ্গে দিব্যেন্দু পালিতের সমসাময়িক লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের (১৯৩০-২০১২) বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ—

> তখন হয়েছিল কি আমরা আমাদের প্রজন্ম বলতে যে লেখকদের কথা বলছি তাঁদেরকে সময় এমন একটা খাঁচাকলে বন্ধ করে ফেলেছিল যেটা যে যার নিজের চোখ দিয়ে দেখছে। আসলে সেটা হচ্ছে একটা বিপন্নতার বোধ। সেই বিপন্নতা বোধের উৎপত্তি মানুষের ভিতরকার নিঃসঙ্গতা এবং বাইরের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব কিছুই মনের মতো নয়। এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যে ব্যক্তিসত্তা প্রতিমুহূর্তে বিদ্ধ হচ্ছিল সেই জর্জর অবস্থার কথা দিব্যেন্দু খুব গুছিয়ে লিখতে পারত।...এতকাল ধরে সাহিত্যিকরা যে নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে সাহিত্য রচনা করে এসেছেন সেই নিঃসঙ্গতার রূপ তাদের চোখে ধরা পড়েও পড়েনি, কারণ এই নিঃসঙ্গতা আধুনিক সময়েরই একটা নতুন ধরনের প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়াটা খুব সুন্দরভাবে এবং গুছিয়ে, ভাষাকে অত্যন্ত শাণিত ও মার্জিত করে এবং অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দিব্যেন্দু লিখতে পেরেছে। ঐভাবে কিন্তু কেউ লিখতে পারেনি। সমসাময়িক অনেকেই লিখেছেন, ভালোই লিখেছেন, কিন্তু দিব্যেন্দুর লেখার মধ্যে বিশেষ একটা সমাজ উঠে এসেছে। আমার মনে হয় এটা এসেছে সেই প্রয়োজনে যে আধুনিকতার ভেতরে urbanism কথাটা খুবই প্রয়োজনীয় কথা। মানে urbanism কে সে নিজে আত্মস্থ করেছে। সে একেবারেই শহরের মানুষ। সে আমার মতো মফঃস্বলের মানুষ নয়। আমার মত এত প্রসারিত অর্থাৎ চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা শিথিল মানুষ নয়। তার সত্তা যেন একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এবং তার চিন্তা, চেতনা সমস্ত কিছুই এই urbanism এর উপর দাঁড়িয়ে কাজ করছে। কাজেই তার লেখার মধ্যে আমরা

নাগরিক মানুষ আর সেই মানুষের সামাজিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক বদলে যাওয়ার ছবি দেখতে পাই, যে ছবি আসলে প্রত্যেকের বিপন্নতার ছবি, নিঃসঙ্গতার ছবি।[৩১]

কলকাতা শহরের নাম উচ্চারিত হলেই যে প্রাদেশিক এবং ভিনদেশী মানুষজনেরা রসগোল্লা, ফজলি আম আর দুর্গাপূজা-কালীপূজা-জগদ্ধাত্রীপূজার সমারোহ নিয়ে বারো মাসে তেরো পার্বণের কথা ভাবে, সেই কলকাতাকে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যে। নগর কলকাতার সংস্কৃতি কেবল উৎসব-অনুষ্ঠানের আলোর মালা দিয়ে তৈরি হয় না, বরং সেই আলোর ঝলকানিতে ঢাকা পড়ে যাওয়া লুকোনো অন্ধকার মনের ছবিটাকে টেনে বার করে আয়নার মতো নাগরিকদের চোখের সামনে তুলে ধরাই ছিল সাহিত্যিকের মুখ্য উদ্দেশ্য। লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় দিব্যেন্দু পালিতের রচনাকে ‘দি অ্যানাটমি ক্লাস অব্ ডক্টর দিব্যেন্দু পালিত’ আখ্যা দিয়েছেন। কারণ তাঁর লেখা সাধারণ সৃজনশীল বিন্যাস নয়, তা কঠোর, নিষ্ঠুর, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে মানুষের বুক চিরে তার গভীর থেকে গভীরতম সত্যটি তুলে ধরে দেখায়। হয়তো কিছুক্ষেত্রে দিব্যেন্দু পালিতের রচনা একঘেয়ে, পুনরাবৃত্তিপ্রবণ মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি নগর জীবনের ঐ একঘেয়ে একাকিত্বের শূন্যতার দিকটিই সচেতনভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় দুজনেই জানিয়েছেন, দিব্যেন্দু পালিত জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য লেখেননি। তাই সাধারণ মানুষকে বিনোদন যোগানোর মতো উপাদান তাঁর লেখায় বিরল। যে মানসিক গভীরতা এবং অন্তর্নিহিত দর্শন তাঁর লেখায় উঠে আসে তা গভীর মনোযোগ এবং অধ্যবসায় দাবি করে। তাই তাঁর লেখা কলকাতাকেন্দ্রিক হলেও, এগুলি যতটা কলকাতা শহরের দলিল, তার চেয়ে বেশি কলকাতা শহরের মনস্তাত্ত্বিক দলিল। সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে দিব্যেন্দু পালিত এই আলোচনাটির সম্মুখীন হন—

প্র: আপনি যে-সময়টার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, আপনার উপন্যাসগুলি সেই সময়ের এক-একটি মনস্তাত্ত্বিক দলিল। বলা যায়, একধরনের সাইকোলজিক্যাল হিস্ট্রি বা ন্যারেটিভ। উপন্যাস লেখার সময় নিজেকে ভাষাশিল্পী হিসেবে দেখেন, না সময়ের ধারাভাষ্যকার হিসেবে?

উ: ভাষাশিল্পী হিসেবেই দেখি নিজেকে। সময়ের ধারাভাষ্যকার হিসেবে ততটা নয়। আমি উপন্যাস লিখেছি মূলত আমার সাহিত্যভাবনা, ভাষাভাবনা থেকেই।[৩২]

দিব্যেন্দু পালিত নিজেকে কেবল ভাষাশিল্পীর তকমা দিলেও তাঁর অনুরাগী পাঠকদের তাঁর কাছে কিছু বাড়তি দাবি থাকতেই পারে। সমকালীন সমাজ-মনকে পড়বার এই বিরল দক্ষতা এবং সেই দুস্থ, পীড়িত, একাকী মনকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ার নৈপুণ্য তাঁকে 'সমকালীন সময়ের মনস্তাত্ত্বিক ধারাভাষ্যকার' হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

তথ্যসূত্র:

১। সাক্ষাৎকার গ্রহণ: নন্দিতা রায়, 'কল্যাণী পালিত-এর সাক্ষাৎকার', প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি—মার্চ ২০০৩, গল্‌ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ৬৯-৭০

২। সাক্ষাৎকার গ্রহণ: সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দিব্যেন্দু পালিত', দত্ত, হর্ষ (সম্পা.), *বইয়ের দেশ,* জানুয়ারি—মার্চ ২০১৬, এবিপি প্রাঃ লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ১২১ – ১২২

৩। দিব্যেন্দু পালিত, 'সম্পর্ক', *দশটি উপন্যাস ১,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ১১৩

৪। তদেব, পৃ. ১২১-১২২

৫। তদেব, পৃ. ১৩০

৬। দিব্যেন্দু পালিত, 'আড়াল', *দশটি উপন্যাস ২,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৫৩-১৫৪

৭। দিব্যেন্দু পালিত, 'ঘৃণা', *গল্পসমগ্র ১,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ৩২৯-৩৩০

৮। দিব্যেন্দু পালিত, 'স্বপ্নের ভিতর', *দশটি উপন্যাস ২,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৪৩৮-৪৩৯

৯। তদেব, পৃ. ৫৯৩

১০। দিব্যেন্দু পালিত, 'মধ্যরাত', *প্রথম পাঁচটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০০২, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩২২

১১। দিব্যেন্দু পালিত, 'বিনিদ্র', *দশটি উপন্যাস ১,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ৩০১-৩০২

১২। দিব্যেন্দু পালিত, 'অবৈধ', *দশটি উপন্যাস ২,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৫৬৫

১৩। দিব্যেন্দু পালিত, 'আমরা', *দশটি উপন্যাস ১,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ১৪৩

১৪। তদেব, পৃ. ৭২

১৫। তদেব, পৃ. ১৪৩

১৬। তদেব, পৃ. ১৭১-১৭২

১৭। দিব্যেন্দু পালিত, 'আড়াল', *দশটি উপন্যাস ২,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৪৭

১৮। তদেব, পৃ. ২০৪

১৯। তদেব, পৃ. ১৯৭

২০। দিব্যেন্দু পালিত, 'মধ্যরাত', *প্রথম পাঁচটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০০২, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৫৬

২১। দিব্যেন্দু পালিত, *বহুদূর অভিমান,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৭১-৭২

২২। দিব্যেন্দু পালিত, 'সহযোদ্ধা', *দশটি উপন্যাস ২,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৫৯

২৩। দিব্যেন্দু পালিত, 'ওষুধ', *গল্পসমগ্র ২,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৩৯৮

২৪। তদেব, পৃ. ২০৬

২৫। তদেব, পৃ. ২১২

২৬। দিব্যেন্দু পালিত, 'সহযোদ্ধা', *দশটি উপন্যাস ২,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৬

২৭। তদেব, পৃ. ৬৭

২৮। দিব্যেন্দু পালিত, 'বিনিদ্র', *দশটি উপন্যাস ১,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ২৮৬

২৯। তদেব, পৃ. ২৭৮-২৭৯

৩০। দিব্যেন্দু পালিত, 'উড়োচিঠি', *দশটি উপন্যাস ১,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ৪৯৮

৩১। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, 'চ্যালেঞ্জ নিতে সমর্থ হয়েছে', প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি—মার্চ ২০০৩, গল্ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ১১

৩২। সাক্ষাৎকার গ্রহণ: সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দিব্যেন্দু পালিত', হর্ষ দত্ত (সম্পা.), *বইয়ের দেশ*, জানুয়ারি—মার্চ ২০১৬, এবিপি প্রাঃ লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ১২৪

পরিশেষ

> সোনার পাথরবাটি সেও কী সম্ভব? হয় সোনার বাটি, নতুবা পাথর বাটি, কোনমতেই সোনার পাথরবাটি হওয়া সম্ভব নয়। 'লোকসংস্কৃতি' বলতে আমরা বুঝি লোকজীবন সম্পৃক্ত সংস্কৃতি। 'লোক'কে—না অপরিচিত ব্যক্তি নয়, un identified person নয়, লোকসংস্কৃতির 'লোক' হল সমষ্টির প্রতিনিধি, কখনও ব্যক্তিবিশেষ নয়, 'members of an integrated society', সংহত সমাজের সদস্য এরা। এই সংহত সমাজের হদিশ মিলবে শহরে নয়, গ্রামে, আরও বিস্তারিত করে বললে বলতে হয় মূলত কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য জীবন। একই রূপ ভৌগোলিক পরিবেশে কম-বেশি একই রূপ জীবন দর্শনের অধিকারী হয়ে, একই রূপ জীবন চর্যায় অভ্যস্ত মানুষরাই হন লোক। তাদের বিশ্বাস সংস্কার, আহার্য, বেশভূষা, জীবিকা, অনুসৃত উৎসব, বিভিন্ন প্রাণিত শিল্পকলা, ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি সবেতেই একটা ঐক্যের উপস্থিতি। শহরের জীবন সেই অর্থে সমষ্টির নয়, এখানকার মানুষজন সব ব্যক্তিবিশেষ। এখানকার জীবন cosmopolitan, বহুজাতিক বা আন্তর্জাতিক যাই বলি না কেন।[১]

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি-গবেষক এবং লেখক বরুণকুমার চক্রবর্তীর এই বক্তব্যে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কেন নগর জীবনে সমষ্টির কোনও জায়গা নেই। এখানে প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র। পৃথক পৃথক অস্তিত্ববাহী এই মানুষগুলোর আবেগ-অনুভবও যে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, সে কথা বলা আতিশয্যমাত্র। শহর কলকাতা এবং কলকাতার সংস্কৃতির ইতিহাস চর্চিত হয়েছে হরিদাস মুখোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, রাধারমণ মিত্র, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, অতুল সুর, রথীন মিত্র, অনুপ মতিলাল, সুভো ঠাকুর, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো আরও অনেক বিদ্বজ্জনের কলমে। কলকাতার মানুষের ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস, নগর জীবনযাপনের করুণ কাহিনি নানান গল্পে-উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে নানান রূপে, নানান আঙ্গিকে। মহানগর কলকাতার চরিত্র ঐতিহাসিক

এবং গবেষকদেরও আগে সাহিত্যে তুলে ধরেছিলেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—১৮৮৭) তাঁর *কলিকাতা কল্পলতা* গ্রন্থে, যার আনুমানিক রচনাকাল ১৮৫১ থেকে ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। তবে এর আগেও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭—১৮৪৮) *কলিকাতা কমলালয়* (১৮২৩), *নববাবু বিলাস* (১৮২৫), *নববিবি বিলাস* (১৮৩১) এই তিনটি গ্রন্থে কলকাতার সমাজচিত্র ধরা পড়েছে। এরপর ক্রমান্বয়ে কলকাতা শহর প্যারিচাঁদ মিত্রের (১৮১৪—১৮৮০) *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০—১৮৭০) *হুতোম প্যাঁচার নক্সা* (১৮৬২/১৮৬৪) ইত্যাদি নক্সাজাতীয় উপন্যাস বাহিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪—১৮৯৪) *বিষবৃক্ষ* (১৮৭২) উপন্যাসে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে ধরা দেয়। এরপর কলকাতা প্রায়শই স্বমহিমায় উপন্যাসে ভাস্বর হয়েছে। উনিশ শতক এবং বিশ শতক জুড়ে কলকাতাকে প্রেক্ষাপট হিসেবে নির্বাচন করে লেখা বহু উপন্যাসের মধ্যে কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের একটি তালিকা সারণি আকারে দেওয়া হল—

ঔপন্যাসিক		**উপন্যাস**
১	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪—১৮৯৪)	বিষবৃক্ষ (১৮৭২) রজনী (১৮৭৭)
২	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৮—১৯২২)	শৈশব সহচরী (১৮৭৮)
৩	রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯)	সংসার (১৮৮৬)
৪	শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৮—১৯১৯)	যুগান্তর (১৮৯৫) নয়নতারা (১৮৯৯)
৫	ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২—১৯১৬)	হরিদাসের গুপ্তকথা (১৮৯৭)

ঔপন্যাসিক		উপন্যাস
৬	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১—১৯৪০)	লীলা (১৮৯২) তমস্বিনী (১৯০০)
৭	স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫—১৯৩২)	কাহাকে? (১৮৯৮)
৮	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)	চোখের বালি (১৯০৩) গোরা (১৯১০) চতুরঙ্গ (১৯১৬) ঘরে বাইরে (১৯১৬) চার অধ্যায় (১৯৩৪)
৯	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮—১৯৩৮)	চরিত্রহীন (১৯১৭)
১০	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩—১৯৩২)	আরতি (১৯২৪)

এই সমস্ত উপন্যাসে কলকাতা মূলত উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবে, উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিকাশের সহায়ক হিসেবে সাহিত্যে উঠে এসেছে। কিন্তু কথাসাহিত্যের চরিত্র হিসেবে কলকাতার আত্মপ্রকাশ আরও পরবর্তী সময়ের ঘটনা। তা সম্ভব হয়েছে মুখ্যত কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের হাত ধরে। বস্তুত সেখানেই প্রথম কলকাতার নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মানুষেরা বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে আবির্ভূত হয় প্রধান বা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে। কলকাতাকে প্রাণকেন্দ্র হিসেবে নির্বাচন করে স্পন্দিত হওয়া কল্লোল যুগ এবং

তার পরবর্তীকালে দিব্যেন্দু পালিতের সময়কাল পর্যন্ত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের নাম এখানে উল্লেখ করা জরুরি। সেই সংক্রান্ত একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল—

ঔপন্যাসিক		উপন্যাস
১	প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—১৯৮৮)	পাঁক (১৯২৬) মিছিল (১৯৩১)
২	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪—১৯৫০)	অপরাজিত (১৯৩২) অনুবর্তন (১৯৪২)
৩	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১০—১৯৫৬)	চিহ্ন (১৯৪৭)
৪	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮—১৯৭১)	মন্বন্তর (১৯৪৪)
৫	জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯—১৯৫৪)	কারুবাসনা (১৯৩৩) মাল্যবান (১৯৪৮) সুতীর্থ (১৯৪৮)
৬	প্রমথনাথ বিশী (১৯০১—১৯৮৫)	কেরি সাহেবের মুন্সী (১৯৫৯)
৭	প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫—১৯৮৩)	তুচ্ছ (১৯৫০)
৮	নীহাররঞ্জন গুপ্ত (১৯১১—১৯৮৬)	তালপাতার পুঁথি (১৯৬০)
৯	বিমল মিত্র (১৯১২—১৯৯১)	সাহেব বিবি গোলাম (১৯৫০) কড়ি দিয়ে কিনলাম (১৯৬২) একক দশক শতক (১৯৭০)

ঔপন্যাসিক		উপন্যাস
১০	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২—১৯৮২)	বারো ঘর এক উঠোন (১৯৫৬)
১১	নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬—১৯৭৫)	চেনামহল (১৯৫২)
১২	বুদ্ধদেব বসু (১৯১৯—১৯৭৪)	রাত ভ'রে বৃষ্টি (১৯৬৭)
১৩	সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০—১৯৮৫)	কিনু গোয়ালার গলি (১৯৫০)
১৪	বিমল কর (১৯২১—২০০৩)	দেওয়াল (১৯৫৬, ১৯৫৮, ১৯৬২ সালে ক্রমান্বয়ে 'ছোটো ঘর', 'ছোটো মন, 'খোলা জানলা' তিন পর্বে রচিত)
১৫	রমাপদ চৌধুরী (১৯২২—২০১৮)	খারিজ (১৯৭৪) লজ্জা (১৯৭৫) হৃদয় (১৯৭৬) বীজ (১৯৭৭)
১৬	সমরেশ বসু (১৯২৪—১৯৮৮)	বিবর (১৯৬৫) প্রজাপতি (১৯৬৭) স্বীকারোক্তি (১৯৬৭) পাতক (১৯৬৯)
১৭	অসীম রায় (১৯২৭—১৯৮৬)	গোপাল দেব (১৯৫৫)
১৮	মতি নন্দী (১৯৩১—২০১০)	দ্বাদশ ব্যক্তি (১৯৬০) বারান্দা (১৯৬২) কোনি (১৯৬৫) নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান (১৯৬৯)

ঔপন্যাসিক		উপন্যাস
১৯	শংকর (জন্ম: ১৯৩৩)	কত অজানারে (১৯৫৪) চৌরঙ্গী (১৯৬২)
২০	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩—২০০১)	বৃহন্নলা (১৯৬১) অনিলের পুতুল (১৯৬২) হাওয়াগাড়ি (১৯৯৩)
২১	সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩—২০০৫)	কলকাতার দিনরাত্রি (১৯৯৬)
২২	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪—২০১২)	আত্মপ্রকাশ (১৯৬৬) সেই সময় (১৯৯১) প্রথম আলো (১৯৯৬)
২৩	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (জন্ম: ১৯৩৫)	ঘুণপোকা (১৯৬৭)
২৪	বাণী বসু (জন্ম: ১৯৩৯)	শ্বেত পাথরের থালা (১৯৯০) একুশে পা (১৯৯৪)
২৫	সমরেশ মজুমদার (জন্ম: ১৯৪২)	দৌড় (১৯৭৬)
২৬	তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম: ১৯৪৭)	রেসকোর্সে রেমি (১৯৯২) শিকড়ের খোঁজে মানুষ (১৯৯৩)
২৭	সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০—২০১৫)	কাচের দেওয়াল (১৯৯৩) ভাঙনকাল (১৯৯৬) দহন (১৯৯৬) গভীর অসুখ (১৯৯৮)

ঔপন্যাসিক		উপন্যাস
২৭	শচীন দাশ (১৯৫০—২০১৬)	দুই জীবনের গল্প (২০০০)
২৮	স্বপ্নময় চক্রবর্তী (জন্ম: ১৯৫১)	অবন্তীনগর (২০০২) নাটাদা (২০১০)
২৯	নলিনী বেরা (জন্ম: ১৯৫২)	ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ফেরিওয়ালা (২০০২)
৩০	জয়ন্ত দে (জন্ম: ১৯৬৪)	নতজানু (২০১৫)

এরপরও উনিশ শতক থেকে একুশ শতকের সূচনালগ্ন পর্যন্ত আরও বহু কলকাতা-কেন্দ্রিক উপন্যাস এই তালিকায় অনুল্লিখিত রয়ে গেল। বাংলা ছোটোগল্পের আঙ্গিকেও কলকাতাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অসংখ্য গল্প। তবে সেই সব গল্পে বিশ শতকের পূর্বের কলকাতার ছবি বড়ো একটা ধরা পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে মূলত গ্রাম-বাংলার প্রাকৃতিক ছাঁচই প্রাধান্য পেয়েছে। রবি ঠাকুরের অন্তিম পর্বের ফসল *তিনসঙ্গী* (১৩৪৭) গল্পগ্রন্থে তিনটি গল্প প্রকাশিত হয়, ‘রবিবার’, ‘শেষকথা’ এবং ‘ল্যাবরেটরি’। এই তিনটি গল্পের ভাষা রীতিমত নাগরিক এবং বিষয়ও বাস্তবসম্মত। তবে এই গল্পগুলি নাগরিক বৈদগ্ধ্যসম্পন্ন হলেও এগুলিতে কলকাতাকে চরিত্র হিসেবে পাওয়া যায় না। কলকাতাকে চরিত্র হিসেবে আঁকড়ে ধরে আবারও প্রেমেন্দ্র মিত্রই তাঁর প্রথম গল্পটি লিখে ফেলেন ‘শুধু কেরানী’ (১৯২৪)। এরপর থেকে কিন্তু বারবার কলকাতা বহু লেখকের গল্পের প্রেক্ষাপট হিসেবে, বহু গল্পের

প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বাংলা সাহিত্যে ধরা দিয়েছে। এই ধরনের উল্লেখযোগ্য গল্পের সংখ্যা এতটাই বেশি যে স্বল্প পরিসরে সেসব গল্পের নাম তালিকাবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য-সাধনা মূলত কলকাতা শহরকে ঘিরেই। *বৃষ্টির পরে* (১৯৭৪) উপন্যাস এবং 'দুঃসময়' (১৯৬১), 'একটি মন্দিরের জন্ম ও মৃত্যু' (১৯৭৫)-এর মতো আরও দু-একটি গল্পে ভাগলপুরের অন্ধকার ও আচ্ছন্নতায় জড়ানো নির্জনতার ছবি উঠে এসেছে। তবে সার্বিকভাবে বিচার করলে দিব্যেন্দু পালিত নিঃসন্দেহে মূলত কলকাতার কথাকার। কলকাতার প্রেক্ষাপটে এই অসংখ্য লেখালেখির পরও তাঁর গল্প-উপন্যাস আলাদা করে পড়তেই হয়। কারণ তাঁর কথাসাহিত্য কলকাতাকে দেখার, চেনার এবং জানার নতুন কিছু দিককে উন্মোচন করে। তাঁর পরে অবশ্য সেইসব দিকগুলিকে নিয়ে আরও অনেক সাহিত্যিক চর্চা হয়েছে। তবে দক্ষিণ কলকাতার এই ফিটফাট, চটপটে চেহারার অন্তরে যে গভীর কালিমার আস্তরণ রয়েছে, সেই কালিমালিপ্ত, কলুষময়, দীন অন্তরটিকে সাহিত্যের অঙ্গনে উন্মুক্ত করে পরিবেশন করবার প্রথম ও প্রধান কৃতিত্ব দিব্যেন্দু পালিতকেই দিতে হয়। তাঁর সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী এবং মতি নন্দীও কলকাতার নাগরিকদের নিয়ে সাহিত্য-নির্মাণ করেছেন। তবে রমাপদর সাহিত্যকীর্তির বিষয় কেবল কলকাতাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা মফঃস্বল অঞ্চলেও যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছে। তাছাড়া রমাপদ মূলত মধ্যবিত্ত বাঙালিদের নিয়ে সাহিত্যানুশীলন করেছেন। দিব্যেন্দু পালিত নিজে জানিয়েছেন, কথাসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। এঁরা অনেকেই দিব্যেন্দুর গল্পের প্রথম পাঠক এবং প্রথম সমালোচকও বটে। এঁদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা, দ্বিধাহীন সুস্পষ্ট সমালোচনা, দুর্লভ স্নেহ এবং সৎ নিরপেক্ষতা লাভ করে দিব্যেন্দু পালিত যারপরনাই আহ্লাদ প্রকাশ করেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়। দিব্যেন্দু

পালিত মুখ্য তিনরকম বিত্তের মানুষদের নিয়েই সাহিত্য নির্মাণ করেছেন। অন্যদিকে সন্তোষকুমার ঘোষ এবং মতি নন্দীর কথাসাহিত্যে উত্তর কলকাতার অলিগলি এবং সেখানকার বাসিন্দাদের জীবনের যে বর্ণময় জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে, তা দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যে বিরল। তিনি কলকাতায় আসার পর দীর্ঘদিন বিপণন, বিজ্ঞাপন এবং জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে ক্ল্যারিয়ন ম্যাকান অ্যাডভার্টাইজিং, আনন্দবাজার সংস্থা এবং স্টেট্স্‌ম্যানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই যে জগৎটাকে তিনি দীর্ঘ সময় জুড়ে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, সেই জগৎটা সম্পর্কে বিশ্লেষণই তাঁর সাহিত্যে বেশি। দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য প্রসঙ্গে পবিত্র সরকার (জন্ম-১৯৩৭) লিখেছিলেন—

> যে ধরনের লেখা উনি লেখেন, সেরকম অন্যেরা লেখেন না।...তার মধ্যে কবিত্ব থাকে, থাকে বর্ণনকুশলতাও। মনে হয় না যে একটাও এলোমেলো বাক্য বা একটা শিথিল পংক্তি বা একটা অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা কোথাও তার গল্পে বা উপন্যাসে আছে। সবই ছোটো ছোটো আকারের উপন্যাস। আর যে কথাটা আমার তাঁর উপন্যাস সম্বন্ধে বিশেষ করে মনে হয়েছে যে তাঁর চরিত্রেরা বেশিরভাগই আমাদের চেনাশোনা পৃথিবীর লোক। মধ্যবিত্ত কখনও বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত মানুষের কথাই তিনি বলেছেন।[২]

দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য-কর্মের অনন্যতার জায়গা প্রধানত ৮ টি—

- নবগঠিত নিউক্লিয়ার পরিবারের গল্প। শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ, জা, ভাসুর, ভাজ ও অন্যান্য পারিবারিক সদস্যের মন্তব্য বা অস্তিত্ব হয়তো টের পাওয়া যায়, তবে তাদের সরাসরি জোরালো উপস্থিতি নেহাতই কম।
- গ্রামাঞ্চলের প্রসঙ্গ নেই, মফঃস্বলের ক্ষীণ উপস্থিতি, মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক রচনা, তবে তার মধ্যেও মূলত দক্ষিণ কলকাতার প্রসার।

- বিজ্ঞাপনের জগৎকে প্রথম বাংলা সাহিত্যের দরবারে বিশদে নিজস্ব বিশেষণসহ হাজির করছেন।
- একেবারে নিম্নবিত্ত দম্পতির কথা উপন্যাসে প্রায় নেই। গল্পে রয়েছে তবে নিম্নবিত্ত দম্পতির একত্র উপস্থিতি নেই। তাদের বিচ্ছিন্নতার কাহিনি রয়েছে।
- অর্থ এবং অর্থের লালসাই যে বিচ্ছিন্নতার গোড়ার কারণ, সেটা দাম্পত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন।
- মহিলাদের প্রতি দিব্যেন্দু পালিতের দরদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের মনের বিচার-বিশ্লেষণ করার বিরল ক্ষমতার অধিকারী তিনি। কখনো-কখনো তাঁর সাহিত্য-পাঠক হিসেবে মনে হতেই পারে, এ যেন পুরুষ নয়, কোনও মহিলার বিশ্লেষণ।
- শিক্ষিত কর্মরত মহিলাদের মেসবাড়িকে কেন্দ্র করে সম্ভবত তিনিই প্রথম বাংলা উপন্যাস লিখছেন, *মধ্যরাত* এবং *স্বপ্নের ভিতর*।
- দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তুতে, ভাষা-ব্যবহারে বৈচিত্র্য, সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুবই কম। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস তাঁর লেখার প্রাণ। তাছাড়া অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশের পরিবর্তে চরিত্রদের সম্পর্কে দীর্ঘ বিশ্লেষণ, চরিত্রদের অনুভূতি নিয়ে কাটাছেঁড়া করতেই তিনি অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন।

সুনিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং পরিমিত বাকসমৃদ্ধ নাগরিক মনের চোরাগলির গোপন সত্য তুলে ধরার নির্ভীক প্রয়াসের জন্য সমগ্র সাহিত্য জীবনকে নিবেদন করা, নিঃসন্দেহে পাঠকদের মুগ্ধ করে। তাছাড়া বিশ শতকের নিরাশাবাদী, হতাশ, শুভবোধ সম্পর্কে

অবিশ্বাসী নাগরিক মনের যে দলিল নিরাভরণভাবে বাংলা সাহিত্যে পেশ করেছেন দিব্যেন্দু পালিত, তাতে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে কলকাতার নাগরিক মনের খোঁজ পেতে গেলে দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্য অবশ্যপাঠ্য। তবু তাঁর কথাসাহিত্যের অনুরাগী হিসেবে তাঁর প্রতি কিছু অনুযোগ তৈরি হয়—প্রথমত, দিব্যেন্দু পালিত তাঁর নিজের সম্পর্কে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এবং তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখা 'কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান'-এ যে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন, তাতে পাঠক হিসেবে এ কথা জানবার আগ্রহ হতেই পারে, কেন তিনি ভাগলপুরের কাহিনি আরও বিস্তৃত আকারে তাঁর সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করাননি। এ বিষয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও তাঁর কাছে বন্ধুসুলভ আর্জি জানিয়েছিলেন—

> ওকে আমি একটা আত্মজীবনীমূলক লেখা লেখবার জন্য বলেছিলাম। ও যখন ভাগলপুরে ছিল, খুব কালারফুল জীবন ছিল ওর। বহুরকমের মজার ঘটনা, মজার চরিত্র ও দেখেছে। কিন্তু সেগুলো নিয়ে কখনও লেখেনি। লেখকদের কতগুলো পছন্দের ব্যাপার আছে। যে কি নিয়ে লিখব। কাদের নিয়ে লিখব আর কাদের নিয়ে লিখব না। আমি দেখেছি যে ও সযত্নে ওর বাল্য স্মৃতিগুলিকে বর্জন করে। সেই সময়কার দেখা চরিত্রগুলোকে নিয়ে কখনই লেখে না। কিন্তু ওর কাছে যখন ওর ছেলেবেলার ঘটনাগুলো শুনি, খুব মজা লাগে, খুব উপভোগ করি। ভাগলপুরের যে স্মৃতি ওর আছে তা নিয়ে বেশ বড়োসড়ো একটা ভাল উপন্যাস তৈরি হতে পারে। কিন্তু দিব্যেন্দু ওর লেখায় কখনও সেইসব স্মৃতির ছায়া পড়তে দেয়নি। ওর ভেতরে একটা অদ্ভুত একক নাগরিকত্ব আছে। অনেক লেখকই শহরের মানুষদের নিয়ে লিখেছেন। শহুরে জীবনযাত্রা নিয়ে লিখেছেন। যেমন অন্নদাশংকর ছিলেন। অমিয়ভূষণ ছিলেন। অমিয়ভূষণকে এই অর্থে আরবান বলছি যে উনি লিখেছেন গ্রামগঞ্জ নিয়ে কিন্তু লেখার ধরনটা ছিল নাগরিক। বুদ্ধিদীপ্ত। তারাশংকর যেমন গ্রামগঞ্জ নিয়ে লেখার সময় মাঠে ময়দানে নেমে যাচ্ছেন, অমিয়ভূষণ তা করছেন না। মাঠে ময়দানের লোককে নিয়েই লিখছেন, কিন্তু লিখছেন একেবারে নাগরিক ভাষায়। তাঁর লেখা গ্রামকে তুলে আনছে, প্রাকৃত জনকে তুলে আনছে, কিন্তু

বিচার বিশ্লেষণটা হচ্ছে নাগরিক ভাষায়। দিব্যেন্দুর লেখা সেরকম নয়। দিব্যেন্দু বেশির ভাগই নাগরিক চরিত্র নিয়ে লিখেছে। নাগরিক জীবন নিয়ে লিখেছে। বিশেষ করে কলকাতা নিয়ে।[৩]

আসলে দিব্যেন্দু পালিতের স্বনির্বাচিত বিষয়ে বৈচিত্র্যের অভাব থাকার কারণ তিনি ঘটনাবহুলতার পরিবর্তে চরিত্রদের অন্তর্দর্শন বিচার-বিশ্লেষণে বেশি আগ্রহী ছিলেন। গল্প ফাঁদার যে দিকটা পাঠক টানতে পারে, পাঠককে মজিয়ে রাখতে পারে, সেই দিকটা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তাঁর কোনও উৎসাহ ছিল না। বরঞ্চ তাঁর সুগভীর মাইক্রোস্কোপিক অন্তর্বীক্ষণ পাঠকের কাছে বাড়তি মনোযোগ দাবি করে। কারণ জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য তিনি লিখতেন না। তাঁর স্বভাবজ অন্তর্মুখীনতা তাঁর সাহিত্যেরও চরিত্রধর্ম। দিব্যেন্দু পালিত তাঁর কথাসাহিত্যে যেসব চরিত্র নির্মাণ করেছেন, তাদের চরিত্র-ধর্মকে অনুধাবন করার জন্য আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম হ্যারল্ড মাসলোর (১৯০৮-১৯৭০) 'Hierarchy of Needs' (১৯৪৩-১৯৫৪)—এই তত্ত্বটির সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। এই তত্ত্বটির মাধ্যমে মাসলো মানুষের (মূলত প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষ) বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক এবং মানসিক চাহিদার ক্রম নির্দেশ করেছেন। সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন, এই চাহিদাগুলি কীভাবে ব্যক্তিকে বেঁচে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা অর্জন করে। মানুষের চাওয়ার কোনও শেষ নেই। এমনকি 'এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি—'। অর্থাৎ, একটি চাহিদা পূরণ হওয়া মাত্রই তৈরি হয় আরেকটি নতুন চাহিদার বলয়। মানুষের এই প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ক্রম-অনুযায়ী মাসলো মূলত ৫ টি স্তরের কথা বলেছেন। স্তরগুলি নিম্নরূপ—

১) **শারীরিক প্রয়োজন (The physiological needs):** জল, খাবার, বায়ু (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস), ঘুম ইত্যাদি বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক প্রয়োজন-সাধনের ক্ষেত্রে জরুরি।

২) **নিরাপত্তার প্রয়োজন (The safety needs):** শারীরিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, উপার্জন, সম্পদ ইত্যাদির সুরক্ষা এবং নিশ্চয়তা।

৩) **ভালোবাসা এবং সামাজিক সম্পর্কের প্রয়োজন (The love needs):** প্রেম-ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, পরিবার এবং অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের চাহিদা পূরণ।

৪) **সম্মান ও মর্যাদার প্রয়োজন (The esteem needs):** আত্মসম্মান, সামাজিক সম্মান, এবং সাফল্য অর্জন।

৫) **স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজন (The need for self-actualization):** ব্যক্তিগত সম্ভাবনার পূর্ণ-বিকাশ, সৃজনশীলতা, সমস্যা-সমাধান এবং নিজস্ব প্রকৃত সত্তার উপলব্ধি।

মাসলো এই স্তর-বিন্যাসের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, কীভাবে ক্রমানুসারে একটি স্তরের চাহিদা পূরণ হওয়ার পর মানুষ পরিবর্তী স্তরের চাহিদাগুলির দিকে অগ্রসর হয়। শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনগুলি মিটলে মানুষ সেই সব প্রয়োজনের সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে চায়। নিজের সুরক্ষার জন্য মাথার উপরে ছাদ চায়। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ইত্যাদির সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন সম্পদ। সম্পদের জন্য মানুষ অর্থ-উপার্জনের পন্থা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। এইটুকু কোনোক্রমে নিশ্চিত হয়ে গেলেই মানুষ জীবনে প্রেম-ভালোবাসা এবং অন্যান্য ভাবাবেগ-তাড়িত আহ্লাদ পেতে চায়, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার মাধ্যমে সামাজিক স্বীকৃতি পেতে চায়। জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ-লাভ এবং আবেগসিক্ত সম্পর্কের ছত্রছায়া পাওয়ার পর মানুষ সমাজে বিশিষ্টজন হিসেবে সম্মান এবং প্রতিপত্তি আদায় করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই সব কটি ধাপ অতিক্রম করার পর সব শেষে আসে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধাপ। কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা সহজ কথা নয়। পূর্বের সব কটি চাহিদার যে বিপুল তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা সম্পূর্ণভাবে নিবারিত না হলে শেষ এই ধাপে

পৌঁছনো সম্ভব নয়। এই স্তরকে ঠিক চাহিদা বলা যায় না। এটি একটি অবস্থান, যে অবস্থানে উত্তীর্ণ হতে পারলে মানুষ নিজেকে পূর্ণ বলে মনে করতে পারে, আত্ম-সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। এই স্তরে খুব কম মানুষই উত্তীর্ণ হতে পারে এবং যারা পারে তারা জীবনের মূল অন্বেষণ, জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে। যদি কোনও মানুষ প্রকৃতভাবেই জীবনের সত্য উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে তার মধ্যে আর নিত্য-নতুন চাহিদা তৈরি হবে না। আর চাহিদা এবং চাহিদা-পূরণের মধ্যেকার যে বিপুল উত্তেজনা, জ্বালা-যন্ত্রণা তার থেকে মুক্তি লাভ করবে। এই স্তরে পৌঁছে মানুষ নিজের মধ্যে পূর্ণতা উপলব্ধি করে, পূর্ণতা লাভের জন্য বাহ্যিক কোনও উপাদানের প্রয়োজন পড়ে না। এর জন্য একটি মানুষের নিজেকে চেনা, নিজের চাহিদা ও প্রয়োজনগুলিকে সঠিকভাবে শনাক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে সে কোনোদিনই শান্তি বা সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে না, বরঞ্চ আজীবন নিত্য-নতুন প্রয়োজন-সাধনের জন্য অশান্ত জীবনযাপন করবে। ১৯৫৪ সালে মাসলো তাঁর এই পঞ্চস্তরীয় মডেলটিকে দুটি ভাগে ভাগ করেন—

- অভাবজনিত প্রেরণা (deficiency motivation)
- বিকাশজনিত প্রেরণা (growth motivation)

মাসলো-নির্দেশিত প্রথম চারটি স্তর ‘অভাবজনিত প্রেরণা’র দ্বারা উদ্ভূত হয়। আর ‘বিকাশজনিত প্রেরণা’র কারণে স্বয়ংসম্পূর্ণতার স্তরটি তৈরি হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণতার স্তরে কোনোরকম জাগতিক চাহিদা থাকে না। এটা সম্পূর্ণভাবেই মানসিক বিকাশের স্তর। জ্ঞান-অর্জন এবং সৃজনশীলতার প্রতি মানুষ আস্থাশীল হয়ে ওঠে এই স্তরে। প্রকৃতি, শিল্পকলা এবং অন্যান্য সৃজনশীল ও মননশীল বিষয়ের দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে হতে ক্রমে মানুষ আত্মানুসন্ধানের (self-actualization) দিকে অগ্রসর হয়। নিজের অবস্থান, চাহিদা,

দক্ষতা এবং অন্যান্য সব কটি দিক সম্পর্কে জেনে-বুঝে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উপলব্ধি করার পর মানুষ নিজেকে, নিজের চাহিদাকে অতিক্রম (self-transcendence) করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। নিজেকে অতিক্রম করার পর মানুষ উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করে। জাগতিক কামনা-বাসনার ক্ষুদ্রতা থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করে।

এই ৫ টি স্তর নিয়ে পরবর্তীকালে আলাপ-আলোচনা করতে গিয়ে বোধগম্যতার জন্য অনেকেই এই স্তরগুলিকে একটি পিরামিডের আকারে সাজিয়েছেন। পিরামিডের মধ্যে স্তরগুলি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে দেখা যায় চাহিদার ক্রম-অনুযায়ী পিরামিডের স্তরগুলি ঊর্ধ্বমুখী, অর্থাৎ প্রাথমিক চাহিদা নীচের স্তর থেকে শুরু এবং সর্বোচ্চ চাহিদা অতিক্রম করে সর্বোচ্চ স্তরটি পিরামিডের ডগায় এসে পৌঁছেছে।

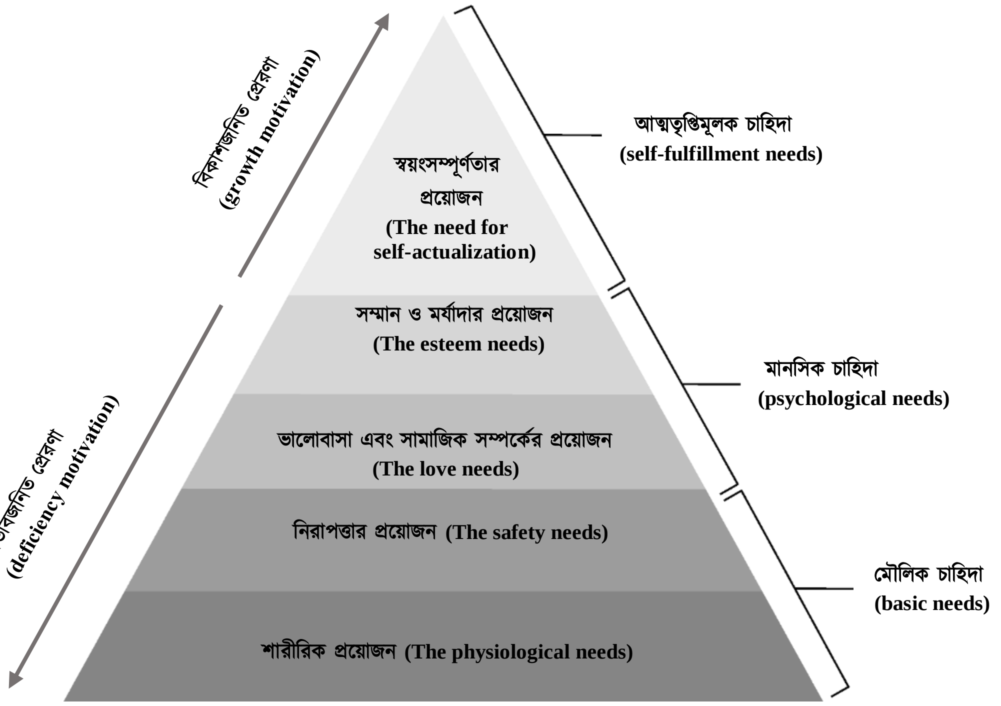

ছক ২ : Schematic diagram of ‘Maslow’s Hierarchy of Needs Theory’.

মাসলোর এই তত্ত্বের[৪] মাধ্যমে মুখ্যত মানুষের চাহিদা এবং প্রেরণার প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু মৌলিক বিষয় প্রমাণ করা যায়। যেমন—

১) প্রয়োজনের ক্রমান্বয়তা: মানুষের প্রয়োজনগুলি নির্দিষ্ট একটি ক্রমান্বয়ে তৈরি হয়। এক স্তরের প্রয়োজনগুলি কিছুটা অন্তত পূরণ হওয়ার পর পরবর্তী স্তরের প্রয়োজনগুলি কার্যকরী হয়। অর্থাৎ, মৌলিক শারীরিক প্রয়োজনগুলি পূরণ হওয়ার পরই মানুষ সেই মৌলিক চাহিদাগুলি নিয়মিতভাবে পাওয়ার নিশ্চয়তা খোঁজে। মৌলিক শারীরিক চাহিদা পূরণের দিকটি নিরাপত্তা লাভ করলে তবেই শরীরকে অতিক্রম করে মানুষ মনের কথা ভাবতে শুরু করে। আর মনের দিকটি নিয়ে চর্চা করা শুরু করলেই মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, পরিবার ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের প্রতি আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। কিন্তু এখানেই মানুষ থেমে থাকতে পারে না। প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান হতে থাকে। শারীরিক এবং মানসিক সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলে পরেই মানুষ সমাজে কিছু বাড়তি সম্মান, প্রতিপত্তি আশা করতে শুরু করে। এই স্তরে এসে মানুষ আর সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সাধারণ সামাজিক চাহিদা পূরণ করে খুশি হতে পারে না। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে অন্যান্য আর পাঁচজন সামাজিক প্রাণীর থেকে বিশিষ্টতা লাভ করতে চায়, নিজের অবস্থানকে অন্যান্যদের থেকে উন্নততর প্রমাণ করবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। মানসিক চাহিদার এই জটিল ক্রমান্বয়তার দিকটিই নানান আঙ্গিকে, নানান দিক থেকে বারবার দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যে পরিস্ফুট হয়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের কিছু কিছু গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের কথা এসেছে বটে কিন্তু তিনি মুখ্যত নাগরিক মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তের কথাকার। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে যেসব চরিত্রদের তুলে আনছেন, তাদের অধিকাংশেরই মৌলিক শারীরিক চাহিদা নিবৃত্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হচ্ছে মানসিক চাহিদাকে ঘিরে। শারীরিক চাহিদাগুলির মতো মানসিক চাহিদার কোনও

নির্দিষ্ট পরিমাপ হয় না। মানসিক চাহিদাগুলি যেহেতু বায়বীয়, তাই মানসিক চাহিদার স্তরকে অতিক্রম করে উচ্চতর স্বয়ংসম্পূর্ণতার স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া অনেক বেশি কঠিন। দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যে দেখা যায় দম্পতি বা প্রেমিক-প্রেমিকাদের ক্ষেত্রে হয়তো সাধারণ সামাজিক সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষাগুলো পূর্ণ হয়েছে, গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব, পরিবার। কিন্তু প্রেম-ভালোবাসার কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণ হওয়া কি আদৌ সম্ভব? ঠিক কতখানি ভালোবাসা পেলে একজন মানুষের মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে?—এই প্রশ্নের কোনও যথাযথ উত্তর হয় না। এই স্তরে অবস্থান করা অপূর্ণ হৃদয়ের মানুষগুলির আখ্যান, তাদের পূর্ণতা লাভের ব্যর্থ প্রয়াস, অন্তহীন হাহাকারের কথা বারবার দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যের কথাবস্তু হিসেবে উঠে এসেছে।

২) বর্ধিত চাহিদা: মানুষের মানসিক চাহিদা ক্রমাগত পরিবর্তিত এবং বর্ধিত হতে থাকে। একবার একটি প্রয়োজন পূর্ণ হলে নতুন চাহিদার আবির্ভাব ঘটতে বিশেষ দেরি হয় না। এই মানসিক চাহিদার বলয়টি যেন অন্তহীন একটি চক্রের মতো। মানসিক সাধারণ পরিবার-পরিজনের স্নেহ লাভ করে কেউ যদি সন্তুষ্ট হতে পারে, তাহলে সে সর্বোচ্চ স্তর স্বয়ংসম্পূর্ণতার স্তরে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়। এই স্তরে অন্যের অনুগ্রহের প্রয়োজন পড়ে না। ফলে অন্যের থেকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি পাওয়ার আশাও বিলুপ্ত হয়। কিন্তু মানুষ যদি নিজেই নিজের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করতে পারে, তাহলে তো সে একপ্রকার মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এই স্তরে জীবনের বিচিত্র রসাস্বাদন করে বুভুক্ষু হৃদয়ের ক্ষুধা-নিবৃত্তির প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু দিব্যেন্দু পালিত যাদের কথা বলছেন, তারা জীবনের বিচিত্র রসে নিমজ্জিত থেকেও অপূর্ণ হৃদয়ে নিত্য-নতুন রসের অনুসন্ধান করে বেড়ায়। আর সেইখানেই তাদের বেঁচে থাকার সার্থকতা। এই রসের অনুসন্ধান শেষ হলে তাদের বাঁচাও যেন শেষ হয়ে যায়। যন্ত্র-সভ্যতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়া

যান্ত্রিক জীবন অস্থির। সেখানে থেমে থাকার, থমকে থাকার কোনও জায়গা নেই। এই সভ্যতায় বিরাজমান প্রতিটি মানুষ যন্ত্রের মতো নিজেকে বারবার দম দিয়ে সচল করে রেখেছে, একই চক্রের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই চক্র থেকে তাদের সহজে মুক্তি নেই। পণ্য-সভ্যতায় প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধার মতো ইতিবাচক আবেগগুলিও পরিণত হয়েছে পণ্যে। সুতরাং প্রতিদিন নতুন নতুন রঙিন পণ্যের হাতছানিতে অভ্যস্ত মানুষ প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা লাভ করলেও নতুন প্রেম, নতুনভাবে শ্রদ্ধা অর্জনের চেষ্টায় নিজেদের ক্রমাগত সচল রাখছে আর মনে করছে এর নামই বুঝি বেঁচে থাকা। যে সভ্যতায় কোনোকিছুই হৃদয়কে ভরিয়ে তুলতে পারে না, বরঞ্চ ক্রমাগত নতুন নতুন চাহিদা নির্মাণ করে যায়, সেই সভ্যতার মানুষের হৃদয় শূন্যতা ছাড়া আর কী-ই বা অনুভব করতে পারে। তাই দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্য জুড়ে শূন্যতার হাহাকার, নিঃসঙ্গ মানুষের অসম্পূর্ণ হৃদয়ের একাকিত্বের আড়ম্বর। সাহিত্যে এই নাগরিক একাকিত্বের উদ্‌যাপন করতে গিয়ে প্রতিটি চরিত্র নির্মাণ করার সময় তিনি এতবার 'একাকিত্ব', 'নিঃসঙ্গতা', 'শূন্যতাবোধ'-এর উল্লেখ করেছেন যে অনেক সময় বিষয়টি পুনরুক্তিমূলক মনে হতে পারে। অনেক অভিমানী পাঠক হয়তো মনে করতে পারেন, তিনি পাঠকের বোধগম্যতার প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল ছিলেন না। তাই একপ্রকার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন নগর জীবন এবং নাগরিক মানুষদের স্বরূপ। কিন্তু পাঠক হিসেবে অনুধাবন করা প্রয়োজন, চাহিদার ক্রমান্বয়তা বিষয়টিই পুনরুক্তিমূলক। আর নাগরিক মনের অন্তহীন শূন্যতা এবং একাকিত্বের দিকটি নির্দেশ করতে হলে এই পুনরুক্তিমূলক যান্ত্রিক, একঘেয়ে কারণগুলিকে তুলে ধরতে হবে। দিব্যেন্দু পালিত ঠিক সেই কাজটিই বাস্তবসম্মতভাবে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

৩) সন্তুষ্টির স্থায়িত্বের অভাব: কোনও একটি প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ হলে মানুষ কি একেবারেই আনন্দিত হতে পারে না?—এই প্রশ্নের উত্তরে বলতেই হয় মানুষ আনন্দিত হয়, সুখ লাভ করে, কিন্তু পাশাপাশি আরেকটি প্রশ্ন উঠে আসে, সেই সুখ-সন্তুষ্টির স্থায়িত্ব কতটুকু? আসলে শারীরিক চাহিদা পূরণ, বৈষয়িক সম্পদ বা সামাজিক সম্পর্ক থেকে পাওয়া প্রেম-ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, প্রতিপত্তি ইত্যাদি মানুষকে যে সুখ দেয়, তা স্বভাবতই সাময়িক, পদ্মপত্রের জলবিন্দুর মতো স্বল্পস্থায়ী। যথার্থ আত্মোপলব্ধি এবং নিজের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণতার মাত্রায় পৌঁছে দিতে পারে। আর সম্পূর্ণতা লাভ করলে সেখানে শূন্যতা তৈরি হওয়ার কোনও জায়গা থাকে না। কিন্তু সম্পূর্ণতা লাভ করতে হলে বা জীবনের পরমতম লাভের শিখরে পৌঁছতে হলে আগে অসম্পূর্ণতার জরাকে স্বীকার করতে হয়, শূন্যতার অন্ধকার গহ্বরকে চিনতে হয়, সেই গহ্বরের মধ্যে দিয়ে দুরূহ যাত্রার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। জীবনের অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণভাবে আত্তীকরণ করতে পারলে তবেই সম্পূর্ণতার স্তরকে ছোঁয়া সম্ভব। দিব্যেন্দু পালিত নাগরিক জীবনের এই চাহিদাসঙ্কুল দুরূহ জীবনযাত্রাকে চিহ্নিত করেন। পণ্য-সভ্যতার প্রলোভনের মাঝে বন্দী, অসহায় মানুষগুলোর বাস্তব অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে তাঁর সাহিত্যে। সেইসব অভিব্যক্তির লিখিত প্রয়াস হয়তো সবসময় সুখপাঠ্য নয়, কিন্তু তা ঘোর বাস্তব। সুখপাঠ্য নয় বলেই হয়তো তিনি সে অর্থে সাহিত্যিক হিসেবে জনপ্রিয়তা পাননি। তবে তিনি কোনোদিনই জনপ্রিয়তা-পিপাসী ছিলেন না। জনপ্রিয় সাহিত্য লেখার মতো যথেষ্ট দক্ষতা এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তাঁর ছিল। তারপরও তিনি প্রাজ্ঞ গবেষকের মতো আজীবন মূলত নগর-মনের কালিমালিপ্ত বাস্তবতা নিয়ে কাটাছেঁড়া করার নিবিড় গবেষণা-কার্যে লিপ্ত থেকেছেন। দিব্যেন্দু পালিতের 'ত্রাতা' গল্পটি প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০৫) লিখেছিলেন—

মানুষ আয়নার সামনে দাঁড়ায় নিজেকে দেখতে পাবে বলে। কিন্তু সকলেই জানেন, অন্ধ যতটুকু দেখতে পায় না, মানুষ নিজেকে ততটুকুই দেখতে পায় আয়নার সামনে দাঁড়ালে। আমার তো মনে হয়, অন্ধের চেয়েও কম দেখতে পাই নিজেকে, যখন আমি আয়নার সামনে দাঁড়াই। আবার উল্টোদিকে, আয়নায় আমি যা, তা যদি সত্যিই উদ্ভাসিত হতে পারত—তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াত পিকাসোর 'গার্ল বিফোর দ্য মিরর' ছবিটার মত। সুন্দরী যুবতীর সেই একসঙ্গে অগণন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা মুখটি মাত্র একটি ক্যানভাসে উপস্থিত করতে গিয়ে আয়তাকার ক্যানভাসের মধ্যে ওভাল শেপের সেই দাঁড়ানো আয়নাটি যা প্রতিফলিত করে – তা এতই ভয়ংকর যে – ক্যানভাসের মেয়েটির মত কেউ যদি সত্যিই পথ দিয়ে হাঁটে সে একাই হাঁটবে। কারণ পথ হয়ে যাবে জনশূন্য।[৫]

কেবল 'ত্রাতা' নয়, দিব্যেন্দু পালিতের প্রায় প্রতিটি গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রযোজ্য। নিজেকে না-জানা, না-চেনা, আত্মোপলব্ধিবিহীন নাগরিক মানুষদের হৃদয়কে 'অভিজ্ঞ সার্জেনের' মতো করে কেটে-চিরে তার প্রতিটি বিভাজিকা, রক্ত-চলাচল, শিরা-উপশিরাকে নিরীক্ষণ করেছেন দিব্যেন্দু পালিত। জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য লোকপ্রিয় ঘটনাবহুল, মিলনান্তক কথাসাহিত্য লেখেননি। তাই তাঁর সাহিত্যের ভাষাও তেমন সুখপাঠ্য ভাষা নয়। বিশ শতকের কলকাতার নাগরিক মনের সংহত প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে প্রয়োজনের বাইরে একটিও বাড়তি কথা বলেনি তাঁর গল্পে-উপন্যাস। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক এবং ভাষাতাত্ত্বিক পবিত্র সরকার মহাশয়ের মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

...তাঁর ভাষা কখনই খুব প্রদর্শন প্রিয় ভাষা নয়। ভাষা কখনই বলে না যে আমাকে আলাদা করে দেখ, কমলকুমার মজুমদারের ক্ষেত্রে যেমন হয়।...সাধারণভাবে গল্প উপন্যাসে একটা শরৎচন্দ্রীয় ভাষার আদল দেখা যায়, কখনও কখনও আবেগকে খুব ফেনিয়ে তোলা হয়। দিব্যেন্দুদা কখনই সেটা করেন না। সেটা আমার খুব ভালো লাগে। আলাদা করে পাঠক হিসেবে আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়। একটু সচেতন পাঠক হিসেবে। বলাবাহুল্য এই কারণে যে দিব্যেন্দুদা খুব জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে নন বলেই আমার ধারণা। অর্থাৎ যাঁদের বই পাঁচ-

হাজার কপি ছাপা হবে, তিনমাসের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে এইরকম লেখকদের দলে দিব্যেন্দুদা কখনই পৌঁছতে চান নি। বা হয়তো পৌঁছতে পারেন নি। ফলে দিব্যেন্দুদাকে নিয়ে অন্যদের মতো খুব হই-চই হয় না।[৬]

তাঁর সাহিত্য নিয়ে 'খুব হই-চই' না হলেও সাহিত্য-সমালোচকদের দ্বারা তিনি সাহিত্যিক হিসেবে বারবার প্রশংসা পেয়েছেন। সেই সুবাদে *অনুভব* (১৯৮৪) উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৯৮), *ঢেউ* (১৯৮৭) উপন্যাসের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯০), *সহযোদ্ধা* (১৯৮৪) উপন্যাসের জন্য রামকুমার ভূয়ালকা পুরস্কার (১৯৮৬) ইত্যাদির দ্বারা সমাদৃত হয়েছেন। তাছাড়াও ১৯৮৪ সালে আনন্দ পুরস্কার, বনফুল পুরস্কার, তারাশঙ্কর পুরস্কার, উল্টোরথ পুরস্কার এবং আরও বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মানে অভিষিক্ত হয়েছেন তিনি। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-কাহিনি রচনার জন্য একাধিকবার বি. এফ. জে. এ. এবং ঋত্বিককুমার ঘটক স্মৃতিপুরস্কারও লাভ করেছেন। তবে তিনি পুরস্কার লাভ করার বিষয়ে খুব বেশি সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। যদি সচেতন থাকতেন তাহলে হয়তো রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরও বৈচিত্র্য আনার কথা ভাবতেন, গল্পে চরিত্র-বিশ্লেষণের পরিবর্তে ঘটনার ঘনঘটা দিয়ে পাঠকদের মনকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করতেন। দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যিক বন্ধু শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কখনই তাঁর সাহিত্যের প্রেক্ষাপট নির্বাচনের ক্ষেত্রে নাগরিক পরিবেশ, বিশেষত কলকাতার বাইরে যাননি। অথচ কথাসাহিত্যে নতুন নতুন বিষয় প্রবর্তন করার মতো পুঁজি তাঁর কাছে ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, ভাগলপুরের ছেলেবেলাকার রঙিন, বৈচিত্র্যময় স্মৃতি তাঁর মন জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল। তিনি নানান সাক্ষাৎকারে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সময় বারবার সেই প্রসঙ্গ তুলে কথাও বলেছেন। অথচ ভাগলপুর তাঁর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে খুব কমই এসেছে। কলকাতা শহরই তাঁর কথাসাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে।

দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এই স্পষ্ট ও দৃঢ় অনুরক্তির দিকটিকে পবিত্র সরকার তাঁর 'শক্তির জায়গা' হিসেবেই গণ্য করেছেন—

> গ্রাম নিয়ে তিনি লেখেননি ও গ্রাম সম্বন্ধে মনে হয় এই সিদ্ধান্তটা করেই নিয়েছেন যে পরিচিত জগতের বাইরে তিনি যাবেন না। এইটাই তাঁর শক্তির জায়গা।[৭]

দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মৃত্যু-চেতনা এবং সিনেমাটিক সফর। এই দুটি বিষয় নিয়ে গবেষক হিসেবে আমার আলোকপাত করবার সুযোগ হয়নি। তবে ভবিষ্যতে মৃত্যু-চেতনা বিষয়ে যদি কেউ কাজ করেন, তবে দিব্যেন্দু পালিতের তিনটি উপন্যাস *সন্ধিক্ষণ* (১৯৭১), *বৃষ্টির পরে* (১৯৭৪) এবং *সবুজ গন্ধ* (১৯৮২) অবশ্যপাঠ্য। তাছাড়া দিব্যেন্দু পালিতের গল্প-উপন্যাস নিয়ে বেশ কিছু সিনেমা এবং টেলিফিল্মের কাজ হয়েছে। তার মধ্যে তপন সিন্‌হা পরিচালিত *অন্তর্ধান* (গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯ সালে, চলচ্চিত্র আকারে মুক্তিপ্রাপ্ত হয় ১৯৯১ তে) অন্যতম। দিব্যেন্দু পালিত নিজেও *শতবর্ষে চলচ্চিত্র* (দুই খণ্ড- ১৯৯৬, ১৯৯৮) নামক গ্রন্থে নির্মাল্য আচার্যের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনার কাজ করেন। এই সময় তিনি *আনন্দবাজার পত্রিকায়* সিনেমা-সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পাদনার কাজও করতেন। তাছাড়া তাঁর গল্প-উপন্যাসে চলচ্চিত্র নির্মাণ করার প্রভূত উপাদান পাওয়া যায়। চলচ্চিত্র বিষয়ে আগ্রহী গবেষকেরা এই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। চলচ্চিত্র ছাড়াও তিনি নাটক বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, যার সাক্ষ্য বহন করে *মৌনমুখর* (১৯৯৮) এবং *সংঘাত* (১৯৯২) এই দুটি উপন্যাস। কলকাতার কথাকার হিসেবে দিব্যেন্দু পালিত যে কেবল কলকাতার বাঙালি নাগরিকদের কথা বলেছেন তা নয়, বিশ শতকে (একুশ শতকেও আছে, তবে নেহাতই কম) যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা কলকাতার বেশ কিছু অঞ্চল জুড়ে বসবাস করত, তাদের নিয়ে তিনি *সোনালী জীবন* (১৯৮৬) নামের একটি চমকপ্রদ উপন্যাস রচনা করেন।

ভবিষ্যতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের নিয়ে গবেষণার কাজ হলে এই উপন্যাসটি গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেতে পারে। এছাড়া দিব্যেন্দু পালিতের প্রায় দুই শতাধিক গল্পে বিষয়-বৈচিত্র্য উপন্যাসের তুলনায় বেশি। তাঁর গল্পগুলি নিয়ে আরও বিশদে গবেষণার কাজ করা প্রয়োজন। দিব্যেন্দু পালিতের কবিতা এবং কথাসাহিত্য উভয়কে পাশাপাশি রেখে সার্বিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যায়, তাঁর মতো অন্তর্মুখী, গভীরতাসম্পন্ন ভাবুক চরিত্রের মানুষকে একটি গবেষণার জন্য বরাদ্দ স্বল্প সময় এবং স্বল্প পরিসরে ধরা সম্ভব নয়। তাঁর সাহিত্যে মানুষের যে হাহাকার, যে আধুনিক সংকটের গুরুভার বিশুদ্ধতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়, তা আয়ত্ত করবার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময় এবং অভিজ্ঞতার প্রসারণ।

১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে অর্থাৎ, উনিশ শতকের প্রায় শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মেঘদূত' প্রবন্ধে লিখেছেন—

> মনে পড়িতেছে কোনো এক ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এক কালে আমরা এক মহাদেশ ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে।[৮]

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের প্রিয়-বিচ্ছেদের ব্যক্তিগত বিরহের পাশাপাশি মানবজাতির মধ্যেকার সামগ্রিক বিচ্ছেদের কথা তুলে ধরেছেন। কালিদাসের কালের প্রাচীন ভারতবর্ষের সামগ্রিক জীবন-ঐশ্বর্যের থেকে মানুষের আধুনিক জীবনেরও বিচ্ছেদ ঘটেছে। উনিশ শতকের শেষকালে উপনীত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বিচ্ছেদ, যে একাকিত্বের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন, বিশ শতকে তা ক্রমান্বয়ে আরও ঘনীভূত হয়েছে। বিশ শতকের জনজীবনে কেবল মানুষের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাই শেষ কথা নয়, মানুষ নিজেই

নিজের সত্তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, নিজের প্রকৃত চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বিশ শতকের এই একাকী, নিঃসঙ্গ নাগরিক মানুষের হাত ধরেছেন সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত। যান্ত্রিক জীবনের মাঝে ক্রমে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলা অসুখী, বিচ্ছিন্ন, নির্জন মনের অন্ধকারে ডুবে থাকা মানুষের কথাকার দিব্যেন্দু পালিত তাঁর কথাসাহিত্যে যাদের হৃদয় নিয়ে কাটাছেঁড়া করেছেন, তাদের প্রকৃতি, স্বরূপ এবং রোজনামচা নিতান্ত সাধারণ, শুষ্ক, নীরস—

মানুষের সঙ্গে ফের দেখা হয়ে যায় মানুষের—
চেনাশোনা হয়, খুব ভালোবাসা হয়;
শরীরে শরীর ঘেঁষা খঞ্জ ও সচল
জন্মদান ক্রমশই খুঁজে নেয় বাঁচা, সার্থকতা।
আমাদের কথা মেশে তাদের কথায়
                    শহীদ মিনারে, সেমিনারে—
চেঁচিয়ে কিংবা খুব নিচু স্বরে যে যেমন পারে
দূরত্ব এক-একভাবে গ'ড়ে দেয় মানুষের সময়, শিবির—
নিজস্ব কিংবা ফ্ল্যাট বাড়ি।
কখনো কখনো দ্যাখে ট্রাম, বাস, ট্রেন;
কখনো চর্বি-ছেঁচা ঘাড় তুলে হঠাৎ আকাশ—
                              এয়ারোপ্লেন;
ফেরার শব্দ নিয়ে বাড়ি ফেরে, ফিরে

ছেলেকে আদর করে, বউকে শাসায়,

পুরনো কাগজ পড়ে, টি-ভি দ্যাখে, কচলায় চোখ—

সর্ষে-ইলিশ কিংবা মাংস-ভাত, ভিটামিন খায়;

টাকা গোনে, ঘড়িতে অ্যালার্ম দেয়,

শরীর উদোম ক'রে স্বাদ নেয় অন্য শরীরের।

তারপর ঘুমিয়ে পড়ে, আর টের পায়

স্পন্ডিলোসিসের ব্যথা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা

কৃপণ সঞ্চয়,

ভীষণ পুরনো বউ, ভীষণ আকাট ছেলে;

আর তারপর

নিজের শরীর জুড়ে পুরনো মাংসের গন্ধ,

গলায় কান্না ও কফ, অন্ধকার—

হওয়া ও না-হওয়া...[৯]

একক মানুষের একাকিত্বের পথে জনশূন্যতার বাস্তব ভয়বহতার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন কবি দিব্যেন্দু পালিত। একবিংশ শতকের চব্বিশতম বছরে এ. আই. (Artificial Intelligence) প্রযুক্তির যে অত্যাধুনিক প্রাণহীন সৌন্দর্যের ফাঁপরের মাঝে পড়ে সভ্যতা যন্ত্র এবং যন্ত্রণার সুখ ভোগ করছে, সেই অত্যাধুনিকতার প্রস্তুতি-পর্বটির সাহিত্যিক রূপ নির্মাণ করেছেন দিব্যেন্দু পালিত।

তথ্যসূত্র:

১। বরুণকুমার চক্রবর্তী, ‘কলকাতায় লোকসংস্কৃতি’, অরূপ বসু (সম্পা.), *বারণরেখা ভাবনার অন্য ভুবন (কলকাতা কাহিনী)*, ১২/২ সরশুনা মেন রোড, কলকাতা ৭০০০৬১, পৃ. ৩৫-৩৬

২। পবিত্র সরকার, ‘সব মিলিয়ে অসাধারণ’, *প্রিয়দর্শিনী*, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), জানুয়ারি—মার্চ ২০০৩, গল্‌ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ১৮

৩। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, ‘আপোসহীন লেখক’, *প্রিয়দর্শিনী*, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), জানুয়ারি—মার্চ ২০০৩, গল্‌ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ১৬

৪। Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, Harper & Row Publishers, New York 10007, 2nd edition 1954

৫। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, ‘দি অ্যানাটমি ক্লাস অফ্ ডক্টর দিব্যেন্দু পালিত’, *প্রিয়দর্শিনী*, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), জানুয়ারি—মার্চ ২০০৩, গল্‌ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ২১

৬। পবিত্র সরকার, ‘সব মিলিয়ে অসাধারণ’, *প্রিয়দর্শিনী*, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পা.), জানুয়ারি—মার্চ ২০০৩, গল্‌ফ গ্রীণ, কলকাতা ৭০০০৯৫, পৃ. ১৯

৭। তদেব, পৃ. ১৮

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘মেঘদূত’, *রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড*, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৭, চৈত্র ১৩৯৩, পৃ. ৭১৬

৯। দিব্যেন্দু পালিত, ‘মানুষ’, *দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৮, পৃ. ৯৫-৯৬

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থাবলি:

১। পালিত, দিব্যেন্দু। *অচেনা আবেগ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫

২। পালিত, দিব্যেন্দু। *অনুভব*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪

৩। পালিত, দিব্যেন্দু। *অনুসরণ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০

৪। পালিত, দিব্যেন্দু। *অমৃত হরিণ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭

৫। পালিত, দিব্যেন্দু। *আড়ালের আয়নায়*। কলকাতা: সৃষ্টি প্রকাশন, ২০০১

৬। পালিত, দিব্যেন্দু। *একদিন সারাদিন*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩

৭। পালিত, দিব্যেন্দু। *ওঠা কিংবা নামা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫

৮। পালিত, দিব্যেন্দু। *গল্পসমগ্র ১*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭

৯। পালিত, দিব্যেন্দু। *গল্পসমগ্র* ২। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯

১০। পালিত, দিব্যেন্দু। *দশটি উপন্যাস ১*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯০

১১। পালিত, দিব্যেন্দু। *দশটি উপন্যাস* ২। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০

১২। পালিত, দিব্যেন্দু। *দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭

১৩। পালিত, দিব্যেন্দু। *পুরুষ*। কলকাতা: বিকাশ গ্রন্থ ভবন, ১৯৯৪

১৪। পালিত, দিব্যেন্দু। *প্রথম পাঁচটি উপন্যাস*। কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৫

১৫। পালিত, দিব্যেন্দু। *বহুদূর অভিমান*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২

১৬। পালিত, দিব্যেন্দু। *ভোরের আড়াল*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩

১৭। পালিত, দিব্যেন্দু। *মাইন নদীর জল*। কলকাতা: প্রতিভাস, ১৯৮৮

১৮। পালিত, দিব্যেন্দু। *মাত্র কয়েকদিন*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮

১৯। পালিত, দিব্যেন্দু। *মৌনমুখর*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮

২০। পালিত, দিব্যেন্দু। *যখন বৃষ্টি*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯

২১। পালিত, দিব্যেন্দু। *সংঘাত*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯২

২২। পালিত, দিব্যেন্দু। *সেকেন্ড হানিমুন*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬

২৩। পালিত, দিব্যেন্দু। *স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প*। কলকাতা: মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৮

২৪। পালিত, দিব্যেন্দু। *স্মৃতির মতন কিছু*। কলকাতা: সৃষ্টি প্রকাশন, ২০০১

২৫। পালিত, দিব্যেন্দু। *হঠাৎ একদিন*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০

২৬। পালিত, দিব্যেন্দু। *হিন্দু*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

১। আকাদেমি বানান উপসমিতি সম্পাদিত। *আকাদেমি বানান অভিধান*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১১

২। আচার্য, অনিল সম্পাদিত। *সত্তর দশক (তৃতীয় খণ্ড) ষাট-সত্তরের ছাত্র আন্দোলন*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, ১৯৮৭

৩। আচার্য, অনিল সম্পাদিত। *সত্তর দশক (প্রথম খণ্ড) সত্তর দশকের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়ন*, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ১৩৮৭

৪। আচার্য, ড. মধুমিতা। *স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মরতা মেয়েদের ভূমিকা*। কলকাতা: কমলিনী, ২০১২

৫। আজাদ, হুমায়ুন। *নারী*। ঢাকা, বাংলাদেশ: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২

৬। ইয়াসিন, তাহা ও সাদি, অনুপ (সম্পাদিত)। *নারী*। ঢাকা, বাংলাদেশ: কথাপ্রকাশ, ২০০৮

৭। কর, শিশির। *বিপ্লব আন্দোলনের নেপথ্যে নানা কাহিনী*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২

৮। গিরি, ড. সত্যবতী এবং মজুমদার, ড. সমরেশ (সম্পাদিত)। *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*। কলকাতা: রত্নাবলী, ২০০২

৯। গোস্বামী, অচ্যুত। *বাংলা উপন্যাসের ধারা*। কলিকাতা: পাঠভবন, ১৯৬১

১০। ঘোষ, কালীপ্রসন্ন। *নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

১১। ঘোষ, নির্মল। *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৪০১ বঙ্গাব্দ

১২। ঘোষ, বিনয়। *বাংলার নবজাগৃতি*। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০২০

১৩। ঘোষ, বিনয়। *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ*। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০২০

১৪। ঘোষ, সুবোধ। *নির্বাচিত গল্পগুচ্ছ*। কলিকাতা: আনন্দম, ১৯৯৫

১৫। চক্রবর্তী, সুমিতা। *উপন্যাসের বর্ণমালা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৩

১৬। চট্টোপাধ্যায়, অনুনয়। *মার্কস ও মার্কসবাদ*। কলকাতা: এন. ই. পাবলিশার্স, ২০০৯

১৭। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *কমলাকান্তের দপ্তর*। কলিকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ, ১৯৬২

১৮। চন্দ, পুলক (সম্পাদিত)। *নারীবিশ্ব*। কলকাতা: গাঙচিল, ২০০৮

১৯। চৌধুরি, সিদ্ধার্থরঞ্জন সম্পাদিত। অন্তর্গত *বাঙালি মধ্যবিত্ত মানস*। কলকাতা: উবুদশ, ২০১১

২০। চৌধুরী, রমাপদ। *উপন্যাস সমগ্র ৪*। কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ১৯৯৩

২১। চৌধুরী, শম্পা সম্পাদিত। *প্রসঙ্গ বাংলা ছোটো গল্প স্বাধীনতার আগে ও পরে*। কলকাতা: রত্নাবলী, ২০১১

২২। চৌধুরী, শম্পা। *রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প*। কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০১০

২৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ

২৪। দত্ত, বীরেন্দ্র। *বাংলা ছোটোগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ ২*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪

২৫। দাশ, শিশিরকুমার। *বাংলা ছোটোগল্প*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

২৬। দাস, অরূপকুমার। *ষাট ও সত্তরের দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১২

২৭। নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র। *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*। কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬০

২৮। পাল, শ্রাবণী। *বাংলা ছোটোগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৮

২৯। প্রামাণিক, সুরঞ্জন। *নারী-পুরুষের যৌথ অভিযান মানবিক সমাজের দিকে*। কলকাতা: উদবুশ, ২০১৫

৩০। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, ২০১০

৩১। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। কলিকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬

৩২। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বাংলা উপন্যাস*। কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ

৩৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩

৩৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত। *গল্প নিয়ে, উপন্যাস নিয়ে*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ

৩৫। বসু, প্রদীপ। *বাঙালি জীবনের তত্ত্বতালাশ*। কলকাতা: পরম্পরা, ২০১৬

৩৬। বসু, সমরেশ। *বিবর*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬

৩৭। বসু, স্বপন ও দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত)। *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০২০

৩৮। ভট্টাচার্য, জগদীশ। *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*। কলকাতা: ভারবি, ২০০৭

৩৯। ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। *এঙ্গেলস : দুশ বছর পেরিয়ে*। কলকাতা: আর বি এন্টারপ্রাইজ, ২০২১

৪০। ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *প্রবন্ধসংগ্রহ ২*। কলকাতা: গাঙচিল, ২০১২

৪১। ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *বিবাহ প্রসঙ্গে*। কলকাতা: ক্যাম্প, ২০০৫

৪২। মওদুদ, আবদুল। *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২

৪৩। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদিত)। *পঞ্চাশের দশকের কথাকার*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮

৪৪। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার। *উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯

৪৫। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার। *উপন্যাসে জীবন ও শিল্প*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮

৪৬। মজুমদার, গুণদা। *মেয়েদের অধিকার*। কলিকাতা: বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ, ১৯৬৫

৪৭। মান্না, গুণময়। *শিল্পিত বাংলা উপন্যাস*। কলকাতা: বামা পুস্তকালয়, ২০০২

৪৮। মিত্র, নরেন্দ্রনাথ। *গল্পমালা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬

৪৯। মিত্র, প্রেমেন্দ্র। *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

৫০। মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার। *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক*। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩

৫১। রায়, অলোক, সরকার, পবিত্র এবং ঘোষ অভ্র (সম্পাদিত)। *দুশো বছরের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য*। নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৭

৫২। রায়, অলোক। *বাংলা উপন্যাস: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০০

৫৩। রায়, দেবেশ। *উপন্যাস নিয়ে*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১

৫৪। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ। *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯

৫৫। রায়চৌধুরী, গার্গী সম্পাদিত। *মেয়েদের যৌনতা প্রবাদ, অনুভূতি ও বাস্তবতা,* কলকাতা: কারিগর, ২০২১

৫৬। লাহিড়ী, কার্তিক। *বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস*। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

৫৭। শীল, শেখর। *নারী-ভাবনার কাটাকুটি*। কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০২১

৫৮। সরকার, সুমিত। *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*। কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৩

৫৯। সরকার, সুমিত। *কলিযুগ, চাকরি, ভক্তি: রামকৃষ্ণ ও তার সময়*। কলকাতা: সেরিবান, ২০০২

৬০। সান্যাল, ড. অরুণ। *প্রসঙ্গ: বাংলা উপন্যাস*। কলকাতা: ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৬০

৬১। সিং, সুকুমার। *ভারতের নারী প্রসঙ্গ*। কলকাতা: মাস এন্টার্‌টেন্‌মেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২

৬২। সিংহ রায়, জীবেন্দ্র। *কল্লোলের কাল*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮

৬৩। সিকদার, অশ্রুকুমার। *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ২০০৮

৬৪। সিদ্দিকা, ফারজানা। *নারীর সৃষ্টি: নারীর দ্বন্দ্ব*। ঢাকা, বাংলাদেশ: কথাপ্রকাশ, ২০১৮

৬৫। সুর, অতুল। *ভারতের বিবাহের ইতিহাস*। কলকাত: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ

৬৬। সেন, রুশতী। *প্রচ্ছন্নের আখ্যান*। কলকাতা: থীমা, ২০০২

৬৭। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। *গদ্যসমগ্র*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২

৬৮। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪

অনূদিত গ্রন্থাবলি:

১। দুবে, এস. সি.। *ভারতীয় সমাজ*। রজত রায় অনূদিত। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৬

২। মার্কস, কার্ল। এঙ্গেলস, ফ্রেডরিখ। লেনিন, ভ্লাদিমির। স্টালিন, জোসেফ। *নারী মুক্তির প্রশ্নে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন*। কনক মুখোপাধ্যায় অনূদিত। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮

৩। শেষন, টি. এন.। হাজারিকা, সঞ্জয়। *ভারতের অধঃপতন*। ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬

ইংরেজি গ্রন্থাবলি (ইংরেজিতে রচিত এবং ইংরেজি ভাষায় অনূদিত):

১। Beauvoir, De Simon. *The Second Sex*. Translated by Constance Borde & Sheila Malovany-Chevallier. London: First Vintage Books Edition, May 2011

২। Doidge, Norman. *THE BRAIN THAT CHANGES ITSELF*. UK: Penguin, January, 2008

৩। Engles, Frederick. *The Origin of the Family, Private Property, and the State*. Translated by Pat Brewer. Australia: Resistance Books, 2004

৪। Jones, Daniel N. & Paulhus, Delroy L.. 'Machiavellianism', *INDIVIDUAL DIFFERENCES IN SOCIAL BEHAVIOR*, Mark R. Leary, Rick H. Hoyle (Eds.), New York: The Guilford Press, 2009

৫। Marx, Karl, Engels, Friederich. *Manifesto of the Communist Party*. Moscow: Progress Publishers, 1969

৬। Marx, Karl. *A Contribution to the Critique of Political Economy*. Moscow: Progress Publishers, 1859

৭। Maslow, Abraham Harold. *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row Publishers, 1954

৮। Millet, Kate. *Sexual Politics*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2000

৯। Moi, Toril. *Sex, Gender and the Body: The Student Edition of What is a Woman?*. Oxford: Oxford University Press, 2005

১০। Moi, Toril. *Sexual/Textual Politics*. London & New York: Routledge, 2002

১১। Mumford, Lewis. *The Culture of Cities*. New York: Harcourt, Brace and Company, 1938

১২। Sen, Samar, Panda, Debabrata & Lahiri, Ashish (Eds.). *Naxalbari and after : A frontier anthology*. Kolkata: Kathashilpa Publication, Vol 1, 1978

১৩। Shakespeare, William. *The Tragedy of Macbeth*. London: British Library, 1788

১৪। Varma, Pavan K.. *The Great Indian Middle Class*. India: Penguin Books, 2007

পত্র-পত্রিকা (বাংলা):

১। ঘোষ, সাগরময় (সম্পা.)। *দেশ* সাহিত্য সংখ্যা। কলকাতা (১৩৮৩)

২। চক্রবর্তী, কল্যাণ (সম্পা.)। *দরবারি সাহিত্য পত্রিকা*, দিব্যেন্দু পালিত সংখ্যা। কলকাতা (১৩৯১)

৩। চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র ও আচার্য, নির্মাল্য (সম্পা.)। *এক্ষণ*, কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যা ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয়, তৃতীয় সংখ্যা। কলকাতা: সুবর্ণরেখা (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৫)

৪। তালুকদার, দেবর্ষি ও বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত (অতিথি সম্পা.)। *আলোচনা চক্র*, কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যা ৩৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। কলকাতা (আগস্ট ২০১৯)

৫। দত্ত, হর্ষ (সম্পা.)। *বইয়ের দেশ,* দিব্যেন্দু পালিতের মুখোমুখি ১২ বর্ষ, ২ সংখ্যা। কলকাতা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬)

৬। বসু, অরূপ। *বারণরেখা ভাবনার অন্য ভুবন,* কলকাতা কাহিনী একাদশ বর্ষ। কলকাতা (ফাল্গুন ১৪২৮)

৭। ব্রহ্ম, চৈতালী (সম্পা.)। *এপার ওপার ইছামতী,* স্মরণিকা – অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় – দিব্যেন্দু পালিত দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা। কলকাতা (শারদ সংখ্যা ১৪২৬)

৮। মিত্র, অমর (সম্পা.)। *কথা সোপান* তৃতীয় বর্ষ। কলকাতা (শারদীয় ১৪২৩)

৯। রায়, প্রদীপ্ত (সম্পা.)। *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা। কলকাতা (জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩)

১০। রায়, বব (সম্পা.)। *আমার সময়,* কলকাতা ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা। কলকাতা (ফেব্রুয়ারি ২০১১)

পত্র-পত্রিকা (ইংরেজি):

১। Fuchs, Eberhard & Flugge, Gabriele. ‘Adult Neuroplasticity: More Than 40 Years of Research’. *Neural Plasticity*, Vol. 2014, Article ID 541870. New York: Hindawi Publishing Corporation

২। Paulhus, Delroy L. & Williams, Kelvin M.. ‘The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy, *JOURNAL OF RESEARCH IN PERSONALITY*, 36 (2002)

বৈদ্যুতিন মাধ্যম:

১। https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_suffrage

accessed 01.08.2024. 09.30 p.m.

২। Alva, Niharika. “Meet the brothers who built Bengaluru’s first apartment block”. *Times of India*. April 28, 2018.

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/meet-the-brothers-who-built-citys-first-apartment-block/articleshow/63945436.cms

৩। https://en.wikipedia.org/wiki/John_Logie_Baird

accessed 04.10.2021, 6.15 p.m.

৪। https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Shoenberg

accessed 04.10.2021, 6.45 p.m.